আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী-১

আল্লাহর পথের মুজাহিদ

মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী

আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী-১

আল্লাহর পথের মুজাহিদ

আফগান জিহাদের সূচনা ও তার প্রেক্ষাপট, গেরিলা যুদ্ধের বিস্ময়কর কাহিনী, নিজ চোখে দেখা ঘটনাবলীর বিবরণ, পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তির বিরুদ্ধে মুষ্ঠিমেয় নিঃসম্বল মুজাহিদের বিজয়লাভের ঈমানদীপ্ত দাস্তান। জিহাদ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা, জিহাদের ময়দানে তাঁর অলৌকিক প্রতিক্রিয়া ও বর্তমান বিশ্বের উপর তাঁর বিরল-বিস্ময়কর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ।

মূল

মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী

মুফতীয়ে আযম, পাকিস্তান

মুহতামিম, জামি'আ দারুল উলূম করাচী

অনুবাদ

আবূ উসামা

শিক্ষক ও অনুবাদক

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী-১

আল্লাহর পথের মুজাহিদ

মূল ঃ মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী
অনুবাদ ঃ আবূ উসামা

প্রকাশক
আবূ আব্দিল কাদীর
মুমতায লাইব্রেরী
ঢাকা, বাংলাদেশ

পরিবেশক
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১-১৪১৭৬৪
০১১-৮৩৭৩০৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ সফর ১৪২৫ হিজরী
প্রথম মুদ্রণ ঃ জুমাদাল উখরা ১৪২৪ হিজরী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

ALLAH'R PATHER MUJAHEED
By : Mufti Muhammad Rafi Usmani
Translated by : Abu Usama
Price Tk. 140.00 US $ 10.00 only

উৎসর্গ

আফগান জিহাদে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী মুজাহিদিনে ইসলামের প্রাণপ্রিয় রাহবার, আফগান মুজাহিদদের নয়নমনি, রুশ-আফগান কমিউনিষ্ট বাহিনীর ত্রাস, অকুতোভয় খোদায়ী সিংহ, বাংলার গৌরব শহীদ আবদুর রহমান ফারুকী (রহঃ)এর স্মরণে।

যিনি শত্রু শিবিরে আক্রমণের পথ পরিস্কার করতে গিয়ে ভূমিমাইন বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে মাইন বিস্ফোরণে যখন তাঁর একটি হাত সম্পূর্ণরূপে উড়ে গেছে এবং পেট ফেটে নাড়িভূড়ি বেরিয়ে পড়েছে তা সত্ত্বেও যিনি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মত স্থির ও পরিস্কার কণ্ঠে উপস্থিত সাথীদেরকে বলে যাচ্ছিলেন..... জিহাদের এই বেহেশতী কাফেলাকে তোমরা এগিয়ে নিয়ে যাবে। কোন অবস্থাতেই জিহাদ পরিত্যাগ করবে না। সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের সুমহান ঝাণ্ডা উড়ানোর পূর্বে থামবে না......

আমাকে শত্রু শিবিরের যত নিকটে পার, কবর দিও। আফগানিস্তানের 'লিজা' অঞ্চলে পাহাড়ী ঝর্ণার পাদদেশে যিনি ঘুমিয়ে আছেন। যার উত্তরসূরীরা হাজারো প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে জিহাদী মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকেও এই পবিত্র কাফেলায় শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন ।

আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

অনুবাদক

انْفِرُوا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা (জিহাদের) অভিযানে বের হয়ে পড়, স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে, নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে।

(সূরা তাওবা, ৪১ আয়াত)

প্রসঙ্গ কথা

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

জিহাদ ফরয

অর্থ ঃ তোমাদের উপর জিহাদ (সশস্ত্র যুদ্ধ) ফরয করা হলো। অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকট হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর কোন একটি বিষয় হয়তো তোমাদের নিকট পছন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জাননা।

(সূরা বাকারা, ২১৬ আয়াত)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত আয়াতে জিহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলোর দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে— كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 'তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো।' এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জিহাদ করা ফরয। তবে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরয, সবসময় সর্বাবস্থায় ফরযে আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না। বরং এটা ফরযে কিফায়াহ। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে এবং শত্রুর মোকাবেলায় তাঁরা যথেষ্ট হয়, তাহলে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা

আবশ্যক, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে জিহাদ ফরযে কিফায়াহ হলেও মুসলমানদের নেতা যদি প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করেন, তখন সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে হাকীমের সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ الخ

অর্থাৎ, 'হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) বের হও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।'

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন আদেশ দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনিভাবে সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় এবং জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। আর যখন জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আকীদায়ে জিহাদ ঃ

জিহাদ সম্পর্কে একজন মুসলমানের আকীদা কি হওয়া উচিত? এ বিষয়টি ভালমতো জেনে-বুঝে মনে রাখতে হবে এবং সেমতে নিজ নিজ আকীদা প্রয়োজন হলে সংশোধন করে নিতে হবে।

জিহাদ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র লড়াই ইসলামের অলংঘনীয় ও অকাট্য ফরযসমূহের মধ্য হতে একটি ফরয। সুতরাং এই ফরয (জিহাদ) অস্বীকারকারী ব্যক্তি ঐরূপই কাফের, যেরূপ নামায-রোযা অস্বীকারকারী কাফের। জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পর বিনা উজরে

জিহাদ ত্যাগ করা মারাত্মক গোনাহ্ এবং এ বিষয়ে অহেতুক বিতর্ক করা স্পষ্ট গোমরাহী।

পূর্বোল্লেখিত আয়াত (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) এবং নিম্নোক্ত হাদীসসহ একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীস এ বিষয়ের স্পষ্ট দলীল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ-

অর্থ ঃ আমাকে লোকদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ –এর স্বীকৃতি দিবে (অর্থাৎ হয়তো তারা মুসলমান হয়ে যাবে অথবা ইসলামী হুকুমতের আনুগত্য স্বীকার করে জিযিয়া আদায় করবে) সুতরাং যে لا اله الا الله বললো, সে স্বীয় জীবন এবং সম্পদকে আমার হাত থেকে সংরক্ষণ করে নিলো শরীঅতের হক ব্যতীত, এবং তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।

(বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসে জিহাদ ফরয হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রতিরোধমূলক জিহাদ নয় বরং আক্রমণাত্মক জিহাদের কথা বলা হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম ও জিহাদ

আল্লাহ পাকের নির্দেশে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ফলে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সহ সর্বস্তরের ও সর্বকালের উলামায়ে কিরাম-ই জিহাদকে জান্নাত লাভের সহজ উপায় মনে করে জান–মাল সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে জিহাদ করেছেন এবং অনেকে শাহাদাতের সৌভাগ্যও লাভ করেছেন।

বেশী দূরের নয় নিকট অতীতের কথা। ইংরেজ বেনিয়া যখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা হরণ করে মুসলমানের ঈমান ও আমলের মহান দৌলত কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন তাদের অপবিত্র হাত থেকে এ দেশের মুসলমানের ঈমান–আমল ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সাইয়্যেদুত তায়েফাহ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)কে

আমীরুল মুমিনীন, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ)কে কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) এবং হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ)কে সেনাপতি নির্ধারণ করে ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক জিহাদ আরম্ভ করা হয়। তখন যদিও এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হতে পারেননি এবং পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয় ফলে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) হিজরত করেন। কিন্তু তাদের এই জিহাদই পরবর্তীতে হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ হয়।

পরবর্তীতে এই জিহাদী চেতনাকে লালন ও মুজাহিদ তৈরীর মানসেই দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অধঃপতনের এই যুগেও পৃথিবীর যেখানেই জিহাদী জযবা সম্বলিত ইসলামী পুনর্জাগরণের বাতাস প্রবাহিত হতে দেখা যায়, সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারুল উলূমের কোন না কোন রূহানী সন্তানের ভূমিকা অবশ্যই দেখা যায়।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, কতিপয় আলেম ক্ষমতা দখলের প্রচলিত নোংরা রাজনীতির শিকার হয়ে জিহাদের শাশ্বত সুন্দর এই পথকেই কেবল ত্যাগ করেছেন তা নয় বরং তারা আকাবিরদের জিহাদী তৎপরতার অপব্যাখ্যা করে 'জিহাদ ছেড়ে আন্দোলনের পথে' ইত্যাদি শিরোনামে নিবন্ধ ফাঁদার অপপ্রয়াসও চালাচ্ছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ সকল অপতৎপরতার মুখোশ উন্মোচন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আফগান জিহাদও মূলতঃ দারুল উলূম দেওবন্দের জিহাদী চেতনারই ফসল। কারণ, আফগান জিহাদে যে সকল দেশী-বিদেশী মুজাহিদ উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অধিকাংশই দারুল উলূম দেওবন্দের রূহানী সন্তান—কওমী মাদ্রাসার উস্তাদ, ছাত্র ও তাদের অনুসারীগণ। এ সকল মুখলিস আলেম ও তালিবে ইলমের পদচারণার বরকতে আফগান জিহাদ চলাকালীন যারাই রণাঙ্গনে কিছু সময় অতিবাহিত করেছেন, তাদের প্রায় সকলেই হাদীস, সিয়ার ও মাগাযীর কিতাবসমূহে পড়া সাহাবায়ে কিরামের যুগের জিহাদের ময়দানের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি সেখানে দেখেছেন।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

বক্ষমান গ্রন্থের রচয়িতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম। পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী দেওবন্দী (রহঃ)এর সুযোগ্য সন্তান। তিনি বর্তমানে পাকিস্তানের প্রধান মুফতী এবং পাকিস্তানের অন্যতম দ্বীনী প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম করাচী'–এর মুহতামিম। ইলম ও আমলের বাস্তব সমন্বয় যে সকল আলেমের মধ্যে দেখা যায়, হযরত মুফতী ছাহেব সে সকল বিরল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম। যার দরুন দ্বীনের প্রায় সকল শাখায় তার ভূমিকা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। এ গ্রন্থের পাঠকমাত্রই অনুধাবন করবেন যে, হৃদয়ের কত গভীর থেকে তিনি পৃথিবীর চলমান অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং দ্বীনের এই মহান ফরিযা জিহাদের ক্ষেত্রে স্বশরীরে ভূমিকা পালন করাটাকে নিজের জন্য কিরূপ সৌভাগ্যের বিষয় বলে বিবেচনা করেছেন। একজন প্রকৃত আল্লাহওয়ালা যুগ সচেতন আলেম এমনই হওয়া উচিত। শুধু কেবল হযরত মুফতী ছাহেবই নন। হক্কানী আলেমদের প্রায় সকলেরই এ অভিন্ন অবস্থা ও বক্তব্য। আমার এখনো সেই অপূর্ব দৃশ্য অন্তরের মনিকোঠায় সংরক্ষিত আছে যে, বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের দশজনের একটি জামা'আত যখন জিহাদের পবিত্র ভূমি আফগান সফর করে আসলেন, তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন 'বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদের ঈমান–আমল, ইজ্জত–আব্রু রক্ষার উপায় হলো জিহাদ।'

আফগান জিহাদ, তালেবান ও তাগুত

সাধারণ মুসলমান তো বটেই কোন কোন আলেমও আফগান জিহাদের ফলাফল, তালেবানের উত্থান–পতন ও আমেরিকার আগ্রাসনের ভয়ানক চিত্র দেখে হতাশায় মুষড়ে পড়েন। প্রথম কথা হল, মুসলমান কোন অবস্থাতেই হতাশ হয় না। এটা তাঁর ঈমানী গায়রতের পরিপন্থী। তাছাড়া মুসলমানের জয়–পরাজয় দুনিয়ার অপরাপর জাতীয় জয়–পরাজয়ের মতো নয়। আফগান জিহাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানের মধ্যে জিহাদের ভুলে যাওয়া জযবা ও চেতনাকে পুনর্জীবন দান। যার ফলে সমগ্র দুনিয়ায়ই জাগৃতি এসেছে।

তৎকালীন অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে। মধ্য এশিয়ার ঐ সকল ইসলামী রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে, কমিউনিজমের লালস্রোতে যার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়া নির্লজ্জভাবে নাকে খত দিয়ে তার অপরাজেয় (?) বাহিনী আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল।

পরবর্তীতে ক্ষমতার লোভে কতিপয় আফগান নেতা (যাদের কেউই আলেম নন) আদর্শ থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তারা তেমন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। কারণ, যখনই তারা সমগ্র দুনিয়ার তাগুতি শক্তির ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে আফগান মুজাহিদ ও শহীদদের কুরবানী দুনিয়ার হীন স্বার্থে বিক্রি করার সব আয়োজন সম্পন্ন করেছে, ঠিক তখনি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতরূপে মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে তালেবানের উদ্ভব ঘটে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা আফগানিস্তানে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী এমারাত প্রতিষ্ঠা করে দেশের জনগণকে ইসলামের সোনালী যুগের শান্তি-শৃংখলা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফ উপহার দিয়ে প্রমাণ করেন যে, আখেরী যমানার ফিতনা-ফ্যাসাদ, জুলুম-অত্যাচার ও দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে যদি শান্তি সমীরণ প্রবাহিত করতে হয় তাহলে তার বিকল্পহীন একমাত্র পথ হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদী আদর্শের অনুসরণ করে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তালেবান প্রতিষ্ঠিত ইসলামী এমারাতে যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সামান্য কয়েকটি দিন কাটানোর সুযোগ পেয়েছেন, তারাই নির্দ্বিধায় একথা বলেছেন যে, শান্তি-শৃংখলা, নিরাপত্তা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে দৃশ্য আমরা এখানে দেখেছি তা দুনিয়ার কোথায়ও নেই।

পরবর্তীকালে সমগ্র দুনিয়ার কুফরী ও ইসলাম বিরোধী শক্তির সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে দুনিয়ার একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার যখন সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করা হয়, তখন ইসলামী নেতৃত্ব জিহাদী আদর্শ ছেড়ে তথাকথিত আন্দোলনের পথে পা বাড়াননি বরং কৌশলগত কারণে সাময়িকভাবে তারা ক্ষমতার হাত বদল করেছেন এবং তাগুতী শক্তির দর্পচূর্ণ করার জন্য গেরিলা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছেন। ইসলাম বিরোধী প্রচার মাধ্যমের অসহযোগিতা এবং তাগুতী মোড়ল বিশ্ব-বেহায়া আমেরিকার শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমেরিকা ও তার মিত্রদের অসহায়

অবস্থার করুণ চিত্র প্রায়ই আজকাল পত্র–পত্রিকার সৌন্দর্য বর্ধন করে থাকে।

বক্ষমান গ্রন্থ আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী–১ 'আল্লাহর পথের মুজাহিদ' মূলতঃ এমন একটি গ্রন্থ যা আলেম, তালেবে ইলম, মুজাহিদ, সাধারণ মুসলমান, ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মী সকলেরই অবশ্য পাঠ্য, কারণ এই বই কেবল যে, আফগান জিহাদের তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ তা নয়, বরং এটি কুরআন–হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব–ফযীলত প্রয়োজনীয়তা এবং আফগান জিহাদে আল্লাহ পাকের রহমতের বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সমাহার।

পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা এটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করছি। পরবর্তী খণ্ড আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী–২ 'জানবাজ মুজাহিদ' আরো আকর্ষণীয় এবং আরো বিস্ময়কর।

আমরা বইটিকে সার্বিক সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দিবো। ইনশাআল্লাহ।

এই বই পড়ে যদি কারো মধ্যে জিহাদী চেতনা জাগ্রত হয় এবং কুফর ও তাগুতের বিরুদ্ধে জান–মাল সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে আল্লাহর পথের মুজাহিদ হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
আবূ আব্দিল কাদীর
২৫শে জুমাদাল উলা
১৪২৪ হিজরী

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی
دونیم ان کی ٹھوکر سے صحراء و دریا
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা এসব
তোমার আজব বান্দা এরা,
হৃদয়ে যাদের দিয়োছো তুমি
তোমার প্রেমের আকুল ধারা।
ময়দানে যারা আঘাত হানে
দরিয়ায় তোলে ঝড়–তুফান,
শৌর্যে যাদের পর্বতমালা
ভেংগে চুরে হয় খান খান।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুশমনের ব্যর্থ চাল	১৭৯
স্বল্পবয়সী এক মুজাহিদের আত্মবিশ্বাস	১৭৯
বিরল–বিস্ময়কর ও অপূর্ব প্রশান্তি	১৮০
হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)এর বাণী	১৮২
ব্যর্থচালের কার্যকরী জবাব	১৮৩
বিশটি ফায়ার, যার প্রত্যেকটি যথাস্থানে আঘাত হানে	১৮৫
এন্টিএয়ার ক্রাফ্টও গর্জন করতে থাকে	১৮৬
শত্রুর অস্থিরতা	১৮৮
আমীরের আনুগত্য	১৮৮
জিহাদের অপর একটি কারামত	১৯১
মিসাইলের ট্রাক	১৯২
আজকের লড়াইয়ে দুশমনের ক্ষয়ক্ষতি	১৯৩
১৮ই শা'বান ১৪০৮ হিজরী, ৬ই এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী, বুধবার	১৯৪
জিহাদ ও পান	১৯৪
প্রত্যাবর্তন	১৯৫
হরকতের আমীর কারী সাইফুল্লাহ আখতার	১৯৭
তিনটি বিমান ভূপাতিত করেন	১৯৮
দুশমনের চৌকি অবরোধ	১৯৯
মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা	২০০
নেক মুহাম্মাদ কেল্লা বিজয়	২০১
শিক্ষা সমাপনের কুদরতী ব্যবস্থা	২০২
জিহাদ তিন প্রকার	২০৫
১৯শে শাবান ১৪০৮ হিজরী, ৭ই এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী, বৃহস্পতিবার	২০৮
সাপ–বিচ্ছু ঃ জিহাদের আরেকটি কারামত	২১০
২০শে শা'বান ১৪০৮ হিজরী, ৮ই এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী, শুক্রবার	২১৩
বড় বোনের ইন্তিকাল	২১৪
কমাণ্ডার যুবায়েরের পত্র	২১৬
শহীদের জান্নাতে ইফতার	২১৮
জেনেভা চুক্তি এবং পাকিস্তান	২২০

বিষয়	পৃষ্ঠা

॥ ॥ ॥

نصر من الله وفتح قريب

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রারম্ভিকা

نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আফগানিস্তানের জিহাদ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পরেই মুজাহিদদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। দারুল উলূম করাচীর অনেক তালিবে ইলমও বার্ষিক ছুটিতে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তাদের অনেকে শহীদ হন। কেউ কেউ আহত হন। কিন্তু রণাঙ্গনে যাওয়ার বাসনা নিয়েই আমার কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। অবশেষে ১৯৮৮ ঈসায়ীর এপ্রিলে আল্লাহ তাআলা আমার এ বাসনা পূর্ণ করেন। সে সময় আফগান জিহাদ তুঙ্গে অবস্থান করছিল। আল্লাহ তাআলা অধমকে বহুসংখ্যক বন্ধুসহ পাকতিকা প্রদেশের উরগুনের একটি ছোট লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন। আমাদের দ্বিতীয় সফর হয় ১৯৯১ ঈসায়ীর আগস্টে। সেখানকার একটি ছোট লড়াইয়ে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে। আফগান জিহাদ তখন শেষ পর্যায়ে এবং গার্দেজের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ করার প্রস্তুতি জোরেশোরে চলছিল।

প্রথম সফরেই জিহাদের যে ঈমানদীপ্ত অবস্থা, সহায় সম্বলহীন মুজাহিদদের প্রাণ উৎসর্গের যেসব উৎসাহব্যঞ্জক কর্মকাণ্ড এবং আল্লাহ তাআলার নুসরাতের যেসব বিস্ময়কর ঘটনাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি ও শ্রবণ করি। তাছাড়া ইতিহাস সৃষ্টিকারী জিহাদের যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমগ্র বিশ্বের উপর পড়বে তার কিছুটা ধারণা হয় এবং তা আমার উপর তাৎক্ষণিকভাবে দু'ধরনের প্রভাব ফেলে।

প্রথমতঃ আমি দৈহিকভাবে রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাবর্তন করলেও আমার মন-মস্তিস্ক সর্বদা সেখানেই পড়ে থাকে। মুজাহিদদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অধিকতর গভীর হয়। এমন কোন দিন বা সপ্তাহ খুব কমই অতিবাহিত হয়, যখন সেখানকার তাজা খবর ও নতুন পরিস্থিতি সরাসরি মুজাহিদদের নিকট থেকে অবগত হইনি।

দ্বিতীয়তঃ আমি তীব্রভাবে অনুভব করি যে, ইতিহাস সৃষ্টিকারী এ জিহাদ আমাদের একেবারে প্রতিবেশী দেশে সংঘটিত হচ্ছে। যা ইসলামের

সোনালী যুগের গৌরবোজ্জল দাস্তানকে জীবন্ত করেছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান, বরং অনেক বিশিষ্টজনও এই জিহাদের পট ও প্রেক্ষাপট, এতে সংঘটিত ঘটনাবলী এবং এর সম্ভাব্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। এ সম্পর্কে তারা শুধুমাত্র পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত কিংবা রেডিওতে সম্প্রচারিত দু' একটি অস্পষ্ট সংবাদ জানতে পারে। যে অবস্থায় এবং যে আঙ্গিকে এ জিহাদ সংঘটিত হচ্ছে তার ছিটেফোটাও তাদের নিকট পৌছায়নি। এ উপলব্ধিই আমাকে এ বই লিখতে উদ্বুদ্ধ করে।

বইটি মূলত উরগুন রণাঙ্গনের সফরনামারূপে আরম্ভ হলেও বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে জিহাদ যতই বিজয়পানে অগ্রসর হতে থাকে লেখার কাজও তার পদচিহ্ন ধরে মন্থরগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। নতুন নতুন সংবাদ এবং তাজা ও নির্বাচিত ঘটনাবলী তার কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকে। বইটি আফগান জিহাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না হলেও নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, কোন ঐতিহাসিক যখন আফগান জিহাদের উপর বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করবে, তখন সে এ ক্ষুদ্র লেখা থেকে যেসব উপাদান লাভ করবে, তা প্রামাণ্য উপাদানই হবে, ইনশাআল্লাহ। বইটিতে জিহাদের প্রায় সকল দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, তবে কয়েকটি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আরোপ করা হয়েছে—

১. এ বইয়ে সে সকল অখ্যাত গাজী ও শহীদের বীরত্ব ও কৃতিত্ব বিশেষভাবে বর্ণনা করেছি, যারা প্রচার মাধ্যমসমূহ পর্যন্ত পৌছতে পারেননি এবং সেদিকে তারা মনোযোগও আরোপ করেননি। কারণ, বিজয়গাঁথা বর্ণনাকালে সাধারণত জাতীয় নেতা, সিপাহসালার ও বড় বড় কমাণ্ডারদের কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা সবাই বর্ণনা করে থাকে, কিন্তু সচরাচর অখ্যাত মুজাহিদ ও শহীদদেরকে বিস্মৃত হয়ে যায়, অথচ তাদের প্রাণ উৎসর্গ করা ও সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া বাহ্যত সম্ভবপর ছিল না। আফগানিস্তানের পুনরায় আযাদী লাভ করাও প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের আত্মত্যাগেরই ফল।

২. গেরিলা যুদ্ধের যে সমস্ত পন্থা আফগান জিহাদে প্রয়োগ করা হয়েছে, তার যে সমস্ত সূক্ষ্ম দিক আমি স্বচক্ষে দেখেছি কিংবা অন্যের মাধ্যমে অবগত হয়েছি, সেগুলোও বিশেষভাবে বর্ণনা করেছি। কারণ,

আফগান জিহাদ বাহ্যত সেই বিশ্বব্যাপী জিহাদের সূচনা, যার পদধ্বনি কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া ও তাজিকিস্তানে শ্রুতিগোচর হচ্ছে। আল্লাহই ভাল জানেন, এমন আরো কত নতুন নতুন রণাঙ্গন সৃষ্টি হবে। গেরিলা যুদ্ধের বিস্তারিত এ আলোচনা দ্বারা ভবিষ্যতের মুজাহিদগণ বিশেষভাবে পথনির্দেশ লাভ করতে পারবেন এবং রণাঙ্গনের ভীতি অন্তর থেকে বিদূরিত হবে বলে আমরা আশা করছি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রায় উপযুক্ত সকল স্থানেই এতদসংক্রান্ত কুরআন-হাদীসের শিক্ষাও লিপিবদ্ধ করেছি।

৩. আফগান মুজাহিদ এবং আরব মুজাহিদদের কীর্তিগাঁথা তো আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় কিছুটা হলেও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানী মুজাহিদগণ চরম অসহায় অবস্থায় যে সমস্ত বিস্ময়কর কর্ম সম্পাদন করতে থাকেন এবং নিজেদের প্রাণের নজরানা পেশ করতে থাকেন, সে সম্পর্কে খুব কম মানুষই অবগত রয়েছে। বিধায় আমি সেগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এর আরেকটি কারণ এও ছিল যে, পাকিস্তানী মুজাহিদদের সঙ্গেই আমার অধিকতর নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বিধায় তাদের ঘটনাবলী আমি অধিক যাচাই ও আস্থার সঙ্গে লেখার সুযোগ লাভ করেছি। আফগান সংগঠনসমূহের এবং তাদের নেতাদের যে সমস্ত কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা আমি ঠিক এই পরিমাণ যাচাই ও নিশ্চয়তার সঙ্গে পেয়েছি, সেগুলোও গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছি।

৪. ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আমি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মেনে চলেছি—

ক. ঘটনাটি যে মুজাহিদের সঙ্গে অথবা যার সম্মুখে ঘটেছে যথাসম্ভব সরাসরি তার মুখ থেকে আমি তা শ্রবণ করেছি। অনেক সময় বারবার শুনে সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিয়েছি। ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য মুজাহিদের নিকট থেকেও বিষয়টি যথাসম্ভব যাচাই করেছি। কোন ঘটনার সত্যতা আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বে আমি তা লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থেকেছি।

খ. এই জিহাদের বিরল ও বিস্ময়কর কারামতসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলার নুসরাতের কিছু ঘটনা আমি শায়েখ আবদুল্লাহ আয্যামের আরবী কিতাবসমূহ থেকেও গ্রহণ করেছি। ঘটনার সঙ্গে উক্ত কিতাবের উদ্ধৃতিও তুলে ধরেছি। জিহাদ চলাকালে শায়েখ আবদুল্লাহ আয্যামের

সঙ্গে আমার বারবার মোলাকাত হয়েছে। যারা তাঁকে নিকট থেকে দেখেছেন, তারা তাঁর পরহেজগারী, সাবধানতা এবং আফগান জিহাদে তাঁর গভীর দৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আফগানিস্তানের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে আরব মুজাহিদদের নেতৃত্ব দান করেন এবং এ কাজেই শহীদ হন। তিনি নিজেও তাঁর রচিত 'আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান' (পৃষ্ঠা ৩৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'আমি এ সমস্ত ঘটনা শুধুমাত্র এমন মুজাহিদদের থেকে গ্রহণ করেছি, যাদের সঙ্গে বা যাদের সম্মুখে এসব ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা বর্ণনাকারী মুজাহিদদের নিকট থেকে অনেক সময় আমি হলফও নিয়েছি।'

গ. কিছু ঘটনা আমি পাকিস্তানী মুজাহিদদের সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী'–এর মুখপত্র 'মাসিক আল ইরশাদের' উদ্ধৃতি দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু আমি সংশ্লিষ্ট মুজাহিদদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এসব ঘটনা যাচাই করেছি।

বর্ণিত ঘটনাসমূহ যাচাই ও তদন্ত করতে গিয়ে আমি মুজাহিদ বন্ধুদেরকে বারবার কষ্ট দিয়েছি, বিরক্ত করেছি। আমি তাদের কাছে এ জন্য কৃতজ্ঞ যে, তারা আমার দেওয়া কষ্ট আনন্দচিত্তে মেনে নিয়েছেন। বরং আমার এমন অনেক প্রশ্নেও তারা বিরক্ত হননি, যেগুলো তাদের নিকট হয়তো অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে। যেমন আমি প্রশ্ন করেছি ঃ 'যে পাহাড়ের পাদদেশে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেটি কত উঁচু ছিল? আপনি তার কোন্ দিকে ছিলেন? পাহাড়টি পাথরের ছিল নাকি তাতে গাছপালা ছিল? আপনার সঙ্গে আর কে কে ছিল? কতটার সময় ঘটনাটি ঘটেছে? আবহাওয়া কেমন ছিল? ইত্যাদি।'

১৯৮৮ ঈসায়ীতে বই লিখতে আরম্ভ করি। যতটুকু পাণ্ডুলিপি তৈরী হত, তা করাচী থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আল বালাগ' এবং লাহোর থেকে প্রকাশিত 'কওমী ডাইজেষ্ট' পত্রিকায় 'জিহাদে আফগানিস্তান মেঁ সাত দিন' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে। 'আল বালাগ' পত্রিকায় ১৪০৯ হিজরীর রবিউস সানী (ডিসেম্বর ১৯৮৮) থেকে আরম্ভ করে ১৪১১ হিজরীর রমাযান মাস (১৯৯১এর এপ্রিল) পর্যন্ত ২০ পর্বে প্রকাশ পায়। এর কিছু অংশ লাহোর থেকে প্রকাশিত 'উর্দূ ডাইজেষ্ট', করাচী থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক তাকবীর' এবং 'দৈনিক জং'

পত্রিকাতেও প্রকাশ পায়। তা ছাড়া মুজাহিদদের সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী' ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর যতটুকু পাণ্ডুলিপি তৈরী হত, তা দিয়ে এ বইয়ের তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করে।

দেশ ও বহির্দেশের পাঠক ও কলামিষ্টগণ বইটি অসাধারণভাবে পছন্দ করেন। চিঠি ও সাক্ষাতে এ বইয়ের ব্যাপক উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন। এ বই পড়ে অনেক নারী–পুরুষ টাকা পয়সা ও রসদ দ্বারা মুজাহিদদেরকে সহযোগিতা করেন। অনেক তরুণ মুজাহিদদের কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত হন। ফলে আশা করি যে, এ তুচ্ছ প্রচেষ্টা মহান আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন।

কিন্তু উপরোক্ত মুদ্রণসমূহে শুধুমাত্র উরগুন (পাকতিকা প্রদেশ) বিজয় পর্যন্তের ঘটনা এসেছে। পরবর্তীতে ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে লেখার গতি অতি মন্থর হতে হতে এক পর্যায়ে দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকে।

সুধী পাঠক! বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ আপনাদের হাতে। এটি পরিমার্জিত এবং পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ ও নির্বাচিত ঘটনাবলীর সমন্বিত সংস্করণ। এতে দুশ'র অধিক পৃষ্ঠা নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে।

মনে রাখবেন, এটি আফগান জিহাদের বিবরণ। যে জিহাদে পনের লক্ষ শহীদ নিজেদের বুকের খুন ঝরিয়ে শুধুমাত্র আফগানিস্তানকে কুফুরী আগ্রাসন থেকে পুনরায় স্বাধীন করেছেন তা নয় বরং পাকিস্তান ও তার উপকূল ধরে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে কমিউনিজমের আগ্রাসনের যে মারাত্মক বিপদাশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তাও প্রতিরোধ করেছেন, শুধু তাই নয়, বরং এ জিহাদ বহু দেশের আযাদীর দ্বার উন্মোচন করেছে। যার মধ্যে নয়টি মুসলিম দেশও শামিল রয়েছে।

আফগানিস্তান জয় করার পর কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়ে ক্ষমতার মসনদ দখলের হীন প্রচেষ্টায় যে হাতাহাতি হয় এবং যার ফলে সেখানকার রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের নেতারা আজ পর্যন্ত স্বদেশের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি ; এটি সেই বিপর্যয়ের বিবরণ নয়।

পদলিপ্সার কারণে সংঘটিত লজ্জাস্কর এ গৃহযুদ্ধ ইসলামের দুশমনদের জিহাদ ও মুজাহিদদের নিয়ে উপহাস করার সুযোগ করে দেয়। তবে তালেবান রূপে যে বিরাট শক্তি এখন আফগানিস্তানে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে আশা জাগে যে, কুফুরী শক্তির মোকাবেলায়

আফগানিস্তানের জিহাদে যে বিশাল কুরবানী দেওয়া হয়েছে, এখন তা সার্থক হতে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তালেবানের ঊর্ধ্বমুখী ও আশাব্যঞ্জক এ শক্তিকে নফস ও শয়তানের যাবতীয় কূটকৌশল ও প্রতারণা থেকে এবং ইসলামের দুশমনদের সর্বপ্রকার চক্রান্ত থেকে নিরাপদ রাখবেন। তাদেরকে ইসলামের পুনর্জাগরণের তাওফীক ও যোগ্যতা দানে ভূষিত করবেন।

কাবুল বিজয়ের পরবর্তী ঘটনাবলী মুসলিম উম্মাহকে এ শিক্ষাও দান করে যে, আমাদেরকে শুধু প্রকাশ্য কাফের দুশমনদের সঙ্গেই নয়, বরং একই সাথে নিজের সেই কুপ্রবৃত্তির সঙ্গেও পূর্ণাঙ্গ জিহাদ করতে হবে, যা এই পবিত্র জিহাদের উৎকৃষ্ট ফলাফল থেকে আজও উম্মতকে মাহরুম রেখেছে।

যাই হোক, জিহাদের এ বিবরণ মুসলিম উম্মাহর সম্মুখে সফলতার সেই রাজপথের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দান করবে, যে রাজপথ ধরে নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল মুজাহিদগণ সুদীর্ঘ ১২ বৎসর পথ চলে বিশ্বের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছেন। এ রাজপথ পরম ধৈর্যসংকুল হলেও এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতে গিয়ে পৌঁছায়, যার জন্য আমরা বহু শতাব্দী ধরে প্রতীক্ষা করেছি এবং যা এই জিহাদের অন্তরাল থেকে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সেই শুভ ভবিষ্যত তখনই লাভ করা সম্ভব হবে, যখন নিজেদের কুপ্রবৃত্তির সঙ্গেও পূর্ণাঙ্গ জিহাদ করা হবে।

کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتار میں
آنے والے دور کی دھندلی سی اک تصویر دیکھ

দৃষ্টি উন্মোচন করে আমার কথার দর্পণে
অনাগত ভবিষ্যতের অস্পষ্ট একটি চিত্র অবলোকন কর।

মুহাম্মাদ রফী' উসমানী
দারুল উলূম করাচী।
২৩শে রমাযানুল মুবারক, ১৪১৯ হিজরী
১২ই জানুয়ারী, ১৯৯৯ ইং

আকাশ পথে

সকাল ঠিক আটটায় পি.আই.এ. এর বিমান করাচী থেকে মুলতানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। আমার হৃদয়ে তখন এক অপূর্ব ও অবর্ণনীয় আবেগ ও উচ্ছাস বিরাজ করছিল। মুলতান পরবর্তী যে দীর্ঘ সফর আমরা করতে যাচ্ছি, তার মধুময় কল্পনাই হৃদয়ে এক অপার্থিব পুলক ও অনাবিল আনন্দের শিহরণ সৃষ্টি করছিল। আমরা আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পাকতিকা প্রদেশের উরগুন রণাঙ্গনে যাচ্ছি। আফগানিস্তানের ব্যাপারে তখনও 'জেনেভা সমঝোতা' স্বাক্ষরিত হয়নি। বরং তখনও এ ব্যাপারে আলোচনা অব্যাহত ছিল। সমগ্র বিশ্বে এই সমঝোতার আওয়াজ গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

বিমান সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিল, আর আমার কল্পনা অতীত পানে উঁকি দিয়ে দেখছিল। শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত জিহাদের যতগুলো সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল, তার সবগুলোর বিস্মৃত দৃশ্য একের পর এক স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে থাকে। অতীতের ঘটনাসমূহে যেমন আবেগপূর্ণ উচ্ছাস ছিল, তেমনি শিক্ষণীয় আক্ষেপও ছিল। এসব স্মৃতির কথা আলোচনা না করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া আমি সফরনামার সঙ্গে অবিচার করা হবে বলে মনে করি। কারণ, এ স্মৃতিও সফরে আমার সহচর ছিল। বরং এসব স্মৃতিই ছিল আমার এ জিহাদী সফরের প্রেক্ষাপট।

বাল্যকাল ও জিহাদী উদ্দীপনা

বাল্যকালে যখন থেকে ইসলামী ইতিহাসের আবেগ উদ্দীপক ঘটনাবলী শুনতে আরম্ভ করি, তখন থেকে আমার মধ্যে জিহাদের স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে জিহাদের স্পৃহাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৬ ঈসায়ীতে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের যৌবন তখন আমি বালক। আমাদের পিতৃভূমি উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে আমরা বালকদের সমন্বয়ে 'বালক মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা করি। তাতে প্রায় ছয়শ' বালক নিয়মিত সদস্য ছিল। প্রতি শুক্রবার আমরা জুমআর নামাযের পর মিছিল বের করতাম। দেওবন্দের

বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করে এবং ঈমানদীপ্ত শ্লোগান দিয়ে মিছিল দেওবন্দ শহরের তহশীল ও থানা পুলিশের সমন্বিত ভবনের সম্মুখে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করত। ইংরেজ সরকারের আমলারা দূর থেকে মিছিলের শব্দ শুনতেই ভবনের গেট ভিতর থেকে বন্ধ করে দিত। ফলে আমাদের সাহস অধিকতর বৃদ্ধি পেত এবং শ্লোগানের শব্দে দিকবিদিক প্রকম্পিত হত। আমাদের মুকাবেলায় কংগ্রেসের বালকরাও মিছিল বের করতে আরম্ভ করে। তাদের সঙ্গে শ্লোগানের খুব প্রতিযোগিতা হত, কখনো কখনো পরস্পরের প্রতি ইট–পাথর নিক্ষেপও চলত। উল্লাসভরা সেই শ্লোগান আজও কানে গুঞ্জরিত হয়। মুসলমানদের যে প্রজন্ম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাদের তো প্রায় সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে প্রজন্ম পাকিস্তান হতে দেখেছে এখন তারাও বিদায় নিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু বিদায়ের পূর্বে ঐতিহাসিক সেই শ্লোগানসমূহের প্রতিধ্বনি নতুন প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও তাদের উপর বর্তায়। কারণ, সেগুলো শুধু শ্লোগানই ছিল না, বরং তা ছিল আমাদের জাতীয় সংবিধান। যা, আমাদের নেতারা খুব চিন্তা–ভাবনা করে আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন। যেমন—

পাকিস্তান কা মতলব ক্যায়া?	লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
মুসলিম, মুসলিম	ভাই, ভাই [১]
লেকে রহেঙ্গে	পাকিস্তান
দেনা পড়েগা	পাকিস্তান
বাঁটকে রহেগা	হিন্দুস্তান
বনকে রহেগা	পাকিস্তান
আপনা সার কাটায়েঙ্গে	পাকিস্তান বানায়েঙ্গে
সিনা পর গুলি খায়েঙ্গে	পাকিস্তান বানায়েঙ্গে
খুন কি নদীয়াঁ বহায়েঙ্গে	পাকিস্তান বানায়েঙ্গে
পাকিস্তান	জিন্দাবাদ
নারায়ে তাকবীর	আল্লাহু আকবার

সময় সময় আমাদের সমাবেশও হত। তাতে জিহাদের উৎসাহব্যাঞ্জক

১. আমাদের এই শ্লোগান কংগ্রেসীদের 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই' শ্লোগানের উত্তরে বলা হত।

কবিতা পাঠ ও গরম গরম ভাষণ প্রদান করা হত। সেগুলো আমাদের বড়রা আমাদেরকে তৈরী করে দিতেন।

১৯৪৭ ঈসায়ীতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ হিসেবে যখন পাকিস্তান বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে,তখন আমার বয়স ১২ বৎসর। হিন্দুদের পরিকল্পিত স্কিম মোতাবেক অকস্মাৎ দিল্লী, পূর্ব পাঞ্জাব ও দেশের বিভিন্ন স্থানসহ আমাদের চতুর্পার্শ্বে আগুন ও রক্তের বন্যা শুরু হয়ে যায়। সর্বত্র মুসলমানদের খুন দ্বারা হোলী খেলা হয়। আমরা সকলে আমাদের বড় ভাই জনাব মুহাম্মাদ যাকী কাইফী সাহেব মরহুমের নিকট 'বিন্‌নোট' (লাঠিখেলা) শিখেছিলাম। তিনি উঁচুমানের একজন কবি হওয়া সত্ত্বেও এ বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। তার শিরায় শিরায় জিহাদী জযবা কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। সে সময় লাঠিখেলা দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিন্দু মুসলিম বিবাদের সময় এ বিদ্যা খুব কাজে আসত। সেখানকার মুসলমানরা লাঠিখেলায় অদ্বিতীয় ছিল। যে কারণে স্থানীয় হিন্দুদের উপর তাদের বিশেষ প্রভাব ছিল।

প্রতিদিন খবর আসত যে, আশপাশের গ্রামের হিন্দু ও শিখরা সম্মিলিতভাবে দেওবন্দের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করবে। মুসলমানরা রাত্রিবেলায় নিজেদের মহল্লা পাহারা দিত। আমরা বালকরা নামাযের পর কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর নিকট দুআ করতাম—যেন হিন্দুদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর হামলা হয়, তীব্র লড়াই হয় এবং আমরাও তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করি। সে সময় আমাদের জানা ছিল না যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পথে জিহাদ করার অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে এ হেদায়েতও দান করেছেন যে—

لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْئَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ، فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ -

অর্থ ঃ 'শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের আকাংখা করো না। আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা কর।' (অর্থাৎ এরূপ দুআ কর, যেন যুদ্ধ ছাড়াই দুশমন পালিয়ে যায়, অথবা তারা আমাদের দাবী দাওয়া মেনে নেয়) আর

দুশমনের সঙ্গে মোকাবেলা হলে অবিচল থাক। মনে রাখবে জান্নাত তরবারীর ছায়ার তলে। (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল জিহাদ)

মোটকথা দুশমন দেওবন্দের উপর আক্রমণ করার কখনও সাহস করেনি। সম্ভবত মরহুম ভাইজান এ সময়েই নিম্নের কবিতাটি রচনা করেছিলেন—

کیا خبر تھی جرأتیں دل کی بنیں گی حسرتیں!
دیکھ کر کشتی کو طوفاں رُخ بدلتے جائیں گے

'মনের দুঃসাহস অপূর্ণতার আক্ষেপে পরিণত হবে এবং নৌকা দেখে প্লাবন দিক পরিবর্তন করে ফেলবে—এমন তো জানতাম না'!

অবশেষে ১৯৪৮ ঈসায়ীর মে মাসে সেই আক্ষেপ আর সংকল্পের সাগর হৃদয়ে বহন করে হিজরত করে পাকিস্তান চলে আসি। পাকিস্তান ছিল আমাদের জন্য রঙ্গিন স্বপ্নের বাস্তব রূপ। নিরাপত্তা ও ভালবাসার দোলনা। মুসলিম বিশ্বের আশা আকাংখার কেন্দ্রভূমি। বর্তমানে দেশটি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ। তবে এটি অসংখ্য উপকরণ, শ্রম ও সাধনার বিস্তর উপাদান পরিপূর্ণ এমন এক জাতির দেশ, যে জাতি ঈমানী উদ্দীপনায় উন্মত্ত হয়ে দেশের জন্য অনেক কিছু কুরবানী করেছিল এবং সর্বস্ব কুরবানী করার জন্যও তৈরী ছিল। তাদের সবার বিশ্বাস ও সংকল্প মরহুম ভাইজানের এ কবিতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে—

ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہیبت توڑیں گے
ہم حق کا نشان ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے
یہ سبز ہلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا
یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے
یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں
یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے
جس خون شہیداں سے اب تک، یہ پاک زمین رنگین ہوئی
اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے

১. "আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী, অহংকারের সব প্রতিমা আমরা চূর্ণ করব। বিশ্বের মাঝে আমরা সত্যের প্রতীক, বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে আমরা ক্ষান্ত হব।

২. সবুজের বুকে চন্দ্রখচিত এ পতাকা সর্বদা পতপত করে উড়তে থাকবে। এটি আযাদীর সঙ্গীত, বিশ্ববাসীকে তা শুনিয়ে আমরা ক্ষান্ত হব।

৩. বিশ্ববাসী একথা ভাল করেই অবগত আছে যে, আমরা যেমনি ফুল তেমনি আবার তরবারীও। হয় বিশ্বের বাগান সাজাব, নতুবা রক্তস্নাত হয়ে ক্ষান্ত হব।

৪. শহীদদের যে খুন দ্বারা আজ পর্যন্ত এ পবিত্র ভূমি রঞ্জিত হয়েছে, সে খুনের প্রত্যেক ফোটা থেকে ঝড় সৃষ্টি করে আমরা ক্ষান্ত হব।"

হায়! তখনই যদি সমগ্র জাতিকে সেই সঠিক পথে গতিশীল করা হত, যার জন্য জাতি উন্মুখ ছিল এবং যার জন্য জাতি নিজের সর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে বিরাট বাসনা নিয়ে এদেশ অর্জন করেছিল! হায়! এমনটি যদি হত, তাহলে আজ আমাদের ইতিহাস ও মানচিত্র ভিন্ন রকম হত!

কাশ্মীর জিহাদ

কাশ্মীরী মুজাহিদদের তীব্র ও সাঁড়াশি অগ্রাভিযানের সম্মুখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যাবতীয় প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন তথাকথিত কাশ্মীর সরকার—মুজাহিদরা এবার রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করেই ছাড়বে এই ভয়ে—কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে জম্মু স্থানান্তর করেছিল। যে সময় কাশ্মীরের জিহাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তিসমূহ মধ্যস্থতার বাহানায় ছলচাতুরীর মাধ্যমে পবিত্র এ জিহাদকে বন্ধ করে দেয়। নিজেদের জান কুরবান করে মুজাহিদরা রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল, আমাদের নেতারা আলোচনার টেবিলে বসে তাকে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দেয়। সে সময়ে কাশ্মীরের জিহাদে অংশগ্রহণ না করতে পারায় আমার আক্ষেপই রয়ে যায়।

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن

'দরবেশের একথা আমাকে ঘর্মসিক্ত করে দেয় যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সম্মুখে যখন তুমি মাথা নোয়াবে, তখন তোমার এ দেহ ও মন কিছুই আর তোমার থাকবে না।'

তারপর আমার বয়স যখন প্রায় পনের বছর, তখন পাকিস্তানের

প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহীদ লিয়াকত আলী খান মরহুম ঘোষণা করেন যে, ভারত তার নব্বই শতাংশ সৈন্য পাকিস্তান সীমান্তে সমবেত করেছে। তখন সারাদেশের জিহাদী আবেগ–উচ্ছাস দেখার মত ছিল। সে সময় মুসলিম লীগই একমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল। আর সেই ছিল তখন ক্ষমতায়। সে সময়ের কথা আজও মনে পড়ে। যখন পাকিস্তানের মুসলমানগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে উপদলে বিভক্ত ছিল না, প্রাদেশিক ও ভাষাভিত্তিক গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব ছিল না। দলীয় কোন্দল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। সমস্ত মুসলমান নিজেদেরকে শুধু মুসলমান এবং পাকিস্তানী বলে জানত।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ভর্তি

ভারতের সেই আগ্রাসী আক্রমণের সময় 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডস' সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা শুনতেই মানুষ তাতে ভর্তি হতে আরম্ভ করে। আমার শ্রদ্ধেয় পিতার অনুমতিক্রমে আমি ও আমার বড় ভাই জনাব মুহাম্মাদ ওলী রাযী সাহেব এবং ফুফাতো ভাই জনাব ফখরে আলম সাহেবও জিহাদের প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে তাতে অংশগ্রহণ করি। কয়েক মাস পর্যন্ত উৎসাহের সাথে তার প্রোগ্রামে ব্যস্ত থাকি। আমরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর লোকেরা প্রতিদিন রাত্রিবেলা শহরের সড়কে সড়কে মার্চ করতে করতে এবং জিহাদের উৎসাহব্যঞ্জক সঙ্গীত আবেগ উচ্ছাসভরে পাঠ করতে করতে রাত অতিবাহিত করতাম। যা এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করত। স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদেরকে 'মঙ্গু পীর' নামক জায়গার পিছনের পাহাড়সমূহে অনেক দিন পর্যন্ত সামরিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। যার স্বাদ ও আনন্দ আজও ভুলতে পারিনি। সেই প্রশিক্ষণের উপকারিতা আজও অনুভূত হয়।

'মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডস' সে সময় খুব জাঁকজমকের সাথে 'জিহাদ দিবস' উদযাপন করে। প্রোগ্রাম মোতাবেক আমরা সকল স্বেচ্ছাসেবক সবাই উর্দি পরিধান করে 'মীরী বেদর টাওয়ার' থেকে মার্চ করে জাতির নেতা মরহুম লিয়াকত খানের সরকারী বাসভবনের সম্মুখে সমবেত হই। ভবনটি ছিল আবদুল্লাহ হারুন রোডে। বর্তমানে তাকে 'রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন' বলা হয়। আশেপাশের সমস্ত সড়ক

স্বেচ্ছাসেবকদের সুশৃংখল সৈন্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জনসমুদ্র জিহাদের উদ্দীপনায় তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। মরহুম প্রধানমন্ত্রী উপর তলার একটি জানালা দিয়ে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে ঈমানদীপ্ত ভাষণ দান করেন। সেই ভাষণ দানকালেই তিনি ভারতকে সেই প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক ঘুষি দেখিয়েছিলেন, যার আলোচনা অনেক বছর পর্যন্ত পত্রপত্রিকার শোভা বর্ধন করে। বিশ্লেষকগণ তার বিশ্লেষণ পেশ করেন। কবিগণ একে প্রতিপাদ্য বানিয়ে তাদের কবিতাশৈলীর প্রস্ফুটন ঘটান। ঘুষিসহ তার সে ছবি এখনও মাঝে মাঝে পত্রিকায় ছাপা হয়।

যা হোক, ভারতের ভীরু সেনাবাহিনী কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে যায়। তবে আমরা এ উছিলায় জিহাদের প্রশিক্ষণ লাভের একটি ভাল সুযোগ লাভ করি। সমগ্র জাতির মধ্যে জিহাদের জযবা নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠে। 'ওয়াগা' ও লাহোরের মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ বি.আর.বি খাল অস্তিত্ব লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৬৫ ঈসায়ীর জিহাদে খালটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এবং শেষ পর্যন্ত এটি ভারতের মাথা ব্যথা হয়ে থাকে।

خام ہے جب تک ' تو ہے' مٹی کا اک انبار تو
پختہ ہوجائے تو ہے' شمشیر بے زنہار تو

'যতক্ষণ তুমি কাঁচা (অর্থাৎ জিহাদী প্রশিক্ষণহীন) ততক্ষণ তুমি মাটির স্তূপ,
আর যখন তুমি পোক্ত হবে, তখনই তুমি উন্মুক্ত তরবারী।'

সুয়েজখালের যুদ্ধ

১৯৫৩ ঈসায়ীতে যখন বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরাঈল সম্মিলিতভাবে সুয়েজ খালের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে, তখন মুসলিম দেশ মিসরের উপর থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানের বালকরা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাদের এ ব্যাকুলতা ছিল কুরআনের সেই আকীদার সহজাত আবেদন, যাকে ভিত্তি করে পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করে। অর্থাৎ,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থ ঃ 'সকল মুসলমান ভাই ভাই।' (সূরা আল হুজরাত)

এবং এটি ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাশ্বত বাণীর বহিঃপ্রকাশ—

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، اِنِ اشْتَكَي عَيْنُهُ اِشْتَكَي كُلُّهُ، وَاِنْ اشْتَكَي رَأْسُهُ اِشْتَكَي كُلُّهُ -

অর্থ ঃ 'সকল মুসলমান এক ব্যক্তির দেহতুল্য, যার চোখ অসুস্থ হলে পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মাথায় বেদনা হলে সারাদেহ বেদনার্ত হয়।' (মুসলিম শরীফ)

সে সময় আমার বয়স ছিল সতের বছর। আমি তখন দারুল উলূম করাচীর পুরাতন ভবনে (নানকওয়াড়া) দরসে নিযামীর প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়ন করি। আমরা ছাত্ররা সেই জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। আমাদের জিহাদী জযবা দেখে, দারুল উলূম করাচীর মুহতামিম শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী' সাহেব এবং শিক্ষা সচিব, আমাদের ভগ্নিপতি জনাব মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব ছাত্রদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের শুধু অনুমতিই প্রদান করেননি, বরং মিসর প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি বিমানও ভাড়া করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং যাত্রার প্রস্তুতি পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের জন্য দারুল উলূমে নগর প্রতিরক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

আরব জাতীয়তাবাদের ভূত

আমরা অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপনা সহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলাম। মিসর যাত্রার অস্থির প্রতীক্ষার সেই একেকটি দিন বিরাট বড় মনে হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই সংবাদ শুনে আমরা মুষড়ে পড়ি যে, মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের পাকিস্তানী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মিসর গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। জামাল আবদুন নাসেরের উপর তথাকথিত আরব জাতীয়তাবাদ এবং আরব দেশাত্মবোধের প্রেত সওয়ার ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, এ উসীলায় আমাদের জিহাদের প্রশিক্ষণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু মিসরের জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে না পারায় অবর্ণনীয় মনবেদনা রয়ে যায়। সমস্ত ছাত্র ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। ওদিকে জামাল আবদুন নাসের আকাবা উপসাগর হাতছাড়া করে এবং পরবর্তীর এক যুদ্ধে মিসর 'সাহারা মরুভূমি', সিরিয়া জৌলানের পাহাড়ী

অঞ্চল এবং জর্ডান মুসলমানদের প্রথম কিবলা হারায়।

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبیؐ دین بھی ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی ' اللہ بھی ' قرآن بھی ایک
کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
فرقہ بندی ہے کہیں ' اور ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں ؟!

(১) এ জাতির লাভ লোকসান এক। নবী এক। দ্বীন ও ঈমান এক। (২) কাবাগৃহ, আল্লাহ ও পবিত্র কুরআনও এক। তাহলে মুসলমানদের এক দলবদ্ধ থাকা এমন কি কঠিন ছিল? (৩) কোথাও দলাদলি, কোথাও জাতিভেদ। কোন জাতি পৃথিবীর বুকে জীবন্ত হয়ে ওঠার এই কি পদ্ধতি?

'রানকসে'র যুদ্ধ

তারপর ১৯৬৪ বা ১৯৬৫ ঈসায়ীতে আমি যখন শ্রদ্ধেয় পিতার সঙ্গে হজ্জে গিয়েছিলাম, তখন একদিন পবিত্র মক্কার একটি বাজারে এক আরব দোকানদার হঠাৎ সংবাদ শোনায় যে, রানকস এলাকায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সংবাদ শুনে মনের যে অবস্থা হয় তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার নেই। কিন্তু যখন দেশে ফিরলাম তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আমাদের নির্ভীক সৈনিকদের অপূর্ব কৃতিত্ব এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলী শিশুদের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভীরুতার হাস্যকর ঘটনাবলী প্রত্যেক আসরের মনমুগ্ধকর আলোচ্য বিষয় ছিল। এ যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অংশগ্রহণের সুযোগ আসার পূর্বেই পাকিস্তানের মুজাহিদ সৈনিকরা ভারতের অবস্থা খারাপ করে দেয়।

১৯৬৫ সনের স্মরণীয় জিহাদ

তারপর ১৯৬৫ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বরে যখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অধিকৃত কাশ্মীরের 'চাম্ব' ও 'জৌড়িয়ার' রণক্ষেত্রে তীব্রগতিতে সম্মুখে

অগ্রসর হচ্ছিল এবং পাকিস্তানের জনসাধারণ নিত্যদিন তাদের তাজা তাজা বিজয়সংবাদে স্নাত হচ্ছিল, এমন সময় ১৯৬৫ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখের শেষ রাত্রে অকস্মাৎ ভারত লাহোরের সীমান্ত 'ওয়াগার' উপর তীব্র আক্রমণ করে। আক্রমণ এমন অকস্মাৎ, সুশৃংখল ও তীব্র ছিল যে, ভারতের কমাণ্ডার ইন চীফ জেনারেল চৌধুরী ভারত সরকারকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, আজ সন্ধ্যায় আমরা লাহোরের জিম ক্লাবে আপনাদের হাতে শুরাপাত্র তুলে দিয়ে বিজয়ানন্দ উদযাপন করব। আন্তর্জাতিক সমর ও সেনা বিশেষজ্ঞদেরও নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ভোর হতে হতে লাহোর অধিকার করে ফেলবে। সুতরাং বি.বি.সি ইসলামের বিদ্বেষপূর্ণ শত্রুতায় অন্ধ হয়ে ভোর সাতটায় বিশ্ববাসীকে সংবাদ শুনিয়ে দেয় যে, ভারত লাহোর অধিকার করেছে। কিন্তু যে রণাঙ্গনে মেজর আজিজ ভাট্টির মত আল্লাহ প্রেমিক শাহাদাত লাভের জন্য তৈরী ছিলেন, সে রণাঙ্গণ জয় করে এমন কোন্ শক্তি পৃথিবীতে আছে?

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ আইয়ুব খান মরহুম বেলা এগারোটায় রেডিওতে তার জযবাপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণে জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, পানি, স্থল ও আকাশ পথে তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে। তিনি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কালিমা পাঠ করে জিহাদে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দান করেন। সে সময় জনগণের অন্তরে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, তা যারা সে ভাষণ শুনেছেন তারাই বুঝেছেন। সে ভাষণের স্বাদ ও প্রভাব আজও তাদের স্মরণ আছে। এই জিহাদেই 'শিয়ালকোট' ও 'চোণ্ডার' রণক্ষেত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ট্যাঙ্কের সর্ববৃহৎ লড়াই সংঘটিত হয়। কিন্তু এ রণক্ষেত্রে দুশমনকে মেজর শহীদ আব্বাসীর মত অকুতোভয় বীরযোদ্ধার মুখোমুখী হতে হয়। তিনি নিজের প্রাণ বাজি রেখে তাদের সমস্ত অহংকার ধূলোয় মিশিয়ে দেন।

পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর ঈগলেরা কয়েক দিনের মধ্যেই শত্রুপক্ষের বিমান বাহিনীর উপর সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করে তাদেরকে প্রায় পঙ্গু বানিয়ে ফেলে। তারা ভারতের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে শত্রুপক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছিল। তাদের নিক্ষিপ্ত প্রতিটি বোমা

দুশমনকে এ পয়গাম দিচ্ছিল—

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے
آساں نہیں مٹانا ' نام و نشاں ہمارا

"তাওহীদের আমানত আমাদের বক্ষে রক্ষিত রয়েছে,
আমাদের নাম নিশানা মিটিয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।"

শহীদ রফিকী এবং এম. এম. আলমের মত আকাশচারী শত্রুপক্ষের উপর ঈগলের ন্যায় এমনভাবে ছোঁ মারতে থাকেন যে, আকাশ পথের যুদ্ধের ইতিহাসে তারা নতুন এক অধ্যায় রচনা করেন।

سلام اس پر ہے کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں
بڑھا دیتے ہیں اک ٹکڑا ' سر فروشی کے فسانے میں

'সেই মহানবীর উপর সালাম, যাঁর ভক্ত ও অনুরক্তরা যুগে যুগে প্রাণ
উৎসর্গের উপাখ্যানে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।'

কিন্তু পাকিস্তানের মুজাহিদ সৈনিকরা যখন ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে 'ক্ষেমকারণ' জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল এবং আন্তর্জাতিক অমুসলিম শক্তিসমূহ চরমভাবে উপলব্ধি করছিল যে, উত্তেজিত এ সিংহকে প্রতিহত করা এখন ভারতের সাহসহারা সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন তাদের মাথায় 'শান্তির' চিন্তা সওয়ার হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ—বিশ্বের অমুসলিম শক্তিসমূহ যার ঠিকাদার—অবিলম্বে 'যুদ্ধ বিরতির' হুকুম জারি করে। রাশিয়া অস্থির হয়ে মধ্যস্থতায় এসে তাসখন্দে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আলোচনা করিয়ে 'তাসখন্দ ঘোষণা' জারি করে। এবার পুনরায় পরাশক্তিসমূহের চাপ কবুল করে আমাদের নেতারা এমন যুদ্ধকে হারিয়ে দেয়, পাকিস্তানের নির্ভীক সৈনিকরা শাহাদাতের বাসনা দ্বারা যা জয় করেছিলেন।

سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ

"মুসলমানদের সরলতা দেখ, আর শত্রুদের চতুরতাও দেখ।"

প্রায় সতের দিন পর্যন্ত এই জিহাদ অব্যাহত থাকে। জিহাদের একটি অপূর্ব ও বিস্ময়কর বরকত এই দেখা দেয় যে, সমগ্র জাতি যেন ফেরেশতায় পরিণত হয়ে যায়। তারা নিজেদের দলাদলি, কট্টরতা ও দলীয় সুবিধাভোগের মনোবৃত্তি ভুলে গিয়ে দুশমনের মোকাবেলায় 'সীসা

ঢালা প্রাচীরের' মত হয়ে যায়। সেই সতের দিনে সারা দেশে চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। দুই ব্যক্তির মাঝে কলহের কোন রিপোর্ট থানায় রেকর্ড করা হয়নি। এতদ্ব্যতীত পবিত্র এ জিহাদ চলাকালে প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে এমন বিরল ও বিস্ময়কর কারামত এবং আল্লাহ তাআলার নুসরাত প্রকাশ পায় যে, সমগ্র বিশ্বের সাংবাদিকরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়। পাকিস্তানী মুসলিম সেনাবাহিনীর অসাধারণ শক্তি সম্পর্কে বিশ্ব এই প্রথম অবগত হয়। এ সময় সমগ্র বিশ্ব তাদের সামরিক দক্ষতা ও বীরত্বের স্বীকৃতি দেয়।

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

'এরা সেই শিশির, যা মনের মনিকোঠাকে শীতল করে।
এরা সেই প্লাবন, যা সমুদ্র বক্ষকে প্রকম্পিত করে।'

আমার এক বন্ধুর বন্ধু এই জিহাদে রাজস্থানে সেনা অফিসার ছিলেন। তিনি স্বাধীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। এমনকি নামায–রোযারও ধার ধারতেন না। তিনি সেখান থেকে আমার বন্ধুর নিকট প্রেরিত পত্রে লেখেন যে, 'আমি এ জিহাদে আল্লাহ তাআলাকে যেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি সমস্ত গোনাহ থেকে তাওবা করে নিয়মিত নামায পড়তে আরম্ভ করেছি। এখন বিজয় বা শাহাদাত লাভই আমার জীবনের পরম লক্ষ্য।'

স্বেচ্ছাসেবকদের রণক্ষেত্রে যাওয়ার জরুরতও হয়নি এবং অনুমতিও ছিল না। জনসাধারণকে শুধুমাত্র নগর রক্ষা এবং প্রাথমিক চিকিৎসাসেবায় পুরোপুরি অংশগ্রহণের কথা বলা হয়। আমি সে সময় দারুল উলূম করাচীর সিনিয়র শিক্ষক ছিলাম। আমরা এখানকার খোলা আকাশে পাক বিমান বাহিনীর ঈগলদেরকে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, ফিরে আসতে, পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং দুশমনকে তাড়িয়ে দিতে ও ভূপাতিত করতে দেখতাম। তাদের বীরত্ব দেখে নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে এবং হৃদয় দুআয় ভরে যেত। স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে আমার কয়েকটি রাত নগর রক্ষার কাজে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য হয়। আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু রণাঙ্গনে যাওয়ার আক্ষেপ থেকে যায়।

ভারতবর্ষে জিহাদ করার বিশেষ ফযীলত

এ কথা খুব কম মানুষই অবগত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভারতবর্ষে জিহাদকারীদের বিশেষ ফযীলত গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন—

عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي احرز هُمَا اللّٰهُ مِنَ النَّارِ، عِصَابَةٌ تغزو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيْسَي ابْنِ مَرِيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -

অর্থ ঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন দুটি দল রয়েছে, যাদের জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লিখে দিয়েছেন। একদল তারা, যারা হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে, আর দ্বিতীয় দল হলো, যারা (শেষ যামানায়) ঈসা (আঃ) (অবতীর্ণ হওয়ার পর)এর সঙ্গে থাকবে।'

(নাসায়ী শরীফ)

এজন্যই হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)ও ভারতবর্ষের জিহাদে অংশগ্রহণের আকাংখা পোষণ করতেন। তিনি বলেন—

وَعدَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَاِنْ اَدْرَكْتُهَا اُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، فَاِنْ اُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ اَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، اِنْ اَرْجِعْ فَاَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ -

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুস্তানের জিহাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি আমার জীবদ্দশায় সে জিহাদ লাভ করলে আমার জানমাল তাতে ব্যয় করবো। সে জিহাদে আমি নিহত হলে শ্রেষ্ঠতর শহীদদের মধ্যে গণ্য হবো। আর জীবিত ফিরে আসলে আমি (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা হবো।

(নাসায়ী শরীফ)

মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বিজাতি তত্ত্ব

১৯৬৫ ঈসায়ীর পর ভারত তার সমরনীতির পরিবর্তন ঘটায়। 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' তথা 'ইসলামী ভ্রাতৃত্বের' যে মহাশক্তি বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশরূপে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং বিশ্বের মুসলমানদের আশাপূর্ণ দৃষ্টি যে পাকিস্তানের উপর নিবদ্ধ হয়েছিল,

ভারত সম্মিলিত আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সহযোগিতায় সেই মুসলিম শক্তির উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা আঁটে। তারা পাকিস্তান সরকারের সেই ভুল পন্থা থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা লুটে যা মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অবলম্বন করেছিল।

'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' তথা 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব' পাকিস্তান আন্দোলনের শুধু রাজনৈতিক শ্লোগানই ছিল না, বরং তা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র এই অটল সিদ্ধান্তের ভাষ্যকার যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলমান—চাই তারা যে বর্ণ ও যে বংশেরই হোক, যে ভাষাই কথা বলুক এবং যে অঞ্চলের অধিবাসীই হোক না কেন—সবাই এক পরিবার এবং এক জাতি। আর সারা বিশ্বের অমুসলিমরা ভিন্ন আরেকটি জাতি। এটিই 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' সারকথা। পাকিস্তান এ জাতীয়তবাদকে ভিত্তি করেই অস্তিত্ব লাভ করে। এই বন্ধনই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রদেশকেই নয়, বরং হাজার হাজার মাইল দূরত্ব সত্ত্বেও পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানকেও এক আত্মায় পরিণত করেছিল। ১৯৬৫ ঈসায়ীর জিহাদে তার পরিপূর্ণ বাস্তব চিত্র বিশ্ববাসী দেখেছে।

'দ্বিজাতি তত্ত্ব' হলো পাকিস্তানের প্রাণ ও ভিত্তি প্রস্তর। এ চিন্তাধারার ভিত্তিতেই পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য সব ধরনের কুরবানী করা হয়েছিল। এটি মূলত এ কথার অঙ্গিকার ছিল যে, এদেশে এমন এক জাতির শাসন চলবে, যারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার উপর ঈমান রাখে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিঃশর্ত আনুগত্যকেই সর্বোচ্চ সম্মান এবং সর্ববৃহৎ বুদ্ধির কাজ মনে করে। তারা এখানে এমন সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সহজাত শিক্ষা হবে যার ভিত্তি।

এই মতাদর্শের আবশ্যকীয় দাবী ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল ও ভাষার বৈচিত্র্যময় সহজাত রূপ ও সৌন্দর্যের এ লীলাভূমিকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক ত্যাগ ও ভালবাসা, ইসলামপ্রদত্ত আইন, সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক সুষ্ঠু ও সুবিচারের লালন কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। ধর্ম ও জাতির ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে প্রত্যেক অসহায় ও নির্যাতিতের আহ্বানে সাড়া দেওয়া হবে। জালিমের হাত ভেঙ্গে দেওয়া হবে। যে কোন জাতির নিপীড়িত ব্যক্তিকে বাস্তব

পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত্ত করা হবে যে, বাস্তবিকই ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সহায়ক। এমনকি ঠিক যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ইসলাম শত্রুপক্ষের সঙ্গে জুলুম ও বিশ্বাসঘাতকতার অনুমতি দেয় না। যুদ্ধরত অবস্থাতেও শত্রুপক্ষের নারী, শিশু, বৃদ্ধ, মাজুর এবং এমন উপাসকদের উপর হাত উঠানোর অনুমতি প্রদান করেনি, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না।

২. আল্লাহ প্রদত্ত এ ভূমিতে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জান, মাল, আবরু এবং তাদের উপাসনালয়সমূহ সংরক্ষিত থাকবে। তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম-কর্ম পালন করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। অর্থনৈতিক অঙ্গনে উন্নতি করার তাদের সমান সুযোগ থাকবে।

কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে বিশদভাবে এ সমস্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। সাহাবা যুগের শাসন ব্যবস্থা এর যথার্থ সাক্ষী। ইসলামের ইতিহাসে এমন শাসকদের কমতি নেই, যারা এই দিক নির্দেশনা মোতাবেক আমল করাকে নিজেদের জন্য মহাসম্মান এবং নিজের প্রাণাধিক প্রিয় মনে করতেন। সুতরাং পাকিস্তানের সংবিধানের ভূমিকায় গৃহীত লক্ষ্যসমূহের মধ্যেও এসব বিষয় পরিষ্কার উল্লেখ ছিল।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ১৯৭১ সালের ট্রাজেডি

কিন্তু এখানকার স্বার্থপর শাসকগোষ্ঠী দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' ও 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' কথাগুলো শুধুমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ইতিহাসেই লিখিত থেকে যায়। পাকিস্তান থেকে বিশ্ববাসী যার আশা করত সরকারী নীতির কোথাও সেই পবিত্র সমাজ ও ইসলামী ন্যায়নীতির নামগন্ধও পরিলক্ষিত হয় না। দেশে 'বানরের রুটি বন্টন' আর 'জোর যার মুল্লুক তার' এই বন্য আইন বিস্তার লাভ করতে থাকে। সমস্যার সমাধান এবং ইসলামী ন্যায়নীতি যেমন সংখ্যালঘুরা লাভ করেনি তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠরাও লাভ করেনি। ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের ডানাদ্বয়ের মাঝে ইসলামের সুদৃঢ় বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। অবিশ্বাস ও ঘৃণার বিষ বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে দুশমনদের পক্ষে 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের' প্রতিমা খাড়া করা সহজ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে হিন্দু শিক্ষকরা এ ব্যাপারে ষোল আনা দায়িত্ব পালন করে।

শত্রুরা এই নাপাক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক নেতা, সরকারী কর্মকর্তা এবং সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের বিবেক কত কিছুর বিনিময়ে যে খরিদ করে, তার ইয়ত্তা নেই। ফলে দেখতে দেখতে সারাদেশে প্রাদেশিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বরং ঘৃণা ও বিদ্বেষের শিঙ্গা বাজানো আরম্ভ হয়। মূলত এটি একদিকে যেমন মুসলিম জাতীয়তাবাদের অস্বীকৃতি ছিল তেমনি তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাশ্বত এই বাণীরও অস্বীকৃতি ছিল—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلَي الْعَصَبِيَّةِ، وَلَيْسَ مِنَّامَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ -

"সেসব লোক আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা সাম্প্রদায়িকতার দিকে আহ্বান করে, তারাও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে লড়াই করে এবং ঐ সমস্ত লোকও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা সাম্প্রদায়িকতার উপর মৃত্যুবরণ করে।" (নাসায়ী শরীফ)

টিভি ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় নিদর্শন ও প্রতীকসমূহের বিরুদ্ধে সুসংহত ও সুবিন্যস্তভাবে ব্যবহার করা হয়। মুসলমানদের মন-মগজ থেকে সেই মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং জিহাদী উদ্দীপনা খুটিয়ে খুটিয়ে তুলে ফেলতে আরম্ভ করা হয়, যা ১৯৬৫ ঈসায়ীতে সমগ্র জাতিকে সীসা ঢালা প্রাচীরে পরিণত করেছিল এবং যার বদৌলতে আমরা মুসলিম বিশ্বের আন্তরিকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। নতুন প্রজন্মকে ফ্যাশন ও পোষাক সর্বস্ব জীবন যাপন পদ্ধতি, নগ্নতা ও অশ্লীলতা, অপচয় ও অপব্যয়, পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং বিলাসিতা ও আরাম আয়েশের অব্যাহত পাঠদান করা হয়। স্বার্থপর রাজনৈতিক প্রতারকরা ছাত্রদেরকে শ্লোগান, নৈরাজ্য, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, বেআইনী কর্মকাণ্ড করার এবং মা-বাবার অবাধ্য হওয়ার এমন সব পাঠদান করে যে, তারা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং শিক্ষাকেন্দ্র ও ইউনিভার্সিটিসমূহ রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। জাতির সংহতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ফলে ভিনদেশী এজেন্টরা ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে।

এদিকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীরা—যারা কেন্দ্রীয় সরকার ও সরকারী অফিসারদের ভুল কর্মপন্থা ও ইসলাম বিরোধী নীতির ফলে

বহিরাগত অস্ত্র ও পুঁজির জোরে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ছেয়ে যায়—তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রবাহিনীরূপে ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের জাল কেন্দ্রের সেনা হাইকমাণ্ড পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তারা রাজনৈতিক এই অস্থিতিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের শক্তিমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ আইয়ুব খানের জায়গায় জেনারেল ইয়াহইয়ার মত বিলাসী, আরামপূজারী, ব্যাধিগ্রস্ত লোককে জাতির কাঁধে সওয়ার করে দেয়। সেই ব্যাধিগ্রস্ত লোকটি স্বার্থপর রাজনীতিকদের কুটচক্রান্তে আইনানুগ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সাথে সমস্যার সমাধান না করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে নিপীড়নের এমন মারাত্মক পথে দাঁড় করায় যে, অনেক জায়গায় তাদের শীতল স্পর্শের চাপে পূর্ব পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা পর্যন্ত আর্তনাদ করে ওঠে। ফলে সেনাবাহিনী তাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে ভয়ংকর প্যাঁকে ফেঁসে যায়।

সার্বিক এই প্রস্তুতির পর রাশিয়ার উদার সহযোগিতা এবং পশ্চিমা শক্তির উসকানী ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭১–এ ভারতের 'বাহাদুরেরা' বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তখন বাহ্যিকভাবে তাদেরকে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধের মুখোমুখী না হওয়ারই কথা ছিল, কিন্তু এমন নৈরাশ্যকর অবস্থাতেও পাকিস্তানের আত্মমর্যাদাশালী ও নির্ভীক সৈনিকগণ, বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম, মাদরাসার তালিবে ইলম, দ্বীনদার মুসলমান এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ অবিচলভাবে সে প্লাবনের মোকাবেলা করেন। তারা জয়পরাজয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ইসলামপ্রীতি, আত্মমর্যাদা, বীরত্ব ও মুমিনসুলভ আত্মত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বপ্রকার বিরুদ্ধবাদী চক্রান্ত চলা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানেও জিহাদী উদ্দীপনা বিক্ষুব্ধ অগ্নিতরঙ্গের রূপ ধারণ করে। ছোট বড় সকলে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং রণাঙ্গনে গমনের জন্য বেকারার হয়ে যায়। দারুল উলূম করাচীতেও রাইফেল ট্রেনিং চলছিল। তাতে আমিও অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করি। কিন্তু রাজনৈতিক খেলোয়াড় ও সামরিক নেতৃত্বের জোট সম্পূর্ণ ভিন্নরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ইয়াহইয়া খান হঠাৎ করেই বাংলাদেশের মাটিতে তার ৯৩ হাজার ঈমানদার সৈনিককে ভারতীয় জেনারেলদের সম্মুখে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেয়। অস্ত্র সমর্পণের সেই লজ্জাস্কর দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখিয়ে সমগ্র বিশ্ব

থেকে বীরত্ব ও দক্ষতার স্বীকৃতি আদায়কারী সেনাবাহিনীকে চরমভাবে অপদস্ত করা হয়।

বাংলাদেশে ভারতের 'বীরেরা' যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যায় আগ্রাসন চালায় ততক্ষণ পর্যন্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিশ্চুপ থাকে। পাকিস্তান ভেঙ্গে দু' ভাগ হতেই নিরাপত্তা পরিষদ তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ঘোষণা করে যে, 'এখন যুদ্ধ বন্ধ করা হোক।'

আমাদের ৯৩ হাজার নির্ভীক তরুণ—যারা শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়ে যাওয়ার এবং বিজয় কিংবা শাহাদত লাভের গৌরব অর্জন করার জন্য অস্থির ছিল—তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের জিন্দাদখানায় নিক্ষেপ করা হয়। বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম, মাদরাসার তালিবে ইলম এবং স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদগণ–যারা পাকিস্তান ও পাকিস্তানী মতাদর্শ রক্ষার জন্য দেহপ্রাণ এবং সর্বস্ব নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন, তাদের উপর এমন নির্মম পাশবিকতা চলানো হয়, যৎদৃশ্যে চেঙ্গিস খানের পাশবিকতার মস্তকও হেঁট হয়ে যায়। আরব দেশসমূহ—যারা তখনও 'আরব জাতীয়তাবাদের' ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে ছিল না—তারাও রক্তক্ষয়ী এ নাটকের শুধু নীরব দর্শকই হয়ে থাকে। ইন্না লিল্লাহ !

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রক্তক্ষয়ী এ নাটক বাস্তবায়ন করার পর বলেছিলেন, 'আমরা 'দ্বিজাতি মতাদর্শকে' বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দিয়েছি।' তিনি পরবর্তী সময়ের এক গোপন বৈঠকে একথাও বলেন যে, 'এখন আমাদের পরবর্তী টার্গেট হবে সিন্ধুপ্রদেশ।'

সুতরাং বর্তমানে সিন্ধু প্রদেশেও চক্রান্তের সেই চাল চেলে ভারত এতদূর সফলতা লাভ করেছে যে, এখন যখন আরব দেশসমূহ 'আরবীয় জাতীয়তাবাদের' তিক্ত ও মারাত্মক পরিণতি ভোগ করে ইসলামী জাতীয়তাবাদের' দিকে প্রত্যাবর্তন করছে এবং বাংলাদেশের মুসলমানদের সম্মুখেও 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের' প্রহসনের জাল ছিন্ন হয়েছে—এমন সময় পাকিস্তানে ভাষা ও আঞ্চলিকতা নির্ভর জাতীয়তাবাদের নতুন প্রতীমা খাড়া করা হয়েছে। যার পদতলে জাতীয় ঐক্যকে বলি দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত দুশমনকে চেনার পরিবর্তে ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক চরম সাম্প্রদায়িকতা তাদেরকে এমন অন্ধ করে দিয়েছে যে, পুনরায় এক মুসলমান আরেক মুসলমানের গলা কর্তন করে চলছে।

মুসলমানদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণের হৃদয় নিঙড়ানো সেই উপদেশটি ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে—

لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

'আমার অবর্তমানে তোমরা পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না, যার ফলে তোমরা পরস্পরের গলা কাটতে আরম্ভ কর।' (মুসলিম শরীফ)

ভাষা ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে স্বরচিত প্রত্যেকটি দল, দলের নিহত লোকদেরকে 'শহীদ' আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাম্প্রদায়িকতার অন্যায় লড়াইয়ে নিহত ও হত্যাকারী উভয়ের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

اِذَا الْتَقَي الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيهِمَا فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ -

'যদি দুই মুসলমান নিজ নিজ তরবারী নিয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে, তাহলে ঘাতক ও নিহত উভয়েই জাহান্নামে যাবে। (কারণ নিহত ব্যক্তিরও ঘাতককে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল)। (নাসায়ী শরীফ)

উপরোক্ত পরিস্থিতি সিন্ধু প্রদেশে ভারতের জন্য মাঠ সমতল করে চলছে। ভারত এখন সেই সময়ের জন্য অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করছে যখন—

ক. পাকিস্তানের ক্ষমতা দুর্বল হাতে চলে যাবে এবং ভাষা ও আঞ্চলিকতা নির্ভর জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অধিক খুন খারাবী হবে।

খ. প্রতিবেশী মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তিক্ত হবে। পাকিস্তানকে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সাহায্য করা থেকে বাধা দেওয়া হবে। যার পরিণতিতে পাকিস্তানকে আফগানিস্তানের ভ্রাতৃসুলভ বন্ধুত্ব থেকে পুনরায় বঞ্চিত করা হবে। (জেনেভা সমঝোতা তার প্রথম পদক্ষেপ)

গ. পাকিস্তানের ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহ বাংলাদেশের মত জনসাধারণকে পুনরায় পথে নামিয়ে নিজেদেরই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করবে।

আল্লাহ সেই অশুভ ক্ষণ যেন কখনই না দেন, তবে ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকার সার্বিক শক্তি এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পিছনে উদারচিত্তে ব্যয় হচ্ছে। তাদের গোমস্তারা আমাদের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এই হৈ-হুল্লোড় ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে মরহুম ইকবালের এই আহ্বান শোনার ও শোনানোর ফুরসত আজ কারও নেই। তিনি বলেন—

اس دور میں مے اور ہے جام اور ہے جم اور
ساقی نے بنا کی ' روش لطف و کرم اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا ' اپنا حرم اور
تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے
یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے
غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے
بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام ترا دیس ' تو مصطفوی ہے
نظارہ دیرینہ ' زمانے کو دکھادے
اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملادے

"কলিযুগের সুরা, সুরাপাত্র ও স্‌রাপায়ী ভিন্নতর। সুরা পরিবেশনকারী দয়া ও অনুকম্পার যে ভিত্তি স্থাপন করেছে, তাও ভিন্নতর। মুসলমান জাতিও এমন উপাসনালয় নির্মাণ করেছে, যা ভিন্নতর। সভ্যতার প্রতিমা নির্মাতা এমন প্রতিমা গঠন করেছে, যা ভিন্নতর। সেসব নবনির্মিত উপাস্যদের সর্বোচ্চে হলো 'স্বদেশ।' স্বদেশের পরিধেয় জাতির কাফন। আধুনিক সভ্যতার নির্মিত এ প্রতিমা নববী দ্বীনের গৃহ বিধ্বস্তকারী। ওহে মুসলিম জাতি! তাওহীদের শক্তিতেই তোমার বাহু বলিয়ান। ইসলাম তোমার দেশ, নবী মুস্তাফার সুন্নাত তোমার আদর্শ। হে নবী মুস্তাফার অনুসারীরা! আধুনিক এ যুগকে অতীতের সেই ইসলামী দৃশ্য দেখিয়ে দাও। দেশ, জাতি ও ভাষার এসব প্রতিমাকে মাটিতে মিশিয়ে দাও।"

বিমান মুলতান অভিমুখে উড়ে চলছে আর আমার কল্পনাশক্তি তার

চেয়েও দ্রুত পাকিস্তানের অতীত ও বর্তমানের আকাশে উড়তে উড়তে কখনো 'সিয়াচুনের' তুষারক্ষেত্রে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সেই নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকদের জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধার নজরানা পেশ করছে, যারা দেশ ও জাতির হেফাজতের জন্য ২১ হাজার ফুট উচ্চতায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। যাদের বক্ষে ঈমানের বজ্রধ্বনিপূর্ণ বিদ্যুত বিক্ষুব্ধ তুষার ঝড়কে ঝলসে দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় রচনা করছে। আবার কখনও আফগান ভূমিতে সেই নিবেদিত প্রাণ বীর মুজাহিদদের দৃশ্য অবলোকন করছে—যাদের 'আল্লাহু আকবার' নিনাদে কমিউনিজমের ভীত ধ্বসে পড়েছে। যাদের কামানের গুরুগম্ভীর আওয়াজ মুসলিম উম্মাহকে পয়গাম দিয়ে যাচ্ছে—

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

'হে মুসলিম জাতি! জেগে দেখ বিশ্ব–আসরের রূপ নতুন আঙ্গিক ধারণ করেছে। উদয়াচল ও অস্তাচলে তথা সমগ্র বিশ্বে তোমাদের প্রভুত্বের যুগ সূচিত হয়েছে।'

আমরা সকাল ৯টায় মুলতান পৌঁছি। পূর্ব প্রোগ্রাম মোতাবেক আমরা সেখানকার প্রসিদ্ধ একটি মাদরাসায় যাই। সেখানে আরও কিছু সাথী আমাদের কাফেলায় মিলিত হন। এগারোটার দিকে ভাড়া করা একটি ওয়াগনযোগে কাফেলা 'ডেরা ইসমাঈল খান' অভিমুখে যাত্রা করে।

কাফেলার সদস্যবৃন্দ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে আমাদের এ কাফেলা গঠিত হয়—

১. মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা সুবহান মাহমুদ সাহেব (দাঃবাঃ) (শিক্ষা সচিব, দারুল উলূম করাচী)।

২. মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেব (দাঃবাঃ) (প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, জামেয়া ফারুকিয়া করাচী, মহাসচিব, বেফাকুল মাদারিস, পাকিস্তান)।

৩. জনাব মাওলানা আসাদ থানভী সাহেব (দাঃ বাঃ) (অধ্যক্ষ, মাদরাসা আশরাফিয়া, সক্কর)।

৪. ভাই জনাব সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন নূরী সাহেব, (উপাধ্যক্ষ, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, বিন নূরী টাউন, করাচী)।

৫. মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব (উস্তাদ ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রক, দারুল উলূম করাচী)।

৬. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব (উস্তাদ ও হল সুপার, দারুল উলূম করাচী)।

৭. (আমার ছেলে) মৌলভী মুহাম্মাদ জুবায়ের উসমানী (সহকারী শিক্ষক, দারুল উলূম করাচী)।

৮. মাওলানা মুফতী নিযামুদ্দীন সাহেব (উস্তাদ ও মুফতী, জামিয়া ফারুকিয়া, করাচী)।

৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আদেল খান সাহেব (উস্তাদ, জামিয়া ফারুকিয়া করাচী ও সম্পাদক, মাসিক আল ফারুক)।

১০. মাওলানা মুহাম্মাদ খালিদ সাহেব (উস্তাদ, জামিয়া ফারুকিয়া, করাচী)।

১১. জনাব মাওলানা কারী হেলাল আহমদ সাহেব (ইমাম ও খতিব, জামে মসজিদ তুবা, ডিফেন্স সোসাইটি, করাচী)।

১২. মাওলানা সাআদাতুল্লাহ সাহেব (দপ্তর সম্পাদক, হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী, করাচী)

১৩. মাওলানা শাহেদ মাহমুদ সাহেব (দপ্তর সম্পাদক, হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী, ইসলামাবাদ)।

১৪. জনাব সরোয়ার আহসান সাহেব (সভাপতি, আবু যর ফাউণ্ডেশন, করাচী)

১৫. জনাব হারুন সাহেব (করাচী)।

১৬. জনাব তাহসীন মানযার সাহেব (শিক্ষানবীস, জামেয়া ফারুকিয়া ও করাচী ইউনিভার্সিটি)।

১৭. অধম লেখক (খাদেম, দারুল উলূম করাচী)।

আফসোস

গাড়ী (ওয়াগন) উত্তর দিকে ধেয়ে চলছে। কল্পনার জগত অপূর্ব ভাবাবেগে দোল খাচ্ছে। কারণ, আমরা অবিরাম আফগান রণাঙ্গন পানে এগিয়ে চলছি। কিন্তু এখনও আমার বিশ্বাস্য হচ্ছিল না যে, আমি স্বশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারব। কারণ প্রায় আঠারো বছর ধরে আমি মেরুদণ্ডের মারাত্মক ব্যথায় আক্রান্ত। ১৯৭০ ঈসায়ীতে তা এত প্রকট আকার ধারণ করে যে, দশ বৎসর পর্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের কাজ

থেকে প্রায় অপারগ হয়ে যাই। একটু অসতর্ক হলেই কয়েক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। বর্তমানে প্রায় আট বৎসর যাবত রোগ তেমন মারাত্মক না হলেও প্রত্যেক পদক্ষেপ এবং নড়াচড়ায় সাবধান থাকতে হয়। এখনও গাড়ীতে বা ট্রেনে সফর করলে ব্যথা বেড়ে যায়। অসমতল বিছানায় শুতে পারি না। হেলান দেওয়া ছাড়া বসতেও কষ্ট হয়।

এ কারণে সফরসঙ্গীরা আমাকে গাড়ির সামনের সিটে বসিয়ে দেয়। কারণ সামনের সিটে ঝাঁকি কম লাগে। আমার এ অপারগতার কারণে আমি লজ্জিত হচ্ছিলাম। কিন্তু তারপরও এ ভয়ে চুপ হয়ে বসে থাকি যে, বড় ধরনের ঝাঁকি লাগলে পরে পবিত্র এ সফরেরও আশা ত্যাগ করতে হবে। আবার সাথীদেরও কষ্ট হবে। আমি ভাবছিলাম যে, আমার বাল্যকাল ও যৌবনকালে জিহাদী উদ্দীপনাই ছিল আমার অধিকাংশ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। বন্দুক দ্বারা শিকার করা, অশ্বারোহন এবং ব্যায়ামের অভ্যাসও এই উদ্দীপনার ফলেই গড়ে ওঠে। এমন সব খেলাই আমার পছন্দনীয় ছিল, যেগুলো জিহাদের সময় কাজে লাগবে। হাইজাম্প ও লং জাম্প এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় সমবয়সীদের মধ্যে অগ্রগামী থাকতাম। উযূ বা গোসলে গরম পানি ব্যবহার করতাম না। ডিসেম্বর ও জানুয়ারীর প্রচণ্ড শীতের মধ্যে পাঞ্জাব বা সীমান্ত প্রদেশে গেলে সেখানেও প্রত্যুষে রাতের বাসি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করে এক অপূর্ব স্বাদ অনুভব করতাম। এসব এ লক্ষ্যেই করতাম যে, কখনও জিহাদের সুযোগ হলে এ সকল অভ্যাস কাজে আসবে। কিন্তু মেরুদণ্ডের অবিশ্রান্ত এ ব্যথা আমার সমস্ত পণ ও দৃঢ়তাকে পানি করে দেয়। এ কারণেই এ রোগে আমার মনটি বড় বিষাদগ্রস্ত ছিল।

انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو
ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافہم فافہم

"পৃথিবীর বিবর্তন আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত উপদেশদানকারী। গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য কর, প্রত্যেক বিবর্তন থেকে ধ্বনি উচ্চকিত হচ্ছে 'চিন্তা কর! চিন্তা কর!"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহামূল্য এ বাণীর কদর এখন বুঝে আসে। তিনি এরশাদ করেছেন—

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ -

অর্থ ঃ দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে থাকে। যথা ঃ সুস্থতা ও অবসর সময়। (মানুষ এগুলোর মূল্যায়ন করে না কিন্তু হাতছাড়া হলে পস্তায়) (বুখারী শরীফ, ২ ঃ ৯৪৯ পৃঃ)

প্রায় নয় বছর পূর্বে ১৯৭৯ ঈসায়ীর ২৭শে ডিসেম্বর আফগানিস্তানের জিহাদ আরম্ভ হলে বহু কাংখিত অপূর্ণ সেই বাসনা পূর্ণ করার বিস্তর সুযোগ আমার হাতে আসে। কিন্তু যখন সুস্থতা ছিল, তখন জিহাদের সুযোগ লাভ করিনি। আজ সুযোগ এসেছে কিন্তু সুস্থতা নেই—

چمن سامنے ہے ' شکستہ ہیں بازو
خجل ہو رہے ہیں ' ہم آزاد ہو کر

'পুষ্প কানন আমার সম্মুখেই, কিন্তু আমার বাহু অপারগ। স্বাধীনতা লাভ করে আমি আজ লজ্জিত।"

আমি আনন্দ ও আক্ষেপের অবিমিশ্র অনুভূতি নিয়ে আফগা৽ জিহাদের ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলী পাঠ এবং শ্রবণ করতে থাকি। আফগানিস্তানের মুজাহিদ ও তাদের নেতাদের সঙ্গে প্রায়ই সুদীর্ঘ মোলাকাত হতে থাকে। তারা দারুল উলূমেও আগমন করতে থাকেন। তাদের মধ্যে অনেক উলামায়ে কেরাম এমনও রয়েছেন, যারা দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। দারুল উলূমের অনেক তালিবে ইলম বার্ষিক ছুটির বেশীর ভাগ সময় জিহাদে ব্যয় করে থাকে। মুজাহিদদের নিকট থেকে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনের ছোট বড় ও খুঁটিনাটি ব্যাপারও অবগত হতে থাকি। কিন্তু তারা যখন রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য বিদায় গ্রহণ করত, তখন আমাকে জিহাদে যাওয়ার বাসনা অন্তরে পোষণ করে পড়ে থাকতে হত। অনেক সময় মহান আল্লাহর দরবারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা দেওয়া এ দুআও করতাম—

اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا قَوِّنِيْ عَلَي الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِكَ -

"হে প্রভাত উন্মোচনকারী, বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টিকারী এবং

সময়ের হিসাব রাখার জন্য চন্দ্র–সূর্য সৃষ্টিকারী আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার পথে জিহাদ করার শক্তি দান করুন।"

আর কখনও এ দুআ করতাম যে,

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার পথে শাহাদত নসীব করুন।'

অপারগ অবস্থায় প্রায়শই আমার মুর্শিদ আবদুল হাই আরেফী (রহঃ)এর এই কবিতা মুখে আবৃত হতে থাকত—

اب ہوں کسی کے جذب کرم ہی کا منتظر

میری طلب تو ہے' مری تاب و تواں سے دور

'আমি তো তাঁরই দয়ার ডাকের প্রতীক্ষায় বসে আছি,
আমার সাধ তো আমার সাধ্যের অনেক ঊর্ধ্বের।'

এটি তাঁর সেই 'দয়ার ডাকেরই' প্রাপ্তি যে, মেরুদণ্ডের বেদনা সত্ত্বেও আজ এ অধম যৌবনকালে না হলেও জীবনের তিপ্পান্নতম বছরে মুজাহিদদের এ কাফেলায় শামিল হতে পেরেছি।

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس ست

'ফুলের সঙ্গে বুলবুলির অন্তমিলও কি কম গর্বের ব্যাপার!'

মুলতান থেকে আমরা ১১টার দিকে রওনা করেছিলাম। দুটার কাছাকাছি সময়ে রাস্তার পাশের একটি মসজিদে যোহরের নামায আদায় করি। মসজিদের ইমাম সাহেব এবং বেশ কিছু মুসল্লী আমাদেরকে চিনে ফেলে। তারা আনন্দে ও বিনয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিলেন। বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। অতি কষ্টে তাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করি। সরাইখানার মত একটি হোটেলে খানা খেয়ে সম্মুখপানে যাত্রা করি। মিয়ানওয়ালী জেলার ভকর নামক স্থানের শহরতলী এলাকার একটি মসজিদে আসরের নামায আদায় করি। নামায শেষে ওয়াগন উত্তর দিকে দ্রুত চলতে থাকে। আমাদেরকে আজ মাগরিবের পূর্বেই ডেরা ইসমাঈল খানে পৌছতে হবে এবং রাতারাতিই পরবর্তী মঞ্জিল অভিমুখে যাত্রা করতে হবে। আমাদের আবেদনে পাকিস্তানী মুজাহিদদের সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী' এ সফরের ব্যবস্থা করেছিল। সংগঠনের

কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে আমরা মাগরিবের কিছু পূর্বেই ইসমাঈল খানে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌঁছি। কার্যালয়ের প্রধান পরিচালক জনাব কারী নেয়ামতউল্লাহ আমাদের প্রতীক্ষায় বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এবং তার সঙ্গীরা আমাদেরকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা ছিলেন। অনাড়ম্বর দোতলা ভবনের একটি কক্ষের এ কার্যালয়টি মুজাহিদদের জন্য একটি মঞ্জিলের কাজ দেয়। কার্যালয়টি এ পর্যন্ত কত গাজী এবং কত শহীদের যে মঞ্জিল হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যে নিঃসম্বল ও সাদামাটা অবস্থায় আফগানিস্তানের জিহাদ চলছে তার প্রতিচ্ছবি এ কার্যালয়েও সুস্পষ্ট।

হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর তরুণ প্রতিষ্ঠাতা আমীর জনাব মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব (রহঃ) আজ থেকে মাত্র তিন বছর পূর্বে আফগান জিহাদেরই একটি রক্তাক্ত লড়াইয়ে একুশজন সাথী সহ শহীদ হন। সুধী পাঠক! সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে অখ্যাত সেই শহীদদের সম্পর্কে আলোচনা করাও আমি তাদের হক বলে মনে করছি। কারণ শাহাদত–পরবর্তী তাদের নির্বাক জীবনও আমাদেরকে অনেক কিছুর পয়গাম শুনিয়ে থাকে।

سر مزار شہیداں یکے عناں در کش
کہ بے زبانی ما حرف گفتنی دارد

'হে পথিক! শহীদদের এ মাযার পার্শ্বে তোমার অশ্ব থামিয়ে দাও!
আমাদের এ নির্বাক জীবনও অনেক কথা বলে থাকে।'

মাওলানা ইরশাদ আহমাদ শহীদ (রহঃ)

১৯৭৯ ঈসায়ীর ২৭শে ডিসেম্বর আমাদের প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের উপর রাশিয়া যখন পঙ্গপালের মত সেনাশক্তি নিয়ে আগ্রাসন চালায়, তখন বিশ্ববাসী এ কথাই বুঝে নিয়েছিল যে, কমিউনিজমের এই 'লাল প্লাবন'—যা মধ্য এশিয়ার ইসলামী রাজ্যসমূহ এবং তাসখন্দ, সমরকন্দ ও বুখারাকে বিরান করে দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে—এখান থেকেও ইসলামী মূল্যবোধ ও নিদর্শনসমূহকে খড়কুটার মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং তার পরবর্তী লক্ষ্য হবে

পাকিস্তান। কিন্তু আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাশালী মুসলমানগণ নিতান্ত নিঃস্ব ও নিঃসম্বল অবস্থায় নিখাদ আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং শাহাদাতের উদগ্র বাসনায় উন্মত্ত হয়ে সেই প্লাবনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। আর এভাবেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে আফগানিস্তানের জিহাদের সূচনা হয়।

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

"প্রকৃত ঈমানদার যে, সে তরবারী ছাড়াও রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

এ সময় ফয়সালাবাদের অধিবাসী মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব (রহঃ) করাচীতে দরসে নিযামীর শেষ বর্ষ অর্থাৎ দাওরা হাদীসের শিক্ষার্থী ছিলেন। জীবনের কুড়িতম বছর অতিবাহিত হচ্ছিল। বাল্যকাল থেকেই তার হৃদয়ে জিহাদের উদ্দীপনা তরঙ্গায়িত ছিল। আফগান জিহাদকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি আফগানিস্তানে গমন করার জন্য প্রস্তুত হন। আরও দু'জন তালিবে ইলম, (মাওলানা) সাইফুল্লাহ আখতার এবং (মাওলানা) আবদুস সামাদ সাইয়্যালও (তখন তারা 'মারহালায়ে আলিয়ার' প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন) জিহাদের জন্য তৈরী হন। এরা তিনজন কাউকে না জানিয়ে ১৯৮০ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে নিঃসম্বল অবস্থায় আফগান জিহাদের উদ্দেশ্যে করাচী থেকে যাত্রা করেন।

میں راہ شوق میں منت کش رہبر نہیں ہوتا
مرے داغ جگر کافی ہیں میری رہنمائی کو

'প্রেমের পথে আমি দিশারীর অনুকম্পা গ্রহণ করি না।
আমার পথ-দিশার জন্য—আমার হৃদয়ের দহনই যথেষ্ট।'

মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব বয়স ও ইলমের দিক থেকে তিনজনের মধ্যে বড় ছিলেন। তাঁকে অপর দুই সঙ্গী সুন্নাত মোতাবেক নিজেদের আমীর নিযুক্ত করেন। এভাবে তিন মুজাহিদের সমন্বয়ে একটি জা'আমাত অস্তিত্ব লাভ করে। এ জা'আমাত কালক্রমে 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী' নামক বিশ্ববিখ্যাত জিহাদী সংগঠনের রূপ লাভ করে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম আমীর মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব (রহঃ)এর উপর নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি পুরোপুরি মিল খায়—

میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
لوگ کچھ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا

'মঞ্জিল অভিমুখে আমি একাই পথ ধরেছিলাম,
মানুষ সহযাত্রী হতে থাকে, ফলে কাফেলা তৈরী হয়ে যায়।'

দৃঢ় সংকল্পী এ তরুণত্রয় পেশোয়ার পৌঁছে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এবং সেখানকার মুজাহিদ সংগঠনসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন। তারা আফগানিস্তানের প্রখ্যাত মুজাহিদ আলেম মাওলানা আরসালান খান রহমানির সঙ্গে মিলিত হয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব পরবর্তী বছর জামেয়া রশিদীয়া সাহিওয়াল থেকে দাওরা হাদীসের পরীক্ষা দিয়ে 'সনদ' লাভ করেন। পরীক্ষা শেষে পুনর্বার আফগানিস্তান গিয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে জিহাদে মনোনিবেশ করেন। তিনি আফগান মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানী মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ঝুঁকিপূর্ণ এবং মারাত্মক লড়াইগুলোতে তিনি সর্বাগ্রে থাকতেন। সাথে সাথে পাকিস্তানের মাদরাসাসমূহে জিহাদের দাওয়াতের কাজও আরম্ভ করেন। যার ফলে এখানকার তালিবে ইলম এবং উলামায়ে কেরামও বার্ষিক ছুটিতে রণাঙ্গনে যেতে আরম্ভ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৮৪ ঈসায়ীতে সৌদী আরব এবং আফ্রিকা সফর করেন। যার আশানুরূপ ফল পরিলক্ষিত হয়।

মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী' নব আগন্তুক ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আফগানিস্তান নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন নিজেদের ক্যাম্পে রেখে প্রশিক্ষণ দিয়ে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিত। আমাদের দারুল উলূম করাচীর অনেক তালিবে ইলমও তাঁর নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে থাকে। তিনি নিজে এবং তাঁর অকুতোভয় সঙ্গীরা বিভিন্ন রণাঙ্গনে যে অপূর্ব ও বিস্ময়কর বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন তার দাস্তান অতি দীর্ঘ। আফসোস! আমি এখানে তা তুলে ধরতে পারছি না। কোন ব্যক্তির কলমে তা সংকলন করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এতে করে অখ্যাত ও নিবেদিতপ্রাণ এ সব মুজাহিদ ইসলামের ইতিহাসে যে অপরূপ অধ্যায়ের সূচনা করেছেন ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তা সংরক্ষিত থাকবে।

মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব ১৪০৫ হিজরীতে দারুল উলূম করাচী তাশরীফ আনেন। দারুল উলূমের জামে' মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করেন। নামাযান্তে আমার ফরমায়েশে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। সে ভাষণে তিনি জিহাদের ফযীলত এবং আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থার উপর আলোকপাত করেন। আমি তাঁর নিকট আফগানিস্তানের জিহাদে তাঁর নিজস্ব কিছু ঘটনা শুনানোর জন্য নিবেদন করি কিন্তু তিনি অন্যান্য মুজাহিদদের ঈমানদীপ্ত কীর্তি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন ঠিকই, কিন্তু নিজের কোন ঘটনা আলোচনা করেননি। তাঁর প্রত্যেক কাজ, কথা ও চলাফেরায় বিনয়, পরহেযগারী এবং ইত্তিবায়ে সুন্নাত ভাস্বর ছিল। মুখমণ্ডলে আল্লাহভীতি এবং মেধা ও প্রতিভার লক্ষণ, কথাবার্তায় শালীনতা ও দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্বে মুজাহিদসুলভ গাম্ভীর্য, হৃদয় জিহাদী জযবায় সমৃদ্ধ এবং বক্তব্য এমন সহজ, সাবলিল ও প্রভাবপূর্ণ ছিল যে, 'হৃদয়ের কথা হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে' এর বাস্তব নমুনা, ইত্যাদি গুণাবলীর তাঁর ব্যক্তিত্বে সমন্বয় ঘটেছে। এটি ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাত।

তিনি এ বছরেই রমাযানের তিন মাস পূর্বে মা-বাবা ও আত্মীয় স্বজনের পীড়াপীড়িতে ১৯৮৫ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারী মাসে শাদী করেন। কিছুদিন ফয়সালাবাদে স্বগৃহে অবস্থান করে পুনরায় জিহাদ ও জিহাদের দাওয়াতের কাজে নেমে পড়েন। রণাঙ্গনেই পবিত্র রমাযানের শেষ দশদিন এবং ঈদুল ফিতর অতিবাহিত করেন।

نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں

'তরবারীর ছায়াতলে প্রেমের নামায আদায় হয়।'

জীবনের শেষ লড়াই

মাদরাসার তালিবে ইলমগণ বার্ষিক ছুটি রণাঙ্গনে অতিবাহিত করে ঈদুল ফিতর শেষে নিয়মমাফিক যখন নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান অভিমুখে যাত্রা করবে, এমন সময় কতিপয় তালিবে ইলম শ্রদ্ধেয় আমীরের নিকট পীড়াপীড়ি করে বলে যে, ফিরে যাওয়ার পূর্বে আমরা আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরেকটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে চাই। তারা সে সময় 'পাকতিকা' প্রদেশের 'উরগুন'

রণাঙ্গনে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু সেখানে সে সময় দুশমনের উপর আক্রমণ করার সুযোগ ছিল না। ছাত্রদের পীড়াপীড়িতে তিনি পাকতিকারই অন্য এলাকা 'শারানা'র রণাঙ্গনে আফগান কমাণ্ডার মাওলানা ফরিদউদ্দীন সাহেবের নিকট যান। মাওলানা ফরিদউদ্দীন সাহেব সেখানে মুজাহিদদের অন্য একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে লড়াইরত ছিলেন। মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে 'শারানা' শহরের একটি রাশিয়ান ছাউনির উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য ৬ই শাওয়াল ১৪০৫ হিজরী (২৫শে জুন ১৯৮৫ ঈসায়ী)এর সন্ধ্যার সময় নির্ধারণ করা হয়। দুশমনের যে ছাউনির উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার দূরত্ব এখান থেকে কমপক্ষে পাঁচ ঘন্টার পথ। কাঁচা ও বন্ধুর গিরিপথ। পথে যেসব স্থান থেকে দুশমনের আক্রমণের আশংকা ছিল, সেখানে দুশমনের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখার জন্য এবং যথাসময়ে তৎপরতা চালানোর জন্য কিছু পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়।

নিঃসম্বল মুজাহিদ

কিন্তু মুজাহিদগণ এমন কোন গাড়ী পাচ্ছিলেন না, যাতে করে অস্ত্রশস্ত্রসহ রণাঙ্গনে পৌঁছতে পারেন। ফলে যাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তখন পথের বিপদজনক স্থানসমূহে নিয়োজিত পাহারাদার মুজাহিদদের নিকট এ নির্দেশও পাঠিয়ে দিতে হয় যে, তারা সেসব স্থানে শুধুমাত্র রাত দশটা পর্যন্ত অবস্থান করবে। এ সময়ের মধ্যে মুজাহিদরা সেখান দিয়ে অতিক্রম না করলে তারা নিজ নিজ ঠিকানায় ফিরে যাবে এবং বুঝে নিবে যে, আক্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে।

পরিশেষে কোন রকমে তারা একটি ট্রাক্টর এবং তার সাথে সংযুক্ত একটি ট্রলি পেয়ে যান। প্রোগ্রাম মোতাবেক শাওয়ালের ৬ তারিখে আসর নামাযের পর ৪৫ জন মুজাহিদের ছোট একটি বাহিনী সেখানকার আফগান কমাণ্ডার মাওলানা ঈদ মুহাম্মাদ সাহেবের নেতৃত্বে ট্রলিতে করে যাত্রা করেন। বাহিনীতে 'শারানা' রণাঙ্গনের কয়েকজন আফগান মুজাহিদও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পথে মাগরিব নামায আদায় করে সফর অব্যাহত রাখা হয়। রাত ১১টা নাগাদ শারানার অদূরে পৌঁছে পরিস্থিতি

পর্যবেক্ষণ করে সুবহে সাদিক হওয়ার পর পরই তাড়াতাড়ি ফজর নামায আদায় করে ছাউনিতে আক্রমণ করার প্রোগ্রাম ছিল।

অদৃষ্টের লিখন

কিন্তু পাহাড়ী পথ মারাত্মক খারাপ হওয়ায় এবং পথের বিভিন্ন জটিলতার কারণে মুজাহিদদের এ বাহিনী পাহারাদার নিযুক্ত স্থানসমূহ রাত দশটার মধ্যে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাত দশটার পর পাহারাদাররা—আক্রমণ স্থগিত করা হয়েছে মনে করে—ঝুঁকিপূর্ণ সেসব স্থান অরক্ষিত রেখে নিজ নিজ ঠিকানায় ফিরে যায়। ওদিকে শত্রুপক্ষ গোয়েন্দা মারফত মুজাহিদ বাহিনীর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে যায়। তারা রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে ছাউনী থেকে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে রাস্তার উভয় দিকের পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান নেয়। নিজেদের পশ্চাতে সাঁজোয়া গাড়ী এবং ট্যাঙ্ক প্রস্তুত করে রাখে। পাহারাদারা সরে যাওয়ার ফলে তারা এ স্থানগুলো খালি পেয়ে যায়। রাত ১১টার দিকে মুজাহিদদের ট্রলি সেখানে পৌছতেই দুশমন তিন দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলে অতর্কিত আক্রমণ করে। এই রণাঙ্গনে দীর্ঘ ছয় বছরের মধ্যে এই প্রথম দুশমন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করার সাহস করে। গোয়েন্দারা যথাসময়ে অবগত করায় তাদের এ সাহস হয়। নিকষ অন্ধকারের মধ্যে দুশমনের আক্রমণের খবর মুজাহিদরা ঐ সময় জানতে পারে, যখন তাদের প্রথম গ্রেনেডটি ট্রলি বাঁধা ট্রাক্টরের উপর এসে বিস্ফোরিত হয়। ট্রাক্টরে আগুন লাগায় দুশমন তাদের লক্ষ্যস্থল পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিল।

ট্রলির উপর গুলি, গ্রেনেড ও গোলার বর্ষণ আরম্ভ হয়। কিছু মুজাহিদ ট্রলি থেকে লাফিয়ে পড়ে পজিশন নিতে সক্ষম হয়। তারা ট্রলির আড়াল থেকে পাল্টা ফায়ারিং করতে আরম্ভ করে। গোলা ও বোমার ভয়ংকর আওয়াজে সমস্ত পাহাড় প্রকম্পিত হচ্ছিল। সেই আওয়াজের মধ্যেও নিবেদিতপ্রাণ কিছু মুজাহিদের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি গর্জে উঠছিল। যেসব জানবাজ মুজাহিদ ট্রলি থেকে লাফিয়ে নামতে সক্ষম হয়েছিলেন মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব ছিলেন তাদের অন্যতম। কিন্তু তাঁর দেহে এক ঝাঁক গুলি এসে লেগেছিল। ফলে অতি কষ্টে তিনি ক্লাসিনকোভ চালাতে চালাতে দুশমনের দিকে কয়েক ধাপ অগ্রসর হন।

দেহ থেকে অনেক রক্ত ঝরে। তখন তার দেহে আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। শত্রুপক্ষের দিকে পজিশন নিয়ে তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন। বজ্রকণ্ঠে 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান দিতে দিতে ফায়ারিং করতে থাকেন। এ সময় তাঁর তাকবির ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। তারপর এ আওয়াজ নিস্তেজ হতে হতে একসময় নীরব হয়ে যায়। কালিমার জন্য প্রাণদানকারী মুজাহিদ তাঁর কাংখিত লক্ষ্য অর্জন করে ধন্য হন। শাহাদাত লাভ করার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর ২০ দিন। মাত্র চার মাস পূর্বে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

'ঈমানদারের বাসনা ও লক্ষ্যই হল শাহাদাত,
গনীমতের সম্পদ বা পদ ও প্রভাব নয়।'

সে সময় লড়াইয়ের চিত্র এইরূপ ধারণ করে যে, যেসব মুজাহিদ দুশমনের এলোপাতাড়ি ফায়ারিং এর কারণে তৎক্ষণাৎ ট্রলি থেকে নামতে সক্ষম হয়নি তারা ট্রলির মধ্যেই অবরুদ্ধ অবস্থায় আটকা পড়ে যায়। ওদিকে ট্রলির আগুন প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলছিল। কিছু মুজাহিদ ট্রলির আশেপাশে আহত অবস্থায় পড়ে ছিল। কিছু জানবাজ মুজাহিদ ট্রলির মধ্যে ও তার আশপাশে শাহাদাত মদিরা পান করে পড়ে ছিলেন। যারা সুযোগ পেয়েছেন তারা ক্ষিপ্ত সিংহের মত বিজয় বা শাহাদাতের আকাংখা নিয়ে লড়ছেন। এই অভিযানের আফগান আমীর মাওলানা ঈদ মুহাম্মাদ সাহেব এবং দারুল উলূম করাচীর তালিবে ইলম মৌলভী আবদুল হালীম (সাল্লামাহু) গোলাগুলির এই বৃষ্টির মধ্যেই আহত সাথীদেরকে কাঁধে উঠিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌছাতে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁরাও নিরাপদ থাকেন।

গায়েবী সাহায্য

ইতিমধ্যে ট্রলিতে রক্ষিত বারুদে আগুন লেগে তা বিস্ফোরিত হতে থাকে। বিস্ফোরণের ভয়ংকর আওয়াজে প্রলংয়কর অবস্থা সৃষ্টি হয়। যে মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এ সবকিছু হচ্ছিল, তিনি এ

বিস্ফোরণকেই সাহায্যের উপকরণ করে দেন। ফলে ট্রলিতে রক্ষিত রকেটসমূহের মধ্য থেকে একটি রকেট কুদরতের গায়েবী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। তার পিছনের অংশে আগুন ধরে যায়। যে কারণে রকেটটি ট্রলি থেকে বের হয়ে দ্রুত দুশমনের দিকে ধেয়ে যায়। চোখের পলকে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়ে তা দুশমনের একটি ট্যাংক ধ্বংস করে দেয়। অপরদিকে ট্রলিতে প্রজ্জ্বলিত বারুদের বিস্ফোরণের শব্দ শুনে দুশমন মনে করে যে, মুজাহিদদের সাহায্যকারী গ্রুপ চলে এসেছে। ফলে তারা রণাঙ্গণ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এ লড়াইয়ে দুশমনের প্রায় পঁয়ত্রিশজন সৈন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর বাইশজন মুজাহিদ শাহাদাত লাভে ধন্য হন।

কিছুক্ষণ পর মুজাহিদদের আরেকটি দল সেখানে এসে পৌছে। তাঁরা শহীদদেরকে নিকটবর্তী গ্রামে নিয়ে যায় এবং আহতদেরকে উট ইত্যাদিতে উঠিয়ে গ্রামে পৌছে দেয়। সেখানকার প্রায় আড়াই হাজার মুসলমান একত্রিত হয়ে শহীদদের জানাযা নামায আদায় করে। শত্রুপক্ষের গানশিপ হেলিকপ্টার তখনও আকাশে টহল দিচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এমন অন্ধ বানিয়ে দেন যে, জানাযা নামাযের বিশাল এই জমায়েত তারা দেখতে সক্ষম হয়নি।

মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব সাথীদেরকে বলে রেখেছিলেন যে, 'আমি শহীদ হলে আমার লাশ বাড়ী নিয়ে যাবে না, সম্ভব হলে রণাঙ্গনের আশেপাশেই দাফন করবে।'

তাঁর অসীয়ত এবং স্থানীয় মুসলমানদের পীড়াপীড়িতে শারানা শহরের অদূরেই 'কোটওয়াল' গ্রামে সকল শহীদকে সমাহিত করা হয়।

بنا کر دند خوش رسے بخاک و خوں غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

'তাঁরা মাটি ও রক্তে লুটোপুটি খাওয়ার এক অপূর্ব প্রথা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহান আল্লাহ সৎপ্রকৃতি সম্পন্ন এ প্রেমিকদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।'

ঈমানদীপ্ত অসীয়তনামা

শহীদ মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব (রহঃ) ১৯৮০ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারী মাসে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে করাচী

থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মাতাপিতা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে একটি অসীয়তনামা লিখে তাঁর এক বন্ধুর হাতে দিয়ে যান। অসীয়তনামার শেষে লেখা ছিল—

"করাচী থেকে রওয়ানা হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে এ অসীয়তনামা লিখে আমার বন্ধুর হাতে দিয়ে যাচ্ছি। আমার শাহাদাতের নিশ্চিত সংবাদ লাভের পর সে এটি সরাসরি কিংবা ডাকযোগে আপনাদের নিকট পৌঁছে দিবে।"

সুতরাং তাঁর শাহাদাত লাভের পরই অসীয়তনামাটি বাড়ী পৌঁছে। পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী এ অসীয়তনামার প্রত্যেকটি লাইন ঈমান উদ্দীপক। আমি সেখান থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। হামদ ও সালাতের পর তিনি লেখেন ঃ

"পাপী বান্দা, আল্লাহর রহমতের আশাবাদী লিখছে যে, আমি সানন্দে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন নিষ্ঠাবান বন্ধুর সঙ্গে আফগানিস্তান যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ! নিজের জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিংবা জীবনের জটিলতার কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মৃত্যুর সন্ধানে আমার এ যাত্রা নয়। আমার একমাত্র আর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইখলাসের সঙ্গে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার তাওফীক দান করবেন। কুফুরী শক্তিকে পরাজিত বরং ধূলিস্যাৎ করে দিবেন। কুফুরী শক্তির উপর এমন তীব্র আঘাত হানবেন, যেন কেয়ামত পর্যন্ত আর ইসলামের দিকে চোখ তুলে তাকানোর মত শক্তি তার না থাকে। আমীন, ছুম্মা আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আমি অধম এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে এমন এক দীর্ঘ জীবন কামনা করছি, যার মধ্যে এমন এক সুশৃংখল, সুবিন্যস্ত ও সুসংহত প্রচেষ্টা করব, যার ফলে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সম্পূর্ণ প্রভাব, প্রতাপ ও প্রবলভাবে, পূর্ণাঙ্গরূপে জীবন্ত ও প্রতিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহর দিকেই সবকিছু প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই সর্বপ্রকার কল্যাণের তাওফীক দানকারী।

মৃত্যু কাউকে বলে আসে না এবং তার নির্ধারিত ক্ষণ থেকে আগপাছও হয় না। كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীই তার নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।' বিশেষত মানুষ যখন মাথায় কাফন

কাপড় বেধে রণাঙ্গনে বের হয়, তখন সে মৃত্যুরও ঐ পরিমাণই আকাংখী, অনুরাগী ও আশাবাদী হয়, যে পরিমাণ আশাবাদী হয় জীবনের।"

পরে তার দুই ছোট ভাই মুহাম্মাদ আহমাদ এবং মুযযাম্মিল আহমাদকে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দান করে তিনি লেখেন—

"তোমরা কুরআন, হাদীস ও ফেকাহকে হক আদায় করে অধ্যয়ন করলে এবং অনুধাবন করলে অবগত হবে যে, ইসলাম তোমাদের নিকট কি চায়? সরোয়ারে কায়েনাত, সর্দারে দোজাহাঁ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকে পৃথিবীতে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন? রাসূলের সেই অনুপম আদর্শের আলোকে প্রত্যেক যুগে ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ইলম শিক্ষা সমাপন করে সেই ইলমের চাহিদা মোতাবেক ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আরম্ভ করবে। ফলাফল কি হবে, তা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবে। এ প্রচেষ্টায় যদি তোমার জীবন ব্যয় হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় কোন সফলতা নেই।

لَا تَخَافُوْا فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

এ কাজে কে কি বলল, সেদিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবে না। নিজের কাজে মগ্ন থাকবে। জীবন ধারণ করা যায় পরিমাণ দুনিয়ার ব্যস্ততা রাখবে। নিঃস্বার্থভাবে, বেতন-ভাতা ছাড়া দ্বীনের প্রত্যেক ময়দানে খেদমত করার চেষ্টা করা চাই। কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য করলে প্রয়োজন পরিমাণ বেতন-ভাতা গ্রহণ করে দ্বীনের খেদমত করাও না করার চেয়ে সহস্রগুণ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। ইলম শিক্ষা দান করা এবং ইলমের প্রচার-প্রসার করা অতীব জরুরী। ওয়াজ উপদেশ সমাজ সংস্কারের প্রাণ। কিন্তু দ্বীনকে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করবে না। বরং জিহাদের মত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানের দিকেও সর্বোচ্চ ও পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ দিবে।"

সম্মুখে মাতাপিতাকে অসীয়ত করে বলেন ঃ

"শ্রদ্ধেয় আব্বা, আম্মা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমার এই অযোগ্য ও পাপ পঙ্কিল অবস্থায়ও যদি আমি শাহাদাত ফি সাবিলিল্লাহ এর সুমহান মর্যাদা লাভে ধন্য হই,

তাহলে আপনারা সর্ব সমুক্ষে আনন্দ উদযাপন করবেন। আপনারা মনে করবেন যে, আমাদের পরিশ্রম কাজে লেগেছে। আমরা আল্লাহর দেওয়া সন্তানকে আল্লাহর অবতীর্ণ দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার পর আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরবান করেছি। সাহাবায়ে কেরামের মত আবেগ পোষণ করা চাই। তাঁদের নিকট নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের শাহাদাত কত প্রিয় ও কাংখিত বস্তু ছিল!

ہری ہے شاخ تمنا ' ابھی جلی تو نہیں
دبی ہے آگ جگر ' مگر بجھی تو نہیں
جفا کی تیغ سے گردن 'وفا شعاروں کی
کٹی ہے برسر میدان ' مگر جھکی تو نہیں

'আকাংখার শাখা-প্রশাখা সজীব রয়েছে, এখনও মরে যায়নি।
কলিজার আগুন স্তিমিত রয়েছে, কিন্তু নিভে যায়নি। জালেমদের তরবারী দ্বারা খোদাপ্রেমিকদের মাথা রণাঙ্গনে কাটা পড়েছে, কিন্তু জালিমের সম্মুখে তা অবনত হয়নি।'

এরপর আত্মীয়-স্বজনকে অসীয়ত করে লেখেন—

"শরীয়তের সীমা লংঘন করে কোন মতেই শোকতাপ ও কান্নাকাটি করবেন না। কারো তাওফীক হলে আমার শাহাদাত লাভের মহাসৌভাগ্যের জন্য এমনভাবে যেন আনন্দ উদযাপন করেন, সন্তান জন্ম নিলে যেমন আনন্দ উদযাপন করা হয়।"

جان دی ' دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

'আল্লাহর রাহে প্রাণ দিয়েছি তাতো তাঁরই প্রদত্ত ছিল,
সত্য কথা হল তাঁর হক আদায় হয়নি।'

সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব বিশেষত আব্বা, আম্মা এবং দাদাজান ও দাদীজানের সমীপে আমার নিবেদন এই যে, আপনারা দুআ করুন আল্লাহ তাআলা যেন এ কুরবানী কবুল করেন। আল্লাহ না করুন নিয়তের মধ্যে যশ, খ্যাতি, প্রদর্শন ও লৌকিকতার সামান্যতম গন্ধ থাকলেও তা যেন তিনি মাফ করে দেন। এই আমলকে নির্ভেজালভাবে তাঁর সন্তুষ্টিলাভের মাধ্যম বানান। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন, ছুম্মা

আমীন, আল্লাহুম্মা আমীন।”

* * *

এই তরুণ মুজাহিদ নেতার শাহাদাত লাভের সংবাদ পাওয়ার পর আমি যখন ফায়সালাবাদ যাই, তখন তা'যিয়াত ও সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর বৃদ্ধ ওয়ালিদ সাহেবের খেদমতেও উপস্থিত হই। আমাকে দেখে ধৈর্য ও অবিচলতার মূর্তপ্রতীক তাঁর পিতার চোখ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অশ্রু ভারাক্রান্ত হলেও তাঁর মুখে মহান আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর কৃতজ্ঞতা এবং দুআ ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না।

শহীদ মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব (রহঃ)এর সাথে যে একুশজন অকুতোভয় মুজাহিদ শাহাদত মদিরা পান করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন আফগানী এবং অবশিষ্ট পনেরজন ছিলেন পাকিস্তানের বিভিন্ন মাদরাসার তালিবে ইলম। তাঁদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন দারুল উলূম করাচীর ছাত্র।

জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণকারীদেরকে গোসল না দেওয়া এবং কাফনের কাপড় না পরানো শরী'অতের বিধান। তাদেরকে এমতাবস্থায়ই জানাযা নামায পড়ে সসম্মানে সমাহিত করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰي
اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهُ مِسْكٌ –

‘ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতী হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ—আল্লাহর পথের প্রতিটি ক্ষতস্থান কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় দেখা দিবে, আঘাতপ্রাপ্তির সময় যে অবস্থায় ছিল। তার রঙ হবে রক্তের এবং ঘ্রাণ হবে মিশকের।’ (সহীহ মুসলিম)

মুজাহিদ তালিবে ইলমগণ শাওয়ালের ছয় তারিখে আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার প্রস্তুতিকালে শাহাদাত লাভের গভীর মনোবাসনা নিয়ে গোসল করেন। সাধ্যমত সুগন্ধি ব্যবহার করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সেদিন শাহাদাতের বাসনা নিয়ে যে ক'জন মুজাহিদ তালিবে ইলম গোসল করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই শাহাদাত বরণ করেন।

খ্যাতিহীন ও অনাড়ম্বর অবস্থায় জীবন–সফর সমাপ্তকারী পবিত্রাত্মা

শহীদগণ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে জান বাজী রেখে ইনশাআল্লাহ এমন মহান মর্যাদা লাভ করেছেন, যার চিত্রাংকন করে প্রাচ্যের কবি ইকবাল বলেছেন—

بے تکلف خندہ زن ہیں ' فکر سے آزاد ہیں
پھر اسی کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں

'তাঁদের অধরে অকৃত্রিম পবিত্র হাসি এবং হৃদয় নিশ্চিন্ত। তাঁরা এমন
অখ্যাত অবস্থাতেই ফেরদৌস বেহেশতের অধিবাসী হয়েছেন।'

কিন্তু জগতবাসী তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত তো নয়ই বরং তাঁদের নাম পর্যন্ত অবগত নয়। হায় ! আমি যদি তাঁদের প্রত্যেকের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে তাঁদের সুমহান ব্যক্তিত্বকে ভক্তি ও ভালবাসার পুষ্পমাল্যে ভূষিত করতে পারতাম !

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند

'নক্ষত্রের বুকে ফাঁদ নিক্ষেপকারী, উচ্চসাহসী ও উচ্চাভিলাষী এই তরুণদের
জন্যই নিবেদিত আমার হৃদয় ভরা ভালবাসা।'

এতদসত্ত্বেও দারুল উলূম করাচীর অমূল্য রত্ন, আমাদের কলিজার টুকরা ছয়জন তালিবে ইলমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তো আমি করতে পারি। তাঁরা আমাদেরই পিতৃসুলভ স্নেহভরা ক্রোড় থেকে বার্ষিক ছুটি উপলক্ষে বিদায় নিয়ে জিহাদের ময়দানে গিয়েছিলেন।

১. শহীদ ক্বারী আমীর আহমাদ (রহঃ)

তিনি হাফেয শিরীন আহমাদ খানের পুত্র। 'গিলগিটে' তাঁর জন্ম। তিনি পবিত্র কুরআনের হিফয সমাপ্ত করে রাওয়ালপিণ্ডিতে তাজবিদুল কুরআন মাদরাসা থেকে কেরাত ও তাজবীদ শাস্ত্রের দু' বছর মেয়াদী কোর্স পূর্ণ করে দারুল উলূম করাচীতে কিতাব বিভাগে 'মারহালায়ে মুতাওয়াসসিতায়' ভর্তি হন। তখন তিনি বার/তের বছরের বালক। তারপর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এখানেই শিক্ষারত থাকেন। শাহাদাত লাভ কালে তিনি ছিলেন বিশ বছর বয়সের তরুণ। সে বছর তাঁর 'মারহালায়ে আলিয়া' সমাপ্ত করে শিক্ষা সমাপনের মাত্র দু' বছর অবশিষ্ট ছিল। তিনি

ছিলেন একজন কৃতী ছাত্র। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি পুরস্কার লাভ করতে থাকেন।

লেখাপড়ায় গভীর মনোযোগের সাথে সাথে আমল–আখলাক ও ইবাদত–বন্দেগীতেও তাঁর বিশেষ যত্ন ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে আদায় করার প্রতি তাঁর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবারে নফল রোযা রাখতেন। প্রায় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে পড়াশুনায় লিপ্ত থাকতেন। শেষ রাতে উঠে পুনরায় লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতেন। এমনতর বহুবিধ গুণের অধিকারী হওয়ায় তিনি ছিলেন উস্তাদদের অত্যন্ত প্রিয় এক তালিবে ইলম।

শাহাদাত বরণের এক বছর পূর্বে ১৯৮৪ ঈসায়ীতে মাদরাসার বার্ষিক ছুটির সময় বাড়ী গিয়ে মা–বাবার নিকট থেকে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি নিয়ে মাদরাসা থেকে সোজা আফগানিস্তান গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। বার্ষিক ছুটির মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে রণাঙ্গন থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বাড়ী থেকে পুনরায় করাচী আসার সময় মাতাপিতার নিকট পরবর্তী বছর (বার্ষিক ছুটিতে) পুনরায় জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁর পিতা তাঁকে বলেন—

“একবার তো তুমি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছ। হাফেয এবং ক্বারীও হয়েছে। এখন উচ্চতর শিক্ষালাভের কাজে লিপ্ত থাক। এ সময় তোমার জন্য ইলম অর্জন করাই একটি জিহাদ।”

ছেলে তখন সবিনয়ে নিবেদন করে বলেন—

‘আফগানিস্তানের জিহাদে আমি যেসব ঘটনা ও পরিস্থিতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, তা বিদ্যমান থাকতে নীরব দর্শক সেজে তামাশা দেখা ঈমানের দাবী ও চেতনার পরিপন্থী। সেখানে মা–বোনদের সতীত্ব লুণ্ঠিত হচ্ছে। মসজিদ ও মাদরাসাসমূহকে আস্তাবলে পরিণত করা হয়েছে। জনপদসমূহকে বিরান করা হয়েছে। ক্ষেত ও শস্য বরবাদ করা হয়েছে।’

তাঁর আব্বা তাঁর তীব্র আকাংখা দেখে পুনরায় জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু স্নেহময়ী মা বাধ সেধে বলেন—

‘বেটা তোমার উপর আমাদেরও তো হক রয়েছে। সারা বছর চোখের আড়ালে থাক। তুমি বাড়ী এলে আমরা কত আনন্দিত হই। কমপক্ষে ছুটির সময়টা তো আমাদের সাথে অতিবাহিত করবে।’

তাদের মহান সন্তান তখন আবদারের সুরে বলেন—

'মা আমার! আমি ইহকালীন ক্ষণস্থায়ী আনন্দ পরকালীন চিরস্থায়ী আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করেছি। তাই ইহকালীন কোন আনন্দের ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করবেন না। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই পরকালীন চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করতে পারব।'

সন্তানের আবদারে মমতাময়ী মাও অনুমতি প্রদান করেন।

বিধায় পরবর্তী বছরের বার্ষিক ছুটিতে পুনরায় তিনি তাঁর সাথীদের সাথে উরগুনের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং ১৪০৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের ছয় তারিখে 'শারানা'র রক্তাক্ত লড়াইয়ে শাহাদাত মদীরা পান করেন। কিন্তু—

جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں
آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں

'মানব উপাদান অনন্তকালের জন্য, সে অস্তিত্বহীন হয় না। যদিও দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় কিন্তু বিলুপ্ত হয় না।'

২. শহীদ হাফেয মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (রহঃ)

হাজী আবদুল খালেক সাহেবের মহান এ পুত্র ১৯৬৪ ঈসায়ীতে গিলগিট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর স্কুলের পরিবেশের ব্যাপারে মন বিষন্ন হয়ে যায়। তাঁর অন্তরে ধর্মীয় শিক্ষালাভের প্রেরণা জাগ্রত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে সুযোগ ও পরিবেশ হয়ে উঠে না। তখন তিনি কিছুদিন তাবলীগ জামা'আতে সময় লাগান। তারপর ষোল বছর বয়সে দারুল উলূম করাচীতে ভর্তি হন। তাঁর সম্মানিত পিতা বলেন, আমি তাকে তিন বছর পর্যন্ত বাড়ী না আসার উপদেশ দান করি। বিধায় সে তিন বছর পর্যন্ত ছুটির সময়গুলো তাবলীগে অতিবাহিত করে। তিন বছর পর ১৯৮৬ ঈসায়ীতে বাড়ী আসার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৮৫ ঈসায়ীর বার্ষিক ছুটির পূর্বে সে একটি পত্রে লেখে—

'কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মোলাকাতের মহাসৌভাগ্য লাভ করা আমার হৃদয়-বাসনা। বিধায় আপনারা আমাকে আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করুন।'

'আমি তাকে ছুটির সময়ে রণাঙ্গনে গমনের অনুমতি প্রদান করি।'

সুতরাং বার্ষিক ছুটিতে তিনিও উরগুন রণাঙ্গনে গমন করেন এবং শাওয়ালের ৬ তারিখে শারানার রক্তাক্ত লড়াইয়ে স্বীয় আমীরের সাথে শাহাদাত লাভে ধন্য হন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ، فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তাঁরা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। (সূরা আলে ইমরান, ১৬৯–১৭০)

৩. শহীদ আবদুল ওয়াহিদ ইরানী (রহঃ)

ইরানের সুন্নী খানদানের এ সন্তান ইলমে দ্বীনের পিপাসা নিয়ে পাকিস্তান আগমন করেন। এখানে এসে বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকেন। অবশেষে দারুল উলূম করাচীতে ভর্তি হন। তাঁর মন–মগজে একথা বদ্ধমূল ছিল যে, জিহাদ ছাড়া মুসলমান জাতি মর্যাদা লাভ করতে পারে না। ফলে তিনি ১৪০৫ হিজরীর বার্ষিক ছুটিতে উরগুন রণাঙ্গনে জিহাদরত থাকেন। অবশেষে শারানার লড়াইয়ে বীরত্বের স্বাক্ষর রেখে শাহাদাতের মহান মর্যাদায় ভূষিত হন।

سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں
خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں

'শহীদের তপ্ত খুন সমাধির শীতলতায়ও নিরুত্তাপ হয়ে যায় না।
মৃত্তিকাগর্ভে সমাহিত হয়েও তাঁদের তেজ অবদমিত হয় না।'

৪. শহীদ আবদুর রহমান আফগানী (রহঃ)

শহীদ আবদুর রহমান আফগানী (রহঃ) মুহাম্মাদ আজম সাহেব যাকারিয়ায়ী এর সন্তান। তিনি আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশের রাস্তাক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ও আত্মীয়–স্বজনদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে জালেম রাশিয়ান সেনাবাহিনী শহীদ করে ফেলে।

তখন তিনি ছিলেন বালক। কোন একরূপে তিনি মুহাজিরদের কাফেলায় শামিল হয়ে পদব্রজে পাকিস্তান এসে পৌছেন। এখানে তিনি বিভিন্ন মাদরাসা থেকে ধর্মীয় শিক্ষালাভ করতে থাকেন। ১৪০৩ হিজরী সনে দারুল উলূম করাচীতে ভর্তি হন। বার্ষিক পরীক্ষাসমূহে উচ্চ নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হতে থাকেন। কোন এক জায়গা থেকে বই বাঁধাইয়ের কাজ শিখেছিলেন। অবসর সময়ে ছাত্রদের বই বাঁধাই করে দিয়ে যে কয় পয়সা আয় হত তা দিয়ে কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করতেন। জালিম রাশিয়ান খোদাদ্রোহীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা তাকে অস্থির করে রাখে। ১৪০৫হিজরীর বার্ষিক ছুটিতে শিক্ষাসমাপনের একবছর মাত্র অবশিষ্ট থাকতে উরগুন রণাঙ্গনে গমন করে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বেশ কিছু রাশিয়ানকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। অবশেষে ছুটির শেষ সময়ে শারানার রণাঙ্গনে বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে প্রিয়তম শাহাদাতকে আলিঙ্গন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর।

তিনি ১৪০৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ সন্ধ্যায় জীবনের এই শেষ লড়াইয়ে যাত্রার প্রাক্কালে পাকিস্তানগামী এক সঙ্গীর হাতে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেন। চিঠিটি ছিল আমার ছেলে মৌলভী মুহাম্মাদ যুবায়ের উসমানী (সাল্লামাহু)এর নামে। তারা উভয়ে সহপাঠী ছিল। চিঠিটি এখন আমার সম্মুখে রয়েছে। চিঠিতে সে লিখেছে—

'এ অধমকে দুআর মধ্যে স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ পাক যেন আমাকে এবং অন্যান্য সকল সাথীকে পবিত্র জিহাদের পথে ধৈর্য, সাহস ও অবিচলতা দান করেন। তাঁর পথে আমাদেরকে কবুল করেন। সমস্ত মুসলমানকে এবং আপনাকেও এ পথে বের হওয়ার তাওফীক দান করেন। কেননা এরপর জিহাদ ছাড়া জীবন কাটানো কঠিন ব্যাপার। জিহাদ তখনই ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ তথা দ্বীনের শীর্ষ চূড়া হতে পারবে, যখন আমরা দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য জান–মালের পরিপূর্ণ কুরবানী দিতে পারবো। মরতে তো হবেই, তাহলে শহীদ হয়ে মরব না কেন?

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ –

'কোন প্রাণী আল্লাহর হুকুম ছাড়া মৃত্যুবরণ করতে পারে না।'

তিনি শহীদ হওয়ার পর পত্রটি এখানে এসে পৌছে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں
ٹوٹنا جس کا مقدر ہو ' یہ وہ گوہر نہیں

'জীবনাগ্নির পরিণতি ভস্ম হওয়া নয়। ভেঙ্গে পড়া যার ভাগ্যলিপি এ সে কাঞ্চন নয়।'

৫. শহীদ মুহাম্মাদ ইকবাল (রহঃ)

শহীদ মুহাম্মাদ ইকবাল (রহঃ)। পিতা আবদুর রহমান। জন্ম গিলগিটে। ১৮ বছর বয়সে দারুল উলূম করাচী ভর্তি হন। তিনি পরিচ্ছন্ন ও লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় সরোবর ছিল জিহাদী জযবায় টইটুম্বুর। ১৪০৫ হিজরীতে 'মারহালায়ে ছানুবিয়া খাসসা' সমাপ্ত করেন। বয়স তখন বিশ বছর। বার্ষিক ছুটিতে উরগুন রণাঙ্গনে জিহাদে রত থাকেন। শাওয়ালের ৬ তারিখে শারানার লড়াইয়ে স্বীয় আমীরের সঙ্গে শাহাদাত লাভ করে আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

زندگانی تھی ' تری مہتاب سے تا بندہ تر
خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر

'তোমার জীবন ছিল পূর্ণ শশীর চেয়েও দীপ্তিমান।
তোমার জীবন-সফর ছিল ভোররাতের নক্ষত্রের চেয়েও উজ্জ্বল।'

৬. শহীদ মৌলভী মুহাম্মাদ সালীম বর্মী (রহঃ)

শহীদ মৌলভী মুহাম্মাদ সলীম ছিলেন আবদুল হাদী সাহেবের সৌভাগ্যবান সন্তান। তিনি ১৯৬১ ঈসায়ীতে বার্মায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা সেখানেই লাভ করেন। মুসলমানদের উপর স্থানীয় সমাজতান্ত্রিক সরকারের সেই পীড়ন-দমন তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, যারফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজেদের ধর্ম ও মর্যাদা রক্ষার্থে হিজরত করতে বাধ্য হন। তিনি ইসলামী জ্ঞান লাভ করে স্বদেশের অসহায় মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার নিয়তে পাকিস্তান আসেন। দারুল উলূম করাচী তিন বছর শিক্ষারত থাকেন। ১৯৮৫ ঈসায়ীতে 'মারহালায়ে আলীয়া' সমাপ্ত করেন। দাওরা হাদীস পাশ করতে আর মাত্র দু' বছর বাকী ছিল। জিহাদে যাওয়ার সময় তিনি সাথীদেরকে বলেন,

'দুআ করবেন, যেন শাহাদাত নসীব হয়।'

তিনি রসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। রণাঙ্গনের অগ্নি ও বারুদ বর্ষণের মাঝেও মুজাহিদ সাথীরা তাঁর কৌতুকপূর্ণ রসাত্মক কথায় স্বাদ উপভোগ করতেন। একবার তাঁকে তিনজন সঙ্গীসহ টহলের কাজে নিয়োজিত করা হয়। ফেরার পথে তাঁরা সবাই পথ ভুলে যান। তাঁদের এক সঙ্গী পরামর্শ দেন যে, 'পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী তিনবার ফায়ার কর। ফায়ারের আওয়াজ শুনে আমাদের সঙ্গীরা পাল্টা ফায়ার করবে, তাতে আমরা সঠিক দিক বুঝতে পারবো।' অন্য একজন সাথী বলেন, 'কিভাবে ফায়ার করব? শত্রু চৌকির একেবারে সন্নিকটে আমরা অবস্থান করছি।' তখন সালীম বলেন, 'আস্তে ফায়ার কর, যাতে শত্রুপক্ষ শব্দ শুনতে না পায়।'

১৪০৫ হিজরীর শারানার লড়াইয়ে তিনি মারাত্মক আহত হন। বসে থাকার মত শক্তিও তাঁর দেহে অবশিষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় পাকিস্তান আনার জন্য তাঁকে একটি উটের উপর বেঁধে দেওয়া হয়। অন্যান্য আহত সাথীদেরকেও একইভাবে উটের উপর বেঁধে দেওয়া হয়। বহুদূর পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। তরুণ দেহের তাজা খুন অবিরাম প্রবাহিত হতে থাকে। অবশেষে পথিমধ্যেই তিনি মহান মালিক আল্লাহর দরবারে চলে যান। শারানার অদূরের 'মুশখেল' নামক একটি আফগান গ্রামে লাশ পৌঁছে দেওয়া হয়।

এদিকে কোর্টওয়াল গ্রামের লোকজন এসে মুশখেলের লোকদেরকে বলে যে, এই শহীদকেও আমরা আমাদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে তাঁর আমীর ও অন্যান্য শহীদদেরকে যেখানে সমাহিত করা হয়েছে একেও সেখানেই সমাহিত করতে চাই। কিন্তু মুশখেলের অধিবাসীরা কোনভাবেই তাতে রাজি হয়নি। তাদের বক্তব্য ছিল, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন। একে আমরা আমাদের গ্রামেই দাফন করব। বিতর্কের পর অবশেষে যখন তাঁকে মুশখেলেই সমাহিত করা হচ্ছিল, তখন গ্রামের লোকদের প্রবাহিত অশ্রু এই পরদেশী শহীদকে ভক্তির সওগাত পেশ করছিল।

سر خاک شہیدے ' برگہائے لالہ می پاشم
کہ خونش بانہال ملت ما سازگار آمد

'শহীদের সমাধিতে পুষ্প পাঁপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছি। কারণ তাঁর পবিত্র খুন
ধর্মকে উজ্জীবিত করতে অবদান রেখেছে।'

এই লড়াইয়ের আহত ছাত্রবৃন্দ

যেসব ছাত্র আহত হয়েছিলেন, তাদেরকে অতিকষ্টে প্রায় তিনদিনের প্রাণান্তকর সফর করে পাকিস্তানের 'টাংক' নামক শহরে পৌছিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দারুল উলূম করাচীতে মর্মান্তিক এই দুঃসংবাদ পৌছামাত্র মাদরাসার হোষ্টেল প্রধান জনাব মাওলানা ইসহাক সাহেব—যিনি মাতাপিতার স্নেহ নিয়ে দিবস–রজনী ছাত্রদের আরাম ও শান্তির চিন্তা–ফিকির করে থাকেন। বিশেষতঃ ভাল ছাত্রদের ব্যাপারে বড়ই স্নেহশীল—অস্থির হয়ে করাচী থেকে বাসযোগে ডেরা ইসমাইল খান হয়ে টাংক পৌছেন। ঈগল প্রকৃতির এই মুজাহিদ ছাত্রদের সেবা শুশ্রূষার কাজে তিনিও অংশগ্রহণ করেন।

আহত এসব ছাত্রের মধ্যে দারুল উলূম করাচীর ছাত্র মৌলভী মুহাম্মাদ সালীম (সাল্লামাহু)ও ছিলেন। বোমার টুকরা এবং গুলি লেগে তাঁর ডান বাহু ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমি শারানার লড়াইয়ের বিস্তারিত অনেক ঘটনা তাঁর মুখেই জানতে পারি। (অবশিষ্ট বিস্তারিত ঘটনা হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা 'শুহাদায়ে হরকাতিল জিহাদিল ইসলামী' থেকে সংগৃহীত।)

* * *

অখ্যাত এসব মুজাহিদ ও শহীদদের আলোচনা সংক্ষেপ করার পূর্ণ চেষ্টা সত্ত্বেও বেশ দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে তাঁদের হক তো ছিল এর চেয়েও অনেক বেশী। কেননা এ ভ্রমণ কাহিনী রচনার লক্ষ্যই হলো—যে অবস্থায় আফগানিস্তানের জিহাদ চলছে এবং মুজাহিদরা যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের জন্য বুকের রক্ত দিয়ে আশার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করছেন, তার একটি ঝলক পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরা। যা হোক এখন ভ্রমণ বৃত্তান্ত যেখানে ছেড়ে এসেছিলাম সেখান থেকে শুরু করছি।

অফিসে এসে আমরা জামা'আতের সাথে মাগরিব নামায আদায় করি। নামাযান্তে পরবর্তী সফরের বিস্তারিত প্রোগ্রাম তৈরীর কাজে মনোনিবেশ করি। রাতের খাবার—যা সম্ভবত মুজাহিদরাই তৈরী করেছিলেন— খেয়ে এশার নামায আদায় করি। নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মুজাহিদদের সঙ্গে রণাঙ্গনের বর্তমান অবস্থা এবং জেনেভায়

আলোচিত 'জেনেভা চুক্তি'র বিভিন্ন দিক নিয়ে মত বিনিময় চলতে থাকে।

এটি ছিল শা'বান মাসের পঞ্চদশ রাত্রি অর্থাৎ 'শবে বরাত'। শবে বরাত এমনিতেও এবাদতের উদ্দেশ্যে জেগে কাটানো হয়; তাই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। রাত তিনটায় উঠে পরবর্তী মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা হবে। বাসের মধ্যেই তিলাওয়াত, যিকির ও দুআ করতে করতে সফর অব্যাহত রাখা হবে। করাচীতে অতিবাহিত গত রাতে মাত্র তিন ঘন্টা ঘুমোতে পেরেছিলাম। তারপর ফজর নামাযের পর থেকে এ পর্যন্ত কারও পিঠ সোজা করার মত সুযোগ লাভ হয়নি। রাত বারটার দিকে দপ্তরে বিছানো বিছানায় যার যেখানে সুযোগ হয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমার তো সবসময়ই দেরীতে ঘুম আসে, আর আজ তো রণাঙ্গনে যাওয়ার আনন্দ হৃদয়ে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। বলতেই পারি না যে, কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

রবিবার, ১৫ই শাবান, ১৪০৮ হিজরী
মোতাবেক ৩রা এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী

রজনীর শেষভাগে ৩টার দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দপ্তরের ভিতরে ও বাইরে বেশ চাঞ্চল্য দেখতে পাই। মুজাহিদরা সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। পূর্বেই বাস ভাড়া করা হয়েছিল। সবাই তাড়াতাড়ি উযূ ইত্যাদি সেরে বাসে উঠে বসে। তবুও শহর ছেড়ে বের হতে হতে ৪টা বেজে যায়। ডেরা ইসমাইল খান থেকে আমাদের কাফেলায় এই মুজাহিদ কেন্দ্রের সচিব জনাব কারী নেয়ামত উল্লাহ সাহেব এবং আরও দু'জন পাকিস্তানী মুজাহিদ শামিল হন। এখন কাফেলা বিশ সদস্য বিশিষ্ট। রাতের অন্ধকার ও নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে বাস দ্রুত উত্তর-পশ্চিম দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করে। বেশীর ভাগ সাথী তিলাওয়াত, যিকির এবং দুআয় লিপ্ত থাকেন। বাসটি ছিল বড় এবং নতুন। সিটগুলোও ছিল আরামদায়ক। শেষ রজনীর নির্মল ও স্নিগ্ধ পরিবেশে তিলাওয়াত, যিকির, মুনাজাত, শবেবরাতের নূরানী আমেজ এবং জিহাদী সফরের ঈমানদীপ্ত আবেগের সমাবেশ পরিবেশকে এক অপার্থিব ভাব ও মত্ততায় আচ্ছন্ন করে রাখে। মন চাচ্ছিল অনন্তকাল ধরে এ সফর অব্যাহত থাকুক। কখনো সমাপ্ত না হোক। হযরত মুর্শিদ আরেফী (রহঃ) বলেন—

شراب بے خودی شوق بھی کیا جانے کیا شے ہے؟
برابر پی رہا ہوں ' اور ذرا تسکین نہیں ہوتی

'আবেগে আত্মহারা হওয়ার এই শরাবে কি যে প্রভাব রয়েছে তা আর কি বলব! অবিরাম পান করে চলছি। কিন্তু সামান্য পরিতৃপ্তিও লাভ হচ্ছে না।'

সোয়া পাঁচটার দিকে আমরা 'টাংক' শহরের উপকণ্ঠে পৌছে যাই। আমাদের সফরসঙ্গী মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৮৫ ঈসায়ীতে শারানার লড়াইয়ে আহত ছাত্রদেরকে এ শহরেই এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তখন আমি বুঝতে পারি যে, মাওলানা সাহেব করাচী থেকে বাসযোগে কত দীর্ঘ সফর অতিক্রম করে একাকী এখানে এসেছিলেন। তাঁর এখানে পৌছতে কমপক্ষে দুইদিন সময় তো অবশ্যই লেগেছিল। তবে ছাত্রদের প্রতি তাঁর অসাধারণ ভালবাসা ও স্নেহ এমন অকৃত্রিম যে, কখনো তিনি সফরের এই দৈর্ঘ্য ও তার কষ্ট সম্পর্কে ইঙ্গিতেও কিছু উল্লেখ করেননি।

পথের ধারে অসমতল একটি মাঠ। মাঠের শেষ প্রান্তের আধাপাকা একটি হোটেলের সম্মুখে গিয়ে বাসটি দাঁড়িয়ে যায়। একটি খালি বাস পূর্ব থেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসের যাত্রীরা হোটেলের চত্বরে জামা'আতের সাথে ফজর নামায আদায় করছিলেন। বেশভুষায় তাদেরকেও আফগানিস্তানগামী মুজাহিদ মনে হচ্ছিল। আমরা নতুনভাবে উযূ করে নামাযের জন্য চত্বরে এসে পৌছি। ইতিমধ্যে তাঁরা নামায শেষ করে দ্রুত সম্মুখপানে যাত্রা করেন। এখানকার পরিবেশে এমন অপার্থিব ও মধুময় এক ভাব বিরাজ করছিল, যেমন কিনা পবিত্র মক্কা থেকে পবিত্র মদীনা যাওয়ার পথে 'রাবেগ' 'মাস্তুরা' এবং 'বদ্‌র' ইত্যাদি মঞ্জিলসমূহে বিরাজ করে। করাচী এবং মুলতানে বেশ গরম রেখে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে মনোমুগ্ধকর শীতল আবহাওয়া বিরাজ করছিল।

জামাআতের সাথে নামায শেষ করলে সঙ্গীরা বললেন ঃ এ হোটেলে যা কিছু প্রস্তুত আছে তা দিয়েই নাস্তা করে নেওয়া হোক। এরপর দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। হোটেলে কিছু বিস্কুট, কিছু সিদ্ধ ডিম এবং চা পাওয়া গেল। সেগুলো দিয়ে নাস্তা সেরে

সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমরা সম্মুখে যাত্রা করি। বাস এখন পশ্চিম দিকে ছুটে চলছে। আর আমাদের অন্তরে আবেগের দোলা দোল খাচ্ছিল।

باد صبا کی موج سے ' نشو و نمائے خار و خس
میرے نفس کی موج سے ' نشو و نمائے آرزو

'দক্ষিণা মলয়ের তরঙ্গাঘাতে প্রকৃতির গাছপালা প্রবৃদ্ধি লাভ করে। আর আমার হৃদয়ের আবেগ–তরঙ্গে হৃদয় বাসনা প্রবৃদ্ধি লাভ করে।'

দক্ষিণ উযিরস্তানে

দীর্ঘ সময় সোজা পথ ধরে চলার পর সড়কটি ক্রমান্বয়ে মোড় নিয়ে পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করেছে। এখন দক্ষিণ উযিরস্তানের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা সুদৃশ্য অঞ্চল আরম্ভ হয়েছে। উভয়দিকে ছোট বড় পাহাড়। উঁচু–নীচু জমিনে সবুজ–শ্যামল ফসলের ক্ষেত। সুদূর বিস্তৃত নীরব নিস্তব্ধ প্রান্তর। কলকল ধ্বনিতে মুখরিত পাহাড়ী নদী। আর কোথাও কোথাও শীতল ও মিষ্টি পানির কুদরতী প্রস্রবন। এটি আযাদ এলাকা। লোকেরা এ অঞ্চলকে 'এলাকায়ে গায়ের' বলে থাকে। এখানে গোত্র শাসিত জীবনধারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক গোত্র এখানে স্বাধীন। কোন প্রশাসনের শাসনদণ্ড নেই। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের কোলে এবং উঁচু–নীচু প্রান্তরে জনবসতি গড়ে উঠেছে। মাশাআল্লাহ, ফল ও ফুলের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এসব অঞ্চল। জনবসতির ভিতরে এবং বাইরে জায়গায় জায়গায় দূর্গ সদৃশ বড় বড় প্রাচীর বেষ্টিত কাঁচা গৃহ রয়েছে। এসব গৃহ অনেক উঁচুতে টিলার উপর নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ফায়ারিং করার জন্য যথানিয়মে বাংকারও তৈরী করা হয়েছে। কারণ বিভিন্ন গোত্রের মাঝে প্রায়ই লড়াই লেগে থাকে। এখানে এসে সড়ক সংকীর্ণ হয়ে গেছে। পূর্বে এ সড়কটিও কাঁচা ছিল। আফগানিস্তানে জিহাদ চলাকালে এটি পাকা করা হয়েছে। সড়কটি দক্ষিণ উযিরস্তানের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত মোড় খেয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, আযাদ এলাকাসমূহের পাকা সড়কেই কেবল পাকিস্তান সরকারের আইন, আর অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অঞ্চলে গোত্রীয় ধারা ও ঐতিহ্য কার্যকর রয়েছে। পাকিস্তানের আযাদ অঞ্চলসমূহে আমার ইতিপূর্বেও যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। তবে দক্ষিণ উযিরস্তান দেখার এই

প্রথম সুযোগ হলো। এ আযাদ অঞ্চল অতিক্রম করার পর আফগানিস্তানের সেই সীমান্ত আরম্ভ হয়, যেখান দিয়ে আমাদেরকে উরগুন রণাঙ্গনে যেতে হবে। এ অঞ্চলে কৃষি ও ব্যবসা ছাড়া অনেক লোকের জীবিকা পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। জায়গায় জায়গায় বকরীর পাল দৃষ্টিগোচর হয়। নারী, পুরুষ ও শিশুরা সেগুলো চরিয়ে থাকে। কোথাও কোথাও বেদুইনদের কাফেলাও দৃষ্টিগোচর হয়। তারা গ্রীষ্মকাল কাটানোর জন্য পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেছে।

"کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ"

'ঈগল নীড় রচনা করে না।'

দশটার কাছাকাছি সময়ে একটি পাহাড়ী নদীর তীরে পাহাড়বেষ্টিত ছোট একটি কাঁচা হোটেল দেখতে পাই। সবাই পীপাসার্ত ছিলাম। পাহাড়ী নদীর অত্যন্ত নির্মল ও স্বচ্ছ ঠাণ্ডা পানি খুব তৃপ্তিভরে পান করি। এমন তৃপ্তিদায়ক পানি করাচীতে স্বপ্নেই পাওয়া সম্ভব। কিছু সাথী চা–ও পান করেন। সবাই ক্লান্তিমুক্ত হয়ে নতুন উদ্যমে পুনরায় পশ্চিম দিকে যাত্রা করি। এখন আমরা দক্ষিণ উযিরস্তানের কেন্দ্রীয় শহর 'ওয়ানা'–এর অদূরে পৌঁছে গেছি। সেখানকার প্রখ্যাত আলেম মাওলানা নূর মুহাম্মাদ সাহেবের এই পয়গাম ডেরা ইসমাইল খানে পেয়েছিলাম যে, 'ওয়ানা'য় তাঁরা আমাদের প্রতীক্ষায় থাকবেন এবং তাঁদের সাথেই দ্বিপ্রহরের খানা খেতে হবে।

১১টার দিকে আমরা 'ওয়ানা' শহরে প্রবেশ করি। এখানকার জমকাল জামে মসজিদের সম্মুখে যখন বাস এসে দাঁড়ায়, তখন আমরা মসজিদের দরজায় প্রতীক্ষমান ছাত্রদেরকে 'পাখতুন' এর ঐতিহ্য মতে ক্লাসিনকোভ দ্বারা সজ্জিত দেখতে পাই। তাঁরা উষ্ণতাপূর্ণ ভালবাসা নিয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানান। আমরা মসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে মাওলানা নূর মুহাম্মাদ ছাহেবও তশরীফ আনেন। তিনি অত্যন্ত ভালবাসা ও আনন্দ সহকারে সকলের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। আমাদেরকে উপরতলায় তাঁর অফিস কক্ষে নিয়ে যান। মসজিদ এবং অফিসের সমস্ত ভবন অত্যন্ত সুন্দর এবং আধুনিক প্রযুক্তি অনুপাতে নির্মিত। এখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ দর্শনীয় যে, দক্ষিণ উযিরস্তানের যে দীর্ঘ ও বিস্তর অঞ্চল এবং জনপদ অতিক্রম করে আমরা

এখানে এসে পৌঁছেছি, এই বিস্তর অঞ্চলে এবং খোদ 'ওয়ানা' শহরেরও বাসগৃহসমূহ কাঁচা বা আধাপাকা এবং সিংহভাগ অধিবাসী দরিদ্র, কিন্তু তারা এখানে এমন শানদার জামে মসজিদ তৈরী করেছেন যে, এ সম্পূর্ণ অঞ্চলে এর সমকক্ষ কোন ভবন দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাচীরসমূহে মার্বেল পাথর লাগানো। মসজিদের জমকালো মিনার দূর থেকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। অফিসের চতুর্দিকে সারি সারি আলমারি সাজানো রয়েছে। তার মধ্যে আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষার মানসম্পন্ন ও প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ সুনিপুণভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যা তাদের জ্ঞান-রুচির পরিচয় প্রদান করে। মসজিদ সংলগ্ন 'দারুল উলূম উযিরস্তান, ওয়ানা', নামে বিরাট একটি দ্বীনী মাদরাসা রয়েছে। সেখানে মাদরাসা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং ইংরেজী শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে।

মাওলানা নূর মুহাম্মাদ সাহেব জামে মসজিদের খতীব এবং মাদরাসার মুহতামিম। তিনি উযিরস্তানের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও বিজ্ঞানের অঙ্গনে একজন প্রতাপশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মেধা, প্রতিভা, আভিজাত্য, জ্ঞান-রুচি, তীক্ষ্ণ উপলব্ধি-শক্তি এবং বিনয় ও নম্রতার কারণে প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর সঙ্গে আমার অকৃত্রিম ও আন্তরিক হৃদ্যতা জন্মে। এ অঞ্চলে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের আন্তরিক সহযোগী ও হিতাকাংখী অনেক। তাদের উসীলায় দক্ষিণ উযিরস্তানে মুজাহিদরা যাতায়াত করার ও রসদ পৌঁছানোর সুবিধা লাভ করেছে।

এখানে রাশিয়ার গোমস্তাদের এবং তাদের চক্রান্তেরও অভাব নেই। তারা রাতদিন জিহাদ, মুজাহিদ ও আফগান মুহাজিরদের (শরণার্থী) বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালানোর কাজে রাশিয়ার আর্থিক সাহায্য পানির মত ব্যয় করছে। তবে মাওলানা সাহেব ও তাঁর সহযোগীরা এখানে তাদের চক্রান্তসমূহকে অনেকাংশেই ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এখানকার আত্মমর্যাদাশালি বাহাদুর মুসলমানগণ বড় ধরনের প্রত্যেকটি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

"ঈগল ও শকুন একই আকাশে বিরাজ করলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর তফাত রয়েছে।"

মাওলানা সাহেব ২৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'জিহাদে আফগানিস্তান' নামে উঁচুমানের গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর একটি করে কপি আমাদের সবাইকে প্রদান করেন। মাওলানা সাহেবের সঙ্গে উরগুন রণাঙ্গন সম্পর্কে মত বিনিময় হয়। তিনি এ অঞ্চলে রাশিয়ান গোমস্তাদের চক্রান্ত সম্পর্কেও আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

আযাদ কবায়েলসমূহের ঘোষণা

মাওলানা সাহেব বললেন ঃ আমরা (স্বাধীন গোত্রসমূহ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আপনারাও আমাদের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া ভাল হবে যে, 'জেনেভা চুক্তিতে' যদি আফগানিস্তানের মুজাহিদদের অবস্থানকে এড়িয়ে যাওয়া হয়, কিংবা তাদের সহযোগিতার উপর কোন প্রকার বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়, তাহলে পাকিস্তান সরকার নিজেদের অপারগতার কারণে তাতে স্বাক্ষর করলেও আমাদের (স্বাধীন গোত্রসমূহ) উপর সে 'সমঝোতা' প্রযোজ্য হবে না। আমরা এ জাতীয় যাবতীয় চুক্তিকে এখন থেকেই প্রত্যাখ্যান করছি এবং ঘোষণা করছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়ান সেনাবাহিনী ও তার উপদেষ্টারা আফগানিস্তান ছেড়ে না যাবে এবং সমগ্র আফগানিস্তানের উপর মুজাহিদদের ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হবে সে পর্যন্ত আমরা সার্বিকভাবে মুজাহিদদেরকে সহযোগিতা করা অব্যাহত রাখব এবং তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে থাকব।

"اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی"

'আল্লাহর সিংহরা শৃগালের মত ভীরু নয়।'

যোহর নামাযের জামাআত হবে দেড়টায়। আমরা আহার শেষ করে ১টার সময়েই পৃথক জামাআতে নামায আদায় করে ঠিক সোয়া ১টার সময় সম্মুখপানে যাত্রা করি। আজ সূর্যাস্তের পূর্বে আমাদেরকে দক্ষিণ উযিরস্তানের সীমান্ত শহর 'বাগাড়'–এ পৌঁছতে হবে। এটি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত মুজাহিদদের একটি ক্যাম্প। সেখানে রাত অতিবাহিত করে পরদিন সকালে আফগানিস্তানের 'পাকতিকা' প্রদেশে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের বাস পুনরায় পশ্চিম দিকে ছুটে চলছে।

প্রায় এক ঘন্টা পথ চলার পর 'আজম ওয়ার্সাক' শহর সম্মুখে পড়ে।

শহরের বসতি এলাকা ছেড়ে সম্মুখে অগ্রসর হলে পাকিস্তানের সেনা চৌকি দৃষ্টিগোচর হয়। এটিই সেই চৌকি, যার উপর একবার রাশিয়ান–আফগান জঙ্গী বিমান বোমা বর্ষণ করে। বাস চৌকির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে সম্মুখে চলে যায়। এখানে এসে পাকা সড়ক শেষ হয়ে যায়। 'টাংক' শহর ছাড়ার পর ভোর থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত ঠিক পশ্চিম দিকে সফর চলতে থাকে। এখন আমরা উযিরস্তানের একবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। সম্মুখে আকাশ–চুম্বী পর্বতরাজির কুদরতী প্রাচীর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর–দক্ষিণে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতসারি। প্রাকৃতিক এ প্রাচীরের পিছনে পশ্চিম দিকে আফগানিস্তান। এখান থেকে বিশাল আকৃতির ভয়ংকর এই পর্বতসারি অতিক্রম করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করার হয়ত কোন পথ নেই, কিংবা থাকলেও তা উরগুন রণাঙ্গনের দিকে যায়নি। তাই পর্বতসারির পাদদেশে পৌঁছে বাস উত্তরদিকে মোড় নেয়। এখন আমরা সুনসান এক উপত্যকার মধ্য দিয়ে সফর করছিলাম। যার ডান ও বাম উভয় দিকে পর্বতসারি। আমাদের বামদিকের সেই পর্বতসারি আমাদের সাথে সাথে চলছিল, যার পিছনে আফগানিস্তান।

রহস্যময় পাথুরে এ উপত্যকায় বহু দূর পর্যন্ত কোন জনবসতির চিহ্ন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। কাঁচা সড়কও নেই। যেখানে গাড়ী যাতায়াতের অস্পষ্ট চিহ্ন পড়েছে এবং ডানে বামে সরে গিয়ে পাথরের পরিমাণ কিছুটা কমে গিয়েছে সেটাই এখন আমাদের কাঁচা সড়ক।

কয়েক মাইল সম্মুখে অগ্রসর হয়ে উপত্যকাটি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। বাস ধীরে ধীরে ডানদিকের পর্বতসারির মধ্য দিয়ে উত্তরদিকে উপরে আরোহণ করতে থাকে। ধীর গতিতে অসংখ্য পাহাড় অতিক্রম করার পর সম্মুখে অনেক উঁচু সবুজ শ্যামল একটি পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। সুন্দর সুউচ্চ 'চিল' বৃক্ষে ঢাকা পর্বত শিখর দুগ্ধফেনিভ তুষারে ঝলমল করছিল। বাস ক্রমান্বয়ে সেই পাহাড়ে আরোহণ করতে থাকে। এখানে কাঁচা, সংকীর্ণ এবং আঁকাবাঁকা পথের উপর জায়গায় জায়গায় চোখা পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে। বাস অতি কষ্টে দোলনার মত দুলতে দুলতে পায়ে পায়ে উপরে আরোহণ করছিল। গাড়ীটি নতুন হওয়া সত্ত্বেও তার প্রত্যেক লোমকূপ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি গর্জে উঠছিল। আমি উঁচু পাহাড়ের কাঁচাপথে অনেক বারই সফর করেছি। কিন্তু গাড়ীকে দুর্গম বন্ধুর পথের

সামনে এমন অসহায় হয়ে পড়তে ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। এ কারণেই এই পথের জন্য ভাড়ায় গাড়ী পাওয়া খুব দুরূহ হয়ে পড়ে।

অধমের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা সাহ্‌বান মাহমুদ সাহেবের—যার সাথে আমরা সফর করছিলাম—ডায়াবেটিস এবং ব্লাডপ্রেসারের সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসকগণ তাঁকে অনেক বছর আগে থেকে পাহাড়ী পথে সফর করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু জিহাদের উদ্দীপনায় সবরকম কষ্টকে বিস্মৃত হয়ে তিনি সফর করছেন। পথের এই দুর্গম অবস্থা সম্পর্কে পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল না। অন্যথা আমি নিজেই করাচী থাকতে তাঁকে এই সফরের বিপদ বহন না করার জন্য অনুরোধ করতাম। অনেক উপরে আরোহণের পর তাঁর চরম শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রাখেন এবং কষ্টের কথা কাউকে তা জানতে দেননি। পরদিন আফগানিস্তান পৌঁছার পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে তখন আমাদেরকে সে কথা বলেন। আমাদের রওয়ানা হওয়ার তিন চারদিন পূর্বে একই রণাঙ্গনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে করাচী থেকে মাদরাসার তালিব ইলমদের অপর একটি কাফেলা রেলযোগে রওয়ানা হয়েছিল। সেই কাফেলায় ৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধ আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ জনাব সাফদার আলী হাশেমী সাহেবও জিহাদের আবেগে আত্মহারা হয়ে অংশগ্রহণ করেন। এখন আমার বারবার তাঁর কথা স্মরণ হচ্ছিল। কারণ, তাঁরও ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে এবং তাঁর হাঁটু প্রায় অকেজো। আল্লাহই জানেন এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে তাঁর কি অবস্থা হয়েছে।

পাকিস্তান সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী

পর্বতচূড়ায় আরোহণকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপর একটি ছাউনীর কিছু অংশ এবং বাংকার দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের গৌরবময় এসব সৈন্য সুদূরবর্তী আকাশচুম্বী পর্বতশিখরে নাজানি কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করে পাকিস্তানী সীমান্ত রক্ষা করছেন। স্নেহময়ী মায়ের আদরের সন্তান, সোহাগিনী স্ত্রীর সোহাগের স্বামী এবং নিষ্পাপ সন্তানদের স্নেহশীল পিতা এখানকার নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন তুষারপূর্ণ ভয়ংকর রজনীতে পাহারা দিয়ে সমগ্র জাতির রাত্রীকালীন মিষ্টিমধুর নিদ্রার সুব্যবস্থা করছেন। আমাদের নগর ও জনপদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবন

চাঞ্চল্য তাদের কষ্টের বদৌলতেই প্রাণবন্ত রয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণই হয় একথার উপর—

نہیں تیرا نشیمن ' قصر سلطانی کے گنبد پر ،
تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں

'রাজপ্রাসাদের গম্বুজ চূড়ায় তোমার আবাস নয়, তুমি তো ঈগল,
পর্বতচূড়া তোমার বাসস্থান।'

মুসলিম দেশের সীমান্তকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে সেবা দান করা হয়, হাদীসের ভাষায় তাকে 'আররিবাত' বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ধৈর্যসংকুল এই সেবার বিশেষ মর্যাদা ও ফযীলত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এরশাদ করেছেন। বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম এই সেবাকে অন্যান্য কাজের উপর প্রাধান্য দিয়ে ইসলামী দেশের সীমান্তে অবস্থান করাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানকালে রেঞ্জার্স পুলিশ এবং সীমান্তে নিযুক্ত সেনাবাহিনী এ দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইসলামী দেশ রক্ষা করা তাদের নিয়ত হলে বেতন গ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা 'আররিবাতে'র মহান সওয়াবের অধিকারী হবেন। [১]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে—

رِبَاطُ يَوْمٍ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

অর্থ ঃ একদিনের 'রিবাত' তথা ইসলামী দেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালন করা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চেয়ে উত্তম।

(জিহাদ, পৃঃ ৩৭)

মুসলিম শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে—

رِبَاطُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامٍ وَ قِيَامِهِ، وَ اِنْ مَاتَ اُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ وَ اُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ اٰمِنَ

১. 'জিহাদ' পৃঃ ১৭, ৩৯ লেখক–হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ), মুফতীয়ে আযম, পাকিস্তান

الْفَتَّانَ-

অর্থ ঃ এক দিন এবং এক রাতের রিবাত অর্থাৎ ইসলামী দেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালন করা এক মাসব্যাপী দিনে রোযা রাখা এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যুবরণ করবে, সে ব্যক্তি যে সমস্ত নেক আমল করত, সে সমস্ত নেক আমল (কিয়ামত পর্যন্ত) অবিরাম তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অব্যাহতভাবে তাকে রিযিক প্রদান করা হবে এবং সে কবর আযাব হতে নিরাপদ থাকবে। (জিহাদ, পৃঃ ৩৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন—

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ، عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অর্থ ঃ দুটি চক্ষু এমন রয়েছে, যাকে অগ্নি স্পর্শ করবে না। এক সেই চক্ষু, যা আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। আর একটি সেই চক্ষু, যা আল্লাহর পথে পাহারারত থেকে রাত অতিবাহিত করেছে। (তিরমিযী শরীফ)

এক ঘন্টা সময় বিরামহীনভাবে পর্বত বেয়ে আরোহন করার পর তুষার আচ্ছাদিত পর্বত চূড়ায় পৌঁছি। সবাইকে শীতের কারণে সোয়েটার পরিধান করতে হয়। এখান থেকে কিছুদূর নীচে অবতরণ করলে 'বাগাড়' শহর। রাস্তায় বাস থেকে অবতরণ করে একটি ঝর্ণা থেকে পানি পান করা হয়। আসর নামাযের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কেউ কেউ উযুও করেন। পানি তো নয় যেন বরফ, কিন্তু তা এমনই পুলকোদ্দীপক যে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এখান থেকে কিছু দূর নীচে নামার পর 'বাগাড়' এর অঞ্চল শুরু হয়। এখানের পর্বতসারির মাঝে মুজাহিদদের বিভিন্ন সংগঠনের কয়েকটি ক্যাম্প দৃষ্টিগোচর হয়।

মুজাহিদদের সীমান্তবর্তী ক্যাম্পে

পাকিস্তানী মুজাহিদদের সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী'—যার ব্যবস্থাধীনে আমাদের এ সফর হচ্ছিল—এখানে তারও একটি ক্যাম্প রয়েছে। আমাদের দৃষ্টি সেই ক্যাম্পটিকে এদিক সেদিক তালাশ করে ফিরছিল, এমন সময় বাস পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে একটি ঝর্ণা অতিক্রম

করে পাহাড়ী ঢালের মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। সম্মুখের আবেগোদ্দীপক দৃশ্য দর্শন করে আমরা প্রায় আত্মহারা হয়ে যাই। ঢালের উপর তরুণ মুজাহিদদের দুরন্ত একটি বাহিনী ক্লাশিনকোভের মাধ্যমে আমাদেরকে সালাম জ্ঞাপনের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দ্বিমুখী সারির অগ্রভাগে আমাদের গাড়ীর সম্মুখে করাচীর সেই ৭০ বছরের বর্ষিয়ান মুরব্বী জনাব সাইয়েদ সফদার আলী হাশেমী সাহেব—একটু পূর্বে যাঁর কথা উল্লেখ করেছি—ক্লাশিনকোভ নিয়ে 'এটেনশন' দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কি পরিমাণ ক্লাশিনকোভের ফাঁকা গুলি যে এক সঙ্গে গর্জে উঠে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা পাগলপারা হয়ে বাস থেকে অবতরণ করে মুজাহিদদের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হই। ভালবাসার অশ্রু যেন বাঁধ মানছিল না। জনাব হাশেমী সাহেবের সঙ্গে আলিঙ্গনের সময় তো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি। এ অশ্রু যেমন ছিল আনন্দের তেমনি ছিল অনুতাপেরও। বেশীর ভাগ মুজাহিদ ছিল মাদরাসার তালিবে ইলম। তাঁরা করাচী থেকে দু' দিন পূর্বে এখানে এসে পৌঁছেছে। জানিনা কত আগে থেকে তাঁরা এখানে এসে আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন।

আমাদেরকে এখানে দেখতে পেয়ে তাঁদের আনন্দের সীমা ছিল না। ঢালের উপর অল্প কিছুক্ষণ আরোহণ করার পর সংগঠনের ক্যাম্প সামনে আসে। বিক্ষিপ্ত চারটি কাঁচা কক্ষ, দুই একটি কুঠরী এবং ছাপড়ার ছোট একটি বারান্দা নিয়ে এই ক্যাম্প। সম্মুখে উঁচু নীচু অনেক জমি। সম্পূর্ণ ক্যাম্পটির কোন বাউণ্ডারী নেই বরং তা সুউচ্চ পাহাড় সারি দ্বারা পরিবেষ্টিত। নিজেও সুউচ্চ পর্বতসারির উপর অবস্থিত। সম্মুখের পাহাড়ের উপরে বরফ জমে আছে। সেখান থেকে ভেসে আসা তুষার বায়ু তরবারীর মত ধারাল। মুজাহিদরা গরম পানি দ্বারা আমাদের উযুর ব্যবস্থা করেন। জামাআতের সাথে আছর নামায আদায় করে কফি পান করি। সঙ্গে নিয়ে আসা গরম কাপড়সমূহ পরিধান করে ক্যাম্পটি ঘুরে দেখার জন্য বের হই।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী

ক্যাম্পটি মূলত আফগানিস্তানের মুজাহিদ নেতা জনাব আরসালান খান রহমানী সাহেবের। যাঁকে আফগানিস্তানের প্রখ্যাত নেতা 'উস্তাদ আবদে রাব্বির রাসূল সাইয়াফ' এর সংগঠন 'ইত্তেহাদে ইসলামী

আফগানিস্তান' এর গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ মনে করা হয়। তিনি আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের কমাণ্ডার। এটি সেই সংগঠন, যার নায়েবে আমীর জনাব ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহকে আফগানিস্তানের সাত দলীয় ঐক্যজোট সর্বসম্মতিক্রমে আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে। মাওলানা আরসালান খান রহমানী কয়েক মাস পূর্বে মুজাহিদ নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে দারুল উলূম করাচীতে তাশরীফ এনেছিলেন। বয়স ৫৫ বছরের কাছাকাছি হবে। নিতান্ত বিনয়ী, সরল, স্বল্পভাষী ও স্নেহশীল বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। অন্তরে জিহাদের এমন জযবা রাখেন যে, রণাঙ্গন ছাড়া অন্যকিছুর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। পাকিস্তানে তাঁর যাতায়াত কম বিধায় পাকিস্তানে তাঁর খুব বেশী খ্যাতি নেই, তবে কমিউনিষ্ট সৈন্যরা তাঁকে খুব ভাল করেই চেনে। এমনকি তারা তাঁকে 'মানুষ খেকো' নাম দিয়েছে। কমিউনিষ্টদের তথাকথিত কাবুল সরকার তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে কয়েক লক্ষ আফগানী মুদ্রা পুরস্কার দেওয়ার কথা দীর্ঘদিন ধরে ঘোষণা করছে।

ہم سپاہی ، ہم سپہ گر ، ہم امیر
باعدو فولاد و بایاراں حریر

'তিনি একই সঙ্গে সৈনিক, সৈনিক তৈরীকারী আবার সেনানায়কও বটে। শত্রুদের সম্মুখে ইস্পাতের তরবারীসম কঠিন। আর বন্ধুদের জন্য রেশমের ন্যায় কোমল।'

হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর শহীদ মাওলানা ইরশাদ আহমাদ ১৯৮০ সনে যখন তাঁর দুই সাথীসহ আফগানিস্তান আসেন, তখন তাঁরা মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেবের সঙ্গেই মিলিত হন। মাওলানা সাহেব চরম বিপদজনক লড়াইসমূহে এই তিনজন জানবাজ মুজাহিদের চরম বীরত্ব ও যোগ্যতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরকে মনেপ্রাণে ভালবাসতে আরম্ভ করেন। স্বীয় পিতৃসুলভ স্নেহ ও পরিচর্যায় তাঁদেরকে প্রতিপালন করতে থাকেন। এভাবে 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী' সংগঠনটিও তাঁর সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি আফগানী সংগঠন ছিল না বিধায় বিভিন্ন দেশ থেকে আফগান মুজাহিদদের জন্য যেসব অস্ত্র ও রসদ সাহায্যরূপে আসত, সংগঠনটি সরাসরি তার অংশ পেত না। বরং সেখান থেকে যে অংশ মাওলানা

আরসালান রহমানী খান পেতেন, তাতে তিনি এ সংগঠনকেও শরীক করতেন। 'বাগাড়' পৌছার পরই বিষয়টি আমি প্রথম অবগত হই এবং তাঁদের নিঃসম্বল অবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করি। আলহামদুলিল্লাহ্, অস্ত্রের তো এখন অভাব নেই। তবে অন্যান্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে সংগঠনটি প্রায় শূন্য হাত। এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসার জরুরী সামানও তাদের নিকট নেই।

রাশিয়ান গাড়ীর সমাধিস্থল

মুজাহিদরা আমাদেরকে এই ক্যাম্পের অস্ত্রভাণ্ডার সবিস্তারে পরিদর্শন করান। বিভিন্ন প্রকার গোলা, রকেট ও মিসাইল এই প্রথমবার এত নিকট থেকে দেখার ও স্পর্শ করার সুযোগ লাভ করি। সম্মুখের উন্মুক্ত ভূমি—যা এই ক্যাম্পের জন্য বিরাট আঙ্গিনার কাজও দেয়, এটা মূলত ঐসব সামরিক গাড়ীর সমাধিস্থল, যেগুলো মুজাহিদরা রাশিয়ানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে এনেছে। অনেকগুলো রাশিয়ান ট্রাক, একটি সাঁজোয়া গাড়ী, একটি হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ, একটি ট্যাংকের তোপের মুখ এবং একটি অয়েল ট্যাংকার সেখানে পড়ে থাকতে দেখি।

ঈর্ষণীয় এখলাস ও বিনয়

এখানকার প্রত্যেকটি গাড়ীর সঙ্গে বীরত্ব ও উৎসর্গের ঈমান উদ্দীপক কাহিনী জড়িত রয়েছে। খুব খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করা হলে মুজাহিদরা সংক্ষেপে তা ব্যক্ত করেন বটে কিন্তু স্বেচ্ছায় তাঁরা কোন ঘটনা বলেন না। তাদের সে অবকাশও নেই এবং তার প্রতি কোন আগ্রহও নেই। তাঁদের অন্তর জুড়ে একটি মাত্র আকাংখা, তা এই যে, হয় আফগানিস্তান হতে কমিউনিষ্ট শাসনের বিলুপ্তি ঘটাবে অথবা শাহাদাত লাভে ধন্য হবে। সর্বোপরি আমি সাতদিনের এই সফরে সর্বত্রই উপলব্ধি করেছি যে, এঁরা ইচ্ছাপূর্বক নিজেদের কৃতিত্বের ঘটনা শুনানোকে এড়িয়ে যান। এমন অনেক মুজাহিদ আছেন—যাঁরা আফগানিস্তানের জিহাদে বহু বছর ধরে নিজের জীবনকে ওয়াকফ করে দিয়েছেন এবং বড় বড় লড়াইয়ে তাঁদের বিরাট বিরাট কৃতিত্বের কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে—আমি তাঁদের সেসব ঘটনা সরাসরি তাঁদের থেকে শোনার ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু তাঁরা হয় সুন্দরভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যান, কিংবা অন্য কোন সাথীর কৃতিত্বপূর্ণ

ঘটনা শুনিয়ে আলোচনা শেষ করে দেন।

তাঁদের সাথে কথা বলে আমি এর দুটি কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছি। প্রথমত, তাঁরা এসব ঘটনাকে নিজেদের কৃতিত্ব নয়, বরং আল্লাহর দান মনে করে থাকেন। বিধায় তাঁরা অহংকারের ফলে আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রদত্ত নুসরাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যান কিনা এ ভয়ে সর্বদা ভীত থাকেন। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের এই ভয় যে, আখেরাতে যে মহান ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজেদের প্রিয় জানকে বিপদের মুখে ঠেলে দেন, 'রিয়া'র কারণে সেই ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যান কিনা। বাস্তবিকই তাঁদের এ মহান গুণের কারণে তাঁদের জন্য প্রাণের নজরানা পেশ করতে ইচ্ছে হয়। এখলাস, লিল্লাহিয়াত, তাওয়াযু এবং তাওয়াক্কুলের এ মহান নে'আমত—যা দীর্ঘকাল খানকায় সাধনা করে এবং দীর্ঘকাল মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে থেকে লাভ হয়—আল্লাহ পাক এঁদেরকে জিহাদের ময়দানে মেহনত করার বদৌলতে পর্যাপ্ত পরিমাণ দান করেছেন। মুর্শিদ আরেফির ভাষায়—

نشاط کامران اس کا ' حیات جاوداں اس کی
جو دل لذت کش ذوق نگاہ یار ہوجائے

'সফলতার মত্ততা আর অমর জীবন সেই লাভ করতে পেরেছে, যার হৃদয় বন্ধুর নয়নের চাহনির স্বাদ আহরণ করতে পেরেছে।'

এখানে ট্যাংকের তোপের যে লম্বা মুখটি পড়েছিল, তা পাকিস্তানের তরুণ মুজাহিদ নাসরুল্লাহর বলে জানতে পারি। তিনি এ পর্যন্ত অসংখ্য রাশিয়ান ট্যাংক ধ্বংস করেছেন। মুজাহিদ সাথীরা তাঁকে 'ট্যাংক সংহারক' নাম দিয়েছে। একবার মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেব তাঁকে পুরস্কার দিতে চাইলেন, কিন্তু তখন তাঁর নিকট বিস্কুটের ছোট একটি প্যাকেট ছাড়া দেওয়ার মত অন্য কিছুই ছিল না। তখনকার মত তিনি তাই দিয়ে দেন। পরবর্তীতে যখন নাসরুল্লাহ অবাক–বিস্ময়কর ও কৃতিত্বপূর্ণ এ ঘটনা ঘটান যে, তিনি একাই ছয়টি রাশিয়ান হেলিকপ্টারের সঙ্গে মোকাবেলা করে একটি হেলিকপ্টারকে ধ্বংস করেন এবং কয়েকজন রাশিয়ানকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। তখন মাওলানা রহমানী সাহেব একটি বিধ্বস্ত রাশিয়ান ট্যাংক তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ দান করেন। এবং তিনি নাসরুল্লাহকে সেটি বিক্রি করে বিবাহের ব্যবস্থা করতে বলেন। তিনি

ট্যাংকের সমস্ত অংশ খুলে খুলে বিক্রি করেছেন। এখন তোপের মুখটি গ্রাহকের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। এ ঘটনার পর কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি এখনো বিবাহ করেননি। বর্তমানে তাঁর মনোযোগ পুরোটাই রণাঙ্গনের প্রতি নিবদ্ধ। নাসরুল্লাহর ছয়টি হেলিকপ্টারের সাথে লড়াইয়ের ঘটনা ইতিপূর্বে কোন এক জায়গায় সংক্ষেপে শুনেছিলাম। এবারও সংক্ষেপে শুনতে হলো। কারণ তিনি এখন রণাঙ্গনে রয়েছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর মুখ থেকে শোনার সুযোগ পরেরদিন রণাঙ্গনে গিয়ে হয়। সেখানেই তা আলোচনা করবো।

শত্রুর সেনা বহর

গাড়ীর এই সমাধিক্ষেত্রে যে অয়েল ট্যাংকারটি দাঁড়িয়েছিল, সেটি পঁচিশ বছর বয়সী আফগান মুজাহিদ 'মুহাম্মাদ আলী' অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে ছিনিয়ে এনেছেন। ঘটনার বিবরণ এই যে, আফগানিস্তানের আশি শতাংশ এলাকা—আলহামদুলিল্লাহ—মুজাহিদরা আযাদ করেছেন। অবশিষ্ট বিশ শতাংশ এলাকা—যার মধ্যে কাবুল সহ কয়েকটি বড় শহর এবং বহু সংখ্যক সেনা ছাউনী রয়েছে—কমিউনিষ্টদের দখলে রয়েছে। এসব শহরও মুজাহিদদের আক্রমণ হতে নিরাপদ নয়। তাদের ছাউনীসমূহ মুজাহিদদের আক্রমণের মুখে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। কারণ এসব ছাউনীতে রসদ পৌঁছানোর পথসমূহ মুজাহিদরা দখল করে নিয়েছেন। এ সমস্ত ছাউনীর অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম শেষ হওয়ার উপক্রম হলে রাশিয়ান সেনাবাহিনী তাদেরকে বিমান ও হেলিকপ্টার যোগে কিছু রসদ পৌঁছে দেয়। আর বেশীর ভাগ রসদ পৌঁছানোর জন্য সেনা কনভয় এসে থাকে। তার মধ্যে শত শত ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী, অয়েল ট্যাংকার ইত্যাদি সহ হাজার হাজার সৈন্য থাকে। তাদের নিরাপত্তার জন্য আকাশে জঙ্গী বিমান এবং হেলিকপ্টার টহল দিতে থাকে। এসমস্ত কনভয় যেই পরিমাণ সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাত্রা করে, তৎদৃষ্টে মনে হয় যে, তাদের বিশ্বাস মতে কনভয়সমূহ অপরাজেয় গণ্য হয়। কিন্তু ঈগল প্রকৃতির মুজাহিদদের মধ্যে কনভয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্র এমন আনন্দ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যেমনটি শিকার দেখলে শিকারীর মধ্যে সৃষ্টি হয়। সমস্ত সংগঠনের মুজাহিদগণ অতি দ্রুত কনভয়ের সম্ভাব্য গমনপথের পাহাড় ইত্যাদিতে অবস্থান গ্রহণ করে।

পাকিস্তানের স্বাধীন গোত্রের মুজাহিদরাও সেখানে পৌঁছে যায়। এবং কনভয়ের উপর ঈগলের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কনভয়কে পদে পদে মুজাহিদদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হয়। যা অনেক সময় কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং রক্তাক্ত লড়াইয়ে পরিণত হয়। ফলে দুশমনের বিমান, হেলিকপ্টার, ট্যাংক এবং সাঁজোয়া গাড়ী ইত্যাদি বিপুল সংখ্যায় ধ্বংস হয়ে যায়, অথবা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। শত শত শত্রু সৈন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। অল্প কিছু মুজাহিদও শাহাদাত লাভে ধন্য হন। দুশমনের বেঁচে যাওয়া গাড়ীসমূহ হয় ফিরে পালিয়ে যায়, অথবা বেঁচে যাওয়া রসদ ছাউনীতে পৌঁছে দিয়ে অনেক মাস পর্যন্ত ফেরার জন্য সুযোগের তালাশে থাকে।

আমাদের এ সফরের কিছুদিন পূর্বে এমনি একটি সেনা কনভয়—যা আমাদের শোনা মতে ১৮০০ ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী এবং সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল, খোস্তের ছাউনীতে রসদ পৌঁছানোর জন্য রওয়ানা হয়েছিল। হতভাগ্য এই কনভয়কেও দেড়মাস পর্যন্ত এমন রক্তাক্ত লড়াইয়ের মুখোমুখী হতে হয়, যার সংবাদ বিশ্বের পত্রপত্রিকায় এখনো গুঞ্জরিত হচ্ছে। ১৮০০ গাড়ীর মধ্য থেকে মাত্র ১০০ গাড়ী অতি কষ্টে ছাউনীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। অবশিষ্টগুলো হয় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে অথবা ফিরে পালিয়ে গিয়েছে।

এমনি একটি সেনা কনভয় পাকতিকা প্রদেশের নাম করা ছাউনী উরগুনের দিকে যাচ্ছিল কিংবা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করছিল। মুজাহিদরা সবদিক থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫ বছর বয়সী আফগান মুজাহিদ মুহাম্মাদ আলী এমন একটি পাহাড়ের উপর আরোহন করেন, যার পাদদেশ দিয়ে কনভয়টি মোড় নিয়ে সংকীর্ণ পথ দিয়ে এগিয়ে চলছিল। পাহাড়ের নিকটে পথটি ডানদিকে একটি এবং বামদিকে একটি মোড় নিয়েছে। রাশিয়ান গাড়ীর বহর বাম দিকে মোড় নিচ্ছিল। প্রত্যেক দুই গাড়ীর মাঝখানে দুশমনকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হচ্ছিল, যেন সব গাড়ী এক সঙ্গেই মুজাহিদদের আক্রমণের আওতায় চলে না আসে। মুহাম্মাদ আলী একটি অয়েল ট্যাংকারকে টার্গেট করে। ট্যাংকারটি তাঁর বরাবর নীচে এসে পৌঁছতেই সে তার উপর লাফিয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ড্রাইভারকে তাঁর পাশের সিট থেকে ক্লাসিনকোভ দেখিয়ে ডানদিকে মোড় নিতে বাধ্য করে। কাফেলার অন্যান্য গাড়ী

বামদিকে মোড় নিয়ে চলে যায়। আর সে অয়েল ট্যাংকার এবং তার ড্রাইভারকে নিয়ে নিজের ঠিকানায় ফিরে আসে।

কেন্দ্রে ঘুরতে ঘুরতে বিস্তারিতভাবে সব ঘটনা আমরা শুনছিলাম। ইতিমধ্যে মাগরিবের আযান আমাদের সম্মুখে পূর্ণ বাস্তবতা সহকারে মরহুম ইকবালের এই কবিতা তুলে ধরে—

ناگاہ فضا بانگ اذاں سے ہوئی لبریز
وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کہسار

'অকস্মাৎ আযানের সুর লহরীতে বায়ু তরঙ্গপূর্ণ হয়ে যায়। এমন সে আযান ধ্বনি, যার আঘাতে পর্বত–হৃদয় দুলে উঠে।'

নামাযের পর সবাই নিজ নিজ কক্ষে চলে যায়। সেখানকার কাঁচা কুঠুরীসমূহের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, সেগুলো গরমের দিনে ঠাণ্ডা থাকে, আর শীতের দিনে থাকে গরম। তারপরও শীত এত তীব্র ছিল যে, সবগুলো কামরার মাঝখানে পানি গরমকারী টাংকী রাখা ছিল। টাংকির নীচের জ্বলন্ত লাকড়ীর ধোঁয়া মোটা একটি পাইপ দিয়ে ছাদের উপর দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছিল। টাংকি থাকাবস্থায় মেঝেয় ছয়টি বিছানা লাগালাগি বিছানোর পর অতি কষ্টে যাতায়াতের জায়গা ছিল। দেয়ালে বসানো লম্বা একটি তক্তার উপর পূর্ব থেকে রাখা অন্যান্য সামানার সঙ্গে আমাদের ছয় মুসাফিরের সামানা রেখে দেওয়া হয়েছিল। দেওয়ালের মধ্যে দু' চারটি তাকও বসানো ছিল। সেগুলোতে ছোট ছোট জিনিসপত্র রাখা যেত।

দুই শহীদের পিতা

ডেরা ইসমাঈল খান থেকে যে তিনজন মুজাহিদ আমাদের কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত হন, তাঁদের মধ্যে ডেরা গাজী খান জেলার 'তুনসা শরীফের' প্রায় সত্তর বছরের বর্ষিয়ান আলেমে দ্বীন জনাব মাওলানা শমশের আলী জারোয়ার সাহেব ছিলেন অন্যতম। বাঁধভাঙ্গা উদ্দীপনা ও প্রবল উচ্ছ্বাস নিয়ে রণাঙ্গনে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, তিনি ইতিপূর্বেও এ রণাঙ্গনে এসেছেন। মুজাহিদ সাথীরা বললেন, তাঁর তিন সন্তানের মধ্য থেকে দুই সন্তান এই রণাঙ্গনেই এক বছরের ব্যবধানে শহীদ হয়েছেন। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ এবং বর্তমানে একমাত্র সন্তান জামিয়া

ফারুকিয়া করাচীতে অধ্যয়নরত আছেন। তিনিও প্রতি বছর ছুটির সময় নিয়মিতভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা সাহেব এখনো তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। করাচী থেকে আগত লোকদের নিকট অস্থির চিত্তে তার না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করছিলেন।

মেঝো ছেলে শহীদ নাঈমুল্লাহ সাজেদ (রহঃ) স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর মাত্র দেড় বছরে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণটা হিফয করেন। তারপর জামিয়া ফারুকিয়া করাচীতে রাবে'আ পর্যন্ত প্রতি বছর প্রথম স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হতে থাকেন। তিনি সিন্ধী, পশতু, সরাইকী, উর্দু ও ফার্সী ভাষা অবগত ছিলেন। ইতোমধ্যে আরবী শিক্ষাও লাভ করেন। ১৪০৫ হিজরীতে রাবে'আর বেফাকুল মাদারিস তথা মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় সমগ্র পাকিস্তানে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বেই ১৪০৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের ৬ তারিখে শারানার সেই রক্তাক্ত লড়াইয়ে স্বীয় আমীরের সঙ্গে শাহাদাত লাভের মহান সৌভাগ্য অর্জন করেন, যার বিস্তারিত আলোচনা পিছনে তুলে ধরা হয়েছে।

বড় ছেলে শহীদ মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ জারোয়ার কুরআনের হাফেয এবং দাওরা হাদীস পাশ আলেম ছিলেন। তিনি বি.এ, এল.এল.বি. এর পরীক্ষায়ও পাশ করেন। জিহাদের ময়দানে সশরীরে কয়েকবার অংশগ্রহণ করেন। হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর করাচীর অফিসেও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে খেদমত করতে থাকেন। এই সুবাদে আমার সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকবার সাক্ষাত হয়। তাঁর ছোট ভাই নাঈমুল্লাহ সাজেদ শহীদ হওয়ার আগের বছর তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ ঈসায়ীর জুলাই মাসের ১৪ তারিখে উরগুনের 'খরগোশ' নামক অঞ্চলের সন্নিকটে প্রচণ্ড এক লড়াই হয়। দু'টার সময় রণক্ষেত্র যখন চরম উত্তপ্ত, তখন মুজাহিদরা বিরতি দিয়ে দিয়ে ছোট ছোট জামাআতে যোহর নামায আদায় করেন। নামাযের পর দু' মিনিট সময়ও অতিবাহিত হয়নি এমন সময় দুশমনের গোলার আঘাতে একজন মুজাহিদ আহত হন। সাইফুল্লাহ খালিদ তাঁকে তুলে আনার জন্য বাংকারের বাইরে চলে আসেন। কিন্তু অপর একজন সাথী লাফিয়ে গিয়ে তাঁকে উঠিয়ে আনে। সাইফুল্লাহ খালিদ বাংকারের দিকে ফিরে আসার উপক্রম করতেই ট্যাংকের অপর একটি গোলা এসে তাঁর উপর পতিত হয়। ফলে তৎক্ষণাৎ

তিনি শহীদ হয়ে যান। পূর্ব পুরুষের আবাস তোনসা শরীফের বস্তি জিতওয়ালা গ্রামে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

একটি বিরল বিস্ময়কর ঘটনা

ঐ যুদ্ধের কমাণ্ডার খালিদ যুবাইর সাহেব ও অন্যান্য মুজাহিদগণ বর্ণনা করেন যে, অনতিবিলম্বে শহীদের লাশ কম্বলে জড়িয়ে রণাঙ্গনের পিছনের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শত্রুপক্ষ তাদের অনেকগুলো লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় সেই ক্যাম্প থেকে শহীদকে পাকিস্তান পৌঁছানোর জন্য একটি খচ্চরের ব্যবস্থা করা হয়। মুজাহিদ সাথীরা শহীদকে খচ্চরের উপর উঠানোর পূর্বে তাঁকে শেষবারের মত দেখার জন্য মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলে। সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল। কমাণ্ডার খালেদ যুবায়ের সাহেব বলেন, আমি তাঁর ললাট বেয়ে ফোটা ফোটা ঘাম প্রবাহিত হতে দেখতে পাই। ভাবলাম হয়ত কেউ আতর ঢেলে দিয়েছে। আমি আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে দেখি, আসলেই তা ঘাম ছিল। উপস্থিত সবাই এ বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

نامش از خورشید ومہ تابندہ تر
خاک قبرش از من و تو زندہ تر

'তাঁর নাম রবি–শশীর চেয়ে অধিকতর দীপ্তিমান, তাঁর কবরের মাটি আমার ও তোমার চেয়ে অধিকতর জীবন্ত।'

আফগানিস্তানের শহীদদের এ জাতীয় অসংখ্য বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা––যেগুলো তাঁদের সাথীরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে, তা 'তাওয়াতুরে'র পর্যায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এখানে যে কোন মুজাহিদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা এমনভাবে শুনাতে থাকেন, যেন তা প্রতিদিনের ব্যাপার। অনেক শহীদের খুন সুগন্ধি ছড়াতে থাকে, কারো বা কবর থেকে অনেক মাস যাবৎ ঘ্রাণ আসতে থাকে। এ বিষয়টি তো ব্যাপক প্রসিদ্ধ যে, একই স্থানে একই মৌসুমে রাশিয়ান ও কমিউনিষ্টদের লাশ তো একদিনেই পঁচতে আরম্ভ করে, কিন্তু কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও শহীদদের দেহে সামান্যতম পরিবর্তনও আসে না। পরে এক সময় কমাণ্ডার

যুবায়ের সাহেবও এ ধরনের অনেক ঘটনা আমার নিকট বর্ণনা করেন।

এ সম্পূর্ণ সফরে আমরা গেরিলা আক্রমণ ও রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর তথ্য অবগত হতে থাকি। এখনো কক্ষের ভিতরে এ আলোচনাই চলছিল। বাইরের জগত পুরোটাই গভীর অমানিশায় নিমজ্জিত। পর্বতরাজির তীব্র ও ধারালো তুষার বায়ুর শোঁ শোঁ শব্দ বাইরের মৌসুমের অবস্থা ব্যক্ত করছিল। এমন সময় অকস্মাৎ এমন কিছু লোক কক্ষে প্রবেশ করেন, যাঁদের মাথার কেশ ও পরিধেয় বস্ত্রের ধূলোবালি লণ্ঠনের আলোতে পরিস্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এঁরা হলেন টুবা ট্যাকসিংহের ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসার তরুণ পরিচালক জনাব মাওলানা আবদুর রহমান আব্বাসী ও তাঁর সাথীবৃন্দ। তাঁরা এই মাত্র রণাঙ্গন থেকে এখানে এসে পৌঁছলেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর জানতে পারলাম যে, এঁরাও এই প্রথমবার রণাঙ্গনে এসেছেন। প্রায় দশদিন কয়েকটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে আজ ফিরে এসেছেন। রাতে এখানে অবস্থান করে সকালে বাড়ীতে ফিরবেন। মাশাআল্লাহ, তাঁর চারজন ভাতিজা এখনো রণাঙ্গনে রয়েছেন। তাঁরা কয়েক বছর যাবত ছুটির সময়টি রণাঙ্গনে অতিবাহিত করেন। এশার আযান হবে। সংক্ষিপ্ত এ সময়ে আমি তাঁদের নিকট থেকে রণাঙ্গনে তাঁদের বৃত্তান্ত অবগত হতে থাকি। তিনি কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত কিছু হাদীস সম্পর্কে আমার সঙ্গে মতবিনিময় ও পরামর্শ করেন। এ বিষয়ে তিনি গবেষণামূলক কিছু কাজ করছেন। শত্রুপক্ষের একটি চৌকিতে এঁরা আজকেও তোপের আক্রমণ চালিয়েছেন। দুশমনের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক ধারণা তো এখনো পাওয়া যায়নি। তবে আক্রমণের পরপরই সেই চৌকি থেকে ধোঁয়া উঠতে এবং সেখান থেকে উরগুনের রাশিয়ান ছাউনীর দিকে দ্রুত এম্বুলেন্স গাড়ী যেতে এবং ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী আসতে দেখা গেছে। আমাদের মাত্র এই ক্ষতিটুকু হয়েছে যে, 'মাওলানা সাহেবের চশমার একটি ডাণ্ডা ভেঙ্গে গেছে।'

তোপযোগে কৃত আক্রমণে শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য সাথে সাথে অবগত হওয়া যায় না। বরং প্রতি দু' চারদিন পর দুশমনের যে সমস্ত আফগান মুসলমান সৈনিক সুযোগ পেয়ে মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয় ; তারা অথবা মুজাহিদদের গুপ্তচররা বিস্তারিত তথ্য অবহিত করে থাকে। মুজাহিদরা পরিপূর্ণ যাচাই করার পূর্বে দুশমনের

ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ জানানো পরিহার করে থাকে। দুশমনের সেনাবাহিনীতে অনেক মুসলমান সৈনিকও রয়েছে। তাদেরকে জোরজবরদস্তি এই লড়াইয়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তারাও বিভিন্ন মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ মুজাহিদদের নিকট প্রেরণ করতে থাকে।

রাশিয়ান গানশিপ হেলিকপ্টার

আফগানিস্তানের জিহাদ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে রাশিয়ান গানশিপ হেলিকপ্টারের আলোচনা পত্র-পত্রিকায় পাঠ করছিলাম এবং মুজাহিদদের কাছ থেকে শুনে আসছিলাম। এ সফরেও বারবার গানশিপ হেলিকপ্টারের আলোচনা শ্রবণ করতে থাকি। মুজাহিদদের এই কেন্দ্রে হেলিকপ্টারের যেই ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে, তাও গানশিপ হেলিকপ্টারেরই ধ্বংসাবশেষ। তবে এ সফরেই প্রথমবার জানতে পারি যে, এটি দুশমনের সর্বাধিক বিপদজনক হাতিয়ার, যা দ্বারা রাশিয়ানরা আফগানিস্তানের অসংখ্য জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। লক্ষ লক্ষ নিষ্পাপ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবকদের উপর নির্মমভাবে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।

এই হেলিকপ্টার অতি নীচে আবার খুব উঁচুতে উড়তে সক্ষম। উড়তে উড়তে আকাশেই দাঁড়িয়ে নীচের এবং আশেপাশের অবস্থা পরিপূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ করে বোমা ও রকেট বর্ষণ করতে এবং গুলির ঝড় সৃষ্টি করতে সক্ষম। এর মাটিতে অবতরণ করতে কোন মাঠ বা হেলিপ্যাডের প্রয়োজন হয় না। পাহাড়ের চূড়ায় এবং লকলকে ফসলভর্তি জমির মধ্যে আত্মগোপন করে সেখান থেকেই রকেট ও গুলি বর্ষণ করে। কখনো কখনো হেলিকপ্টারের মধ্য থেকে সশস্ত্র সৈন্য অবতরণ করে জনবসতি অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং নিষ্পাপ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর নানারকম লোমহর্ষক নির্যাতন চালায়। সমতল দুই পাহাড় সারির মধ্যবর্তী উঁচুনীচু খোলা জায়গা এবং পাহাড়ী খাদের মধ্যে একেবারে নীচ দিয়ে হেলিকপ্টার ঘুরাফেরা করতে থাকে। যাতে করে ডান-বামের পাহাড়ে এবং গিরিখাদে আত্মগোপনকারী মুজাহিদদেরকেও নিশানা বানাতে পারে। হেলিকপ্টারের মধ্যে বসানো আধুনিকতম ক্যামেরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র জিনিসের ফটো অনেক দূর থেকে ধারণ করতে পারে।

মোটকথা এই হেলিকপ্টার একই সাথে বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান,

ট্রান্সপোর্ট বিমান এবং গুপ্তচর বিমান। সর্বোপরি অনেক বড় উড়ন্ত ট্যাংক এবং সাঁজোয়া গাড়ীও বটে। এর ধ্বংসযজ্ঞের অসংখ্য রক্তাক্ত কাহিনী আফগানিস্তানের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। আফগানিস্তানের জনসাধারণ (মুজাহিদগণ নয়) এই হেলিকপ্টারের আলোচনা কিছুটা হতাশার সুরে করে থাকে। অনেকাংশে আফগান মুহাজিরদের সেই মজলুম ঢল, যারা পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, এরই ধ্বংসযজ্ঞের ফল।

কমিউনিষ্টদের পাশবিক নির্যাতন

এ সমস্ত হেলিকপ্টার দ্বারা কমিউনিষ্টরা আফগান মুসলমানদের উপর যেই পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে, তার অসংখ্য মর্মন্তুদ ঘটনা এখানকার শিশুদের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা—যা অনেকের মুখেই শুনেছি, বর্ণনা করছি—এই ঘটনা থেকে তাদের অমানবিক অপরাধ ও পাশবিক নির্যাতন সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যাবে।

একবার এক গ্রামের উপর ছয়টি হেলিকপ্টার আসে। কয়েকটি নীচে অবতরণ করে, বাকিগুলো উপরে টহল দিতে থাকে। অবতরণকারী কমিউনিষ্ট সৈন্যরা গ্রামের সকল নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে ক্লাশিনকোভের মুখে এক জায়গায় সমবেত করে (তরুণ যুবক সেই গ্রামে ছিল না, কারণ তারা হয় জিহাদে শহীদ হয়েছিল, অথবা জিহাদের ময়দানে লড়াইরত ছিল) হুকুম দেয় যে, তোমরা যে সব মুজাহিদকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে তাদেরকে আমাদের নিকট হস্তান্তর . গ্রামের লোকেরা কেঁদে কেঁদে শপথ করে বলে যে, কোন মুজাহিদ আমাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেনি। সৈন্যরা বলে, তোমরা আশেপাশের মুজাহিদদের নিকট খানাপিনার সরঞ্জাম পাঠিয়ে থাক। তোমাদেরকে অবশ্যই তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। একথা বলে নারীদের মাথা থেকে উড়না টেনে নামায়। তারা কান্নারত ছয়জন সুশ্রী যুবতীকে হেলিকপ্টারে টেনে-হিঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে উড়ে যায়।

কয়েক ঘন্টা পর সেই ছয়টি হেলিকপ্টার পুনরায় ফিরে এসে গ্রামের উপর অনেক উঁচুতে টহল দিতে থাকে। অকস্মাৎ গ্রামের লোকেরা দেখতে পায় যে, প্রত্যেকটি হেলিকপ্টার থেকে বড় ধরনের কোন একটা জিনিস নিচে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তখন ঘর থেকে বের হয়ে দেখার মত সাহস

কারো ছিল না। তাই হেলিকপ্টার ফিরে যেতেই তারা বের হয়ে যে দৃশ্য দেখতে পায় তাতে তাদের কলিজা ছিঁড়ে বের হবার উপক্রম হয়। এগুলো ছিল ধরে নিয়ে যাওয়া সেই নিষ্পাপ ছয়জন যুবতীর উলঙ্গ লাশ। তাদের কারো কারো দেহ তখনো প্রাণ নিঃসরণের অবস্থায় কাঁপছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারাও চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

'লোগার' এবং 'নগমানে'ও হুবহু একই রকম রক্তাক্ত ঘটনা ঘটানো হয়। এতটুকুমাত্র পার্থক্য ছিল যে, সেখান থেকে যেসব তরুণীকে টেনে–হেঁচড়ে হেলিকপ্টারে তুলে নেওয়া হয়, উপরে উঠে তাদের সেলোয়ারসমূহ নীচে গ্রামে ফেলে দেওয়া হয়। এখন তারা মরে গেছে নাকি বেঁচে আছে এ কথাও কেউ জানে না। সন্তানদের চিন্তায় তাদের পিতামাতাদেরই জীবন্ত কবরস্থ অবস্থা।

এ রকম এক–দুটি নয়, বরং অসংখ্য হৃদয়বিদারক নির্যাতনের ঘটনা রয়েছে, যা আফগানিস্তানের প্রত্যেক মর্যাদাশালী মুসলমানকে নির্ভীক সিংহে এবং কমিউনিষ্টদের জন্য আল্লাহর গজবে পরিণত করেছে।

تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج
موج مضطر کس طرح بنتی ہے' اب زنجیر دکھ

'তুমি সাগরের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ আস্ফালন দেখেছ। অপারগ আত্মার তরঙ্গ কিভাবে জন্ম নেয়, হে শিকল তাও দেখে নাও।'

আফগানিস্তানের জিহাদের সূচনা যেভাবে হয়

রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরে আফগানিস্তানের উপর স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। তারা এজন্য আফগানিস্তানের সাবেক বাদশাহ জহির শাহকে ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু জহির শাহ যখন তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' ঘটায়, তখন এখানকার মুসলমানগণ সজাগ হয়ে যান। এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার বিপ্লবের নামে এখান থেকে ইসলামী নিদর্শন, মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় শক্তিসমূহকে বিলুপ্ত করে কমিউনিজমের জন্য পথ সুগম করা। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে ইসলামী পর্দার বিরুদ্ধে সরকারী পর্যায়ে সুসংহত অপতৎপরতা ছিল অন্যতম। একটি জাতীয় সম্মেলনে একজন মুসলিম নারীর চাদরকে

পদদলিত করে ঘোষণা করা হয় যে, 'এখন থেকে চিরদিনের তরে অন্ধকারকে বিলুপ্ত করা হল।'

কান্দাহারবাসী তাদের এসব ঘৃণ্য পদক্ষেপসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়লে জহির শাহ খান মুহাম্মাদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে সেখানকার শত শত মুসলমানকে হত্যা করে। সে তার শিকড়কে মজবুত এবং বিপ্লবকে শক্তিশালী করার জন্য স্বীয় ভগ্নিপতি ও চাচাত ভাই মুহাম্মাদ দাউদ খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এবং কমিউনিজমের হোতাদের সাথে ছিল দাউদ খানের গভীর সম্পর্ক। সে দশ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকে। আফগানিস্তানের কমিউনিষ্ট লিডার নূর মুহাম্মাদ তারাকায়ী, বাবরক কারমাল এবং 'হাফিজুল্লাহ আমীন তারই ছায়াতলে বেড়ে ওঠে।

জহির শাহের শিক্ষণীয় পরিণতি

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে ধর্মহীনতা ও কমিউনিজমের যে আন্দোলন চালানো হয়েছিল, তার মোকাবিলায় আত্মমর্যাদাশীল ও দূরদর্শী মুসলমানদের কয়েকটি সংগঠন নিজ নিজ কর্মপন্থায় কাজ করতে আরম্ভ করে। উলামায়ে কেরাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'খুদ্দামুল ফুরকান' সংগঠনটিও তাদের অগ্রভাগে ছিল। মাওলানা শায়েখ ইসমাইল মুজাদ্দেদী ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। মাওলানা আরসালান খান রহমানী—পূর্বে যার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে—এতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এটি প্রায় ১৯৬৯ ঈসায়ীর ঘটনা। তারা 'নেদায়ে হক' নামে একটি অরগুন চালু করেন। ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে তাঁরা চিন্তা ও আদর্শের ক্ষেত্রে শক্তভাবে আন্দোলন চালিয়ে যান। সাথে সাথে প্রতিবাদ-মিছিল, বিক্ষোভ এবং কনফারেন্সের অব্যাহত ধারা চালু করে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন। এজন্য তাঁদের অনেককে কারাবরণ করতে হয়।

এতদ্ব্যতীত প্রফেসর গোলাম মুহাম্মাদ নিয়াজী 'ইসলামী জামা'আত' গঠন করেন। ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা 'নওজোয়ানানে ইসলাম' (ইসলামী তরুণ সংঘ) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই সংগঠনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আবদুর রহমান নিয়াজী ছিলেন শীর্ষ তালিকায়। আবদে রাব্বির রাসূল সাইয়াফ এবং বুরহানউদ্দিন রব্বানী সংগঠনের

পৃষ্ঠপোষক উস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৯৭২ ঈসায়ীতে রাশিয়া যখন জহির শাহকে ধর্মীয় শক্তিসমূহ পিষিয়ে ফেলতে ব্যর্থ হতে দেখে, তখন তাকে গদিচ্যুত করে মুহাম্মাদ দাউদ খানকে গণতন্ত্রী আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দেয়। জহির শাহ রাশিয়ার নিকট বিশ্বস্ত হতে গিয়ে দেশ ও ধর্মের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আল্লাহ তাআলা সেই রাশিয়ার হাতেই তার শাস্তি প্রদান করেন। সে বর্তমানে রোমে দেশান্তরের জীবন যাপন করছে।

দাউদ খানের হাতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা এ উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল যে, সে অধিক বিশ্বস্ত প্রমাণিত হবে এবং কঠোর হাতে ইসলামী শক্তিসমূহকে তার শিকড় থেকে উপড়ে ফেলবে। কেননা রাশিয়া তার 'রাজনৈতিক পোষ্যদের' মাধ্যমে এখানে যে বিষয়ে কাজ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তার প্রথম পর্বই ছিল এই—

افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج
ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو

'আফগানীদের ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধের একমাত্র চিকিৎসা এই যে, সে দেশের পাহাড় ও উপত্যকা থেকে আলেমদের কর্তৃত্বকে বিলুপ্ত করে দাও।'

দাউদের শাসনকালে রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে কমিউনিষ্টদের বসানো হয়। 'খুদ্দামুল ফুরকান'-এর নেতা ও কর্মীদেরকে বন্দী করা হয়। প্রফেসর গোলাম মুহাম্মাদ নিয়াজী এবং উস্তাদ আবদে রাব্বির রাসূল সাইয়াফকেও কারা প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়।

কিন্তু প্রতিবাদ আন্দোলনও তীব্রতর হতে থাকে। ইঞ্জিনিয়ার গুলবদীন হিকমতইয়ার এবং প্রফেসর বুরহানউদ্দীন রব্বানী কয়েকজন যুবক সহকারে পাকিস্তান (পেশোয়ার) আসেন। তাঁরা স্বাধীন গোত্র শাসিত অঞ্চল থেকে দেশীয় হাত বোমা এবং পিস্তল ক্রয় করে আফগানিস্তানের সরকারী কেন্দ্রসমূহে এবং পুলিশের চৌকিসমূহে আক্রমণ শুরু করেন। অপরদিকে দাউদের সরকার অধিকাংশ আফগান নেতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে, মৌলভী হাবিবুর রহমান সহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তির ঘোষণা করে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনকে—যা প্রকৃত জাগৃতির ফসল ছিল—দমন করা সম্ভব হয় না, বরং উত্তরোত্তর তার শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এহেন পরিস্থিতি

রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী লালসা বরদাস্ত করতে পারে কি? কারণ—

صیاد و باغبان کی یہ کوشش ہے عارفی
گلشن میں میں رہوں ' نہ میرا آشیاں رہے

'শিকারী এবং মালি চায় যে, আমি যেন বাগানে না থাকি এবং বাগানে আমার আবাসও না থাকে।

দাউদ খানের করুণ পরিণতি

সুতরাং ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৮ ঈসায়ীতে রাশিয়ার ইঙ্গিতে কমিউনিষ্ট খাল্‌ক পার্টির নেতা নূর মুহাম্মাদ তারাকায়ী প্রেসিডেন্ট দাউদ খানকে হত্যা করে লাল কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটিয়ে আফগানিস্তানে কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে দাউদ খানও দেশ ও ধর্মের সঙ্গে গাদ্দারী করার শাস্তি পেয়ে যায় এবং জহির শাহের মত তার উপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শাশ্বত বাণী প্রতিফলিত হয়—

مَنِ الْتَمَسَ رَضِيَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَي النَّاسِ -

'যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলা তাকে ঐসব লোকের হাতেই ন্যস্ত করেন।'

কুফরী শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সারাদেশে জিহাদের শক্তিশালী তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠে।

জিহাদের ঘোষণা

লাল বিপ্লবের মাত্র দশদিন পর সর্বপ্রথম মাওলানা আবদুল গনী ছাহেব 'দারে শাহীল' থেকে জিহাদ ঘোষণা করেন। তারপর সমগ্র দেশের মুফতী সাহেবগণ সর্বসম্মতভাবে জিহাদের ফতোয়া প্রদান করেন। মাওলানা আরসালান খান রহমানী ফতোয়া পাওয়ার সাথে সাথে 'খুদ্দামুল ফুরকান' সংগঠনের আলেমদেরকে সঙ্গে নিয়ে গেরিলা তৎপরতা আরম্ভ করেন। ক্রমেই তাতে সাধারণ জনগণও শামিল হতে থাকে। তারা সর্বপ্রথম সেসব সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করতে আরম্ভ করেন, যেগুলোতে মুসলমান ছাত্রদেরকে কমিউনিষ্ট বানিয়ে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতো। ফলে আলেমদেরকে বন্দী করা

হয়। মাওলানা আরসালান খান রহমানীকেও উরগুন থেকে তিনবার বন্দী করা হয়। তাঁকে তৃতীয়বার যখন বন্দী করে উরগুন কারাগারে আটক করা হয়, তখন তিনি সে রাতেই পালিয়ে চলে আসেন। দ্বীনী মাদরাসাসমূহ বন্ধ হতে থাকে। তারপরও যেসব মাদরাসা খোলা ছিল সরকার সেগুলোর উপর বুলডোজার চালিয়ে সেগুলো ধ্বংস করে দেয়। মাওলানা আরসালান খান রহমানী এবং তাঁর সাথীরা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যেতেন এবং কমিউনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করে জনসাধারণকে বুঝাতেন যে, এ সরকার কাফের। সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়। দেখতে দেখতে নূরস্থান, সামাংগান, হেরাত, বদখশান এবং পাঞ্জশিরের আলেম এবং জনসাধারণও জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারাকায়ীর সরকার পবিত্র এ জিহাদকে নিষ্পেষিত করার জন্য পরিপূর্ণ সামরিক শক্তি মাঠে নামায়। মুজাহিদদের উপর নাপাম বোমা বর্ষণ করে। বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে। ১৫ই মার্চ ১৯৭৯ ঈসায়ীতে হিরাতে প্রায় বিশ হাজার মুসলমানকে শহীদ করে। কিন্তু মুসলমানদের জিহাদী জযবা এ সমস্ত রক্তাক্ত ঘটনার কারণে আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে।

”کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا“

'শত সহস্র নক্ষত্রের রক্তিম খুনেই প্রভাতের আগমন ঘটে'।

তারা প্রাণ বাজি রেখে পরপর অনেকগুলো লড়াইয়ে সফলতা লাভ করেন। মাওলানা আরসালান খান রহমানী এবং তাঁর নিঃসম্বল মুজাহিদ সাথীরা পাকতিকা প্রদেশের উরগুন, শারানা এবং খায়ের কোর্ট বাদে সমস্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করেন। অন্যান্য এলাকাতেও নিঃসম্বল মুজাহিদদের বিজয় লাভ হতে আরম্ভ করে। তাঁরা ট্যাংকসমূহকে ধ্বংস করে দেন। বিমানের পরোয়া না করে তাঁরা নিজেদের তৎপরতাকে কাবুলের দেরাগোড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন।

তারাকায়ীর পরিণতি

মুজাহিদদের একটি বড় সফলতা এই লাভ হয় যে, সরকারী সেনাবাহিনীর বিরাট একটি অংশ মুজাহিদদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। শুধুমাত্র যেসব সৈন্য কমিউনিষ্ট হয়েছে, কিংবা দুর্বল ঈমানের মুসলমান

তারাই সেনাবাহিনীতে থেকে যায়। এখনো সৈন্যরা সুযোগ পেলেই মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়। ৯৮% জনগণ মুজাহিদদের সঙ্গে রয়েছে। তারা মুজাহিদদের খানাপিনার এবং আত্মগোপনের ব্যবস্থা করে থাকে। অবশিষ্ট মাত্র ২% কমিউনিষ্ট রয়েছে, যারা খাল্‌ক পার্টি কিংবা পারচাম পার্টির সঙ্গে জড়িত। এই পার্টিদ্বয় কট্টর কমিউনিষ্টদের সমন্বয়ে গঠিত। সেনাবাহিনীর অবস্থা এমন করুণ যে, তারা ট্যাংক এবং সাঁজোয়া গাড়ী থেকে বাইরে বের হয় না। তাদের পানাহার ও বসবাস সবই ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ীর মধ্যে।

রাশিয়া তারাকায়ী সরকারকে নিঃসম্বল ও জীর্ণশীর্ণ মুজাহিদদের হাতে এভাবে চরম অসহায় হতে দেখে তাদের চতুর্থ পোষ্য হাফিজুল্লাহ আমিনকে সম্মুখে অগ্রসর করে। সে তারাকায়ীকে হত্যা করে প্রেসিডেন্টের গদি দখল করে নেয়। সেও খাল্‌ক পার্টির সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

হাফিজুল্লাহ আমিনের পরিণতি এবং রুশ বাহিনীর আগ্রাসন

এ ঘটনার মাত্র তিন মাস পর তাকেও ব্যর্থ হতে দেখে রাশিয়া পুরোপুরি উপলব্ধি করে যে, এভাবে চলতে থাকলে আফগানিস্তান তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। বিধায়, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ ঈসায়ীতে রাশিয়া সব রকম রাখঢাক লজ্জা-শরম জলাঞ্জলী দিয়ে তার পঙ্গপালের ন্যায় সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তানে ঢুকিয়ে দেয়। হাফিজুল্লাহ আমিনের স্থলে তার পঞ্চম পোষ্য বাবরাক কারমালকে আফগানিস্তানের পুতুল সরকার নিযুক্ত করে। সে ছিল আফগানিস্তানের কমিউনিষ্টদের পারচাম পার্টির নেতা। সে তারাকায়ীর শাসনকাল থেকে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট দেশ চেকোশ্লাভাকিয়ার রাজধানী 'প্রাগো'তে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে জীবনযাপন করছিল।

রাশিয়া আফগানিস্তানে তার সেনাবাহিনী প্রবেশ করানোর জন্য এই বাহানা খাড়া করে যে, কাবুল সরকার আমাদের নিকট বহিঃশক্তির (মুজাহিদদের) আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সাহায্য তলব করেছে। আমরা আমাদের বন্ধু (কাবুল সরকার)এর সাহায্য করতে এসেছি। [১]

১. অথচ ঘটনাটি এভাবে ঘটে যে, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ ঈসায়ীতে রাশিয়ান সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করেই হাফিজুল্লাহ আমিনের ভবনকে মিসমার

তাদের ধারণা ছিল যে, চেকোশ্লাভাকিয়া এবং অন্যান্য দেশের মত আফগানিস্তানকেও সুস্বাদু গ্রাসের মত হজম করা যাবে। তারপর পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত এবং সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যের তেল ভাণ্ডার পর্যন্ত তাদের অগ্রাভিযান সম্ভব হবে। কিন্তু রাশিয়ান সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার প্রতিটি বস্তি এবং গ্রাম জিহাদের পতাকা উড়িয়ে দেয়। তারা নিতান্ত নিঃসম্বল হওয়া সত্ত্বেও বিজয় বা শাহাদাত লাভ করা পর্যন্ত জান বাজি রেখে জিহাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং রাশিয়ান কমিউনিষ্টরা অল্প কিছুদিনের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরই উপলব্ধি করে যে, তারা আফগানিস্তানকে চেকোশ্লাভাকিয়া এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের উপর অনুমান করে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করে বসেছে। তারা এমন এক জাতিকে যুদ্ধের আহবান জানিয়েছে, যার অতীত দাসত্বের কালিমা থেকে পবিত্র, যাদের অভিধান পরাধীনতার শব্দ থেকে মুক্ত।

বাবরাক কারমালের পরিণতি এবং নজিবুল্লাহ

বাবরাক কারমাল যখন কয়েক বছর পর্যন্ত রুশ বাহিনীর প্রবল শক্তি এবং আধুনিক সমরাস্ত্র দ্বারাও জিহাদকে প্রতিহত করতে সক্ষম হলো না, তখন রাশিয়া তাকেও বরখাস্ত করে তাদের ষণ্ঠ পোষ্য নজিবুল্লাহকে গদিতে বসিয়ে দেয়। নজিবুল্লাহ এখন কাবুলের পতনোন্মুখ প্রেসিডেন্টের আসনে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করছে।

করে ফেলে এবং সেই তারিখেই তাসখন্দের রাশিয়ান রেডিও সংবাদ প্রচার করে যে, বাবরাক কারমাল হাফিজুল্লাহ আমিনকে সিংহাসনচ্যুত করে আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েছে। অথচ বাবরাক কারমাল তখন পর্যন্ত প্রাগো (চেকোশ্লাভাকিয়া)এ অবস্থান করছিল। সে ছয়দিন পর ঐ সময় আফগানিস্তান পৌঁছে, যখন রুশ বাহিনী কাবুলে হাফিজুল্লাহ আমিনকে খতম করে দিয়েছে। বিস্তারিত এ আলোচনা দ্বারা প্রকৃত তথ্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাবুলের গদি হাফিজুল্লাহ আমিনকে হটিয়ে প্রথমে রাশিয়ান সেনাবাহিনী দখল করে নেয়। তারপর হাতিয়ার হিসাবে বাবরাক কারমালকে ডেকে এনে প্রেসিডেন্টের আসনে বসিয়ে দেয়। (বিস্তারিত জানান জন্য ডঃ মুহাম্মাদ আলী আলবার কৃত আরবী পুস্তক 'আফগানিস্তান মিনাল ফাতহিল ইসলামী ইলাল গাজবীর রুসী' পৃষ্ঠা ২৩৮–৩৯ দ্রষ্টব্য)।

ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی
خراب کر گئی شاہیں بچے کو صحبت زاغ

'কাকের মধ্যে ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণের উচ্চ সাহস জন্মায়নি। সর্বোপরি কাকের কুসংসর্গে থেকে ঈগল ছানারও সহজাত স্বভাব বিনষ্ট হয়েছে।'

তার মুমূর্ষু অবস্থার নামেমাত্র কর্তৃত্ব এখন শুধুমাত্র বড় বড় শহর এবং ছাউনীসমূহের উপরই রয়েছে। এবং সেগুলোও মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনি এবং তোপের বজ্রনাদে সর্বদা প্রকম্পিত হচ্ছে এবং সমগ্র দেশে এখন মুজাহিদদের সেই আযান ঘোষিত হচ্ছে, যার সম্পর্কে প্রাচ্যের কবি ইকবাল বলেছেন—

آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں
کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت و سیار

'এই আযানের বুকে এমন বিদ্যুত রয়েছে, যার মধ্যে মহাকাশের স্থীর ও গতিশীল সবকিছু হারিয়ে যায়।'

মুজাহিদদের অস্ত্র-শস্ত্র

প্রথমদিকে মুজাহিদদের নিকট শুধুমাত্র ঐসব বন্দুক ছিল, যেগুলো সচরাচর আফগান পরিবারসমূহে ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাও আবার সবার নিকট ছিল না। মুজাহিদরা পেট্রোল এবং সাবানের গুড়ো বোতলে ভরে অগ্নিবোমা তৈরী করত। তাঁরা রাশিয়ান গাড়ী এবং ট্যাংকের একেবারে নিকটে গিয়ে সেগুলো দিয়ে আক্রমণ করত। ফলে ট্যাংকে আগুন জ্বলে উঠত। কখনো বা হামলাকারী মুজাহিদই শহীদ হয়ে যেত। শহীদ মাওলানা ইরশাদ আহমাদ (রহঃ)—যাঁর সংগঠনের সীমান্তবর্তী ক্যাম্পে আমরা এসব তথ্য সংগ্রহ করছিলাম—তিনি এবং তাঁর দুই পাকিস্তানী সঙ্গী প্রায় এক বছর পর্যন্ত কোন বন্দুক জোগাড় করতে সক্ষম হননি। এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই যুবকত্রয় ক্যাম্পের অন্যান্য খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। অবশেষে ১৯৮০ ঈসায়ীর শেষ দিকে টোবাট্যাক সিংহের জনাব হাজী রশীদ আহমাদ সাহেব ৩৫০০ টাকায় দোররা আদম খেলের তৈরী একটি বন্দুক (৭ এম.এম) ক্রয় করে মাওলানা এরশাদ সাহেবকে প্রদান করেন। বন্দুক পেয়ে তাঁদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। তারপর অনতিবিলম্বে তাঁরা অন্য অন্য মুজাহিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি রাশিয়ান সেনা চৌকি আক্রমণ

করেন এবং সেখান থেকে তাঁদের হাতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এসে যায়।

জিহাদ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পর থেকে মুসলিম দেশসমূহের সহৃদয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে ক্রমান্বয়ে আর্থিক সাহায্য আসতে আরম্ভ করলে মুজাহিদরা পাকিস্তানের আযাদ কাবায়েলী এলাকা থেকে দেশী অস্ত্র, রাইফেল ইত্যাদি ক্রয় করে ব্যবহার করতে থাকেন। অপরদিকে রাশিয়ান সেনা কাফেলা এবং সেনা চৌকিসমূহে অতি বীরত্বের সঙ্গে এবং বিস্ময়করভাবে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে আনতে আরম্ভ করেন। অস্ত্র সংগ্রহের এ পথটি সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক প্রভাবশালী এবং সর্বোচ্চ সফলতা বলে প্রমাণিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ, এখন মুজাহিদদের ক্যাম্পসমূহ সর্বপ্রকার রাশিয়ান অস্ত্রেশস্ত্রে পরিপূর্ণ। তাঁরা শত্রু থেকে ছিনিয়ে আনা হাতবোমা, ক্লাশিনকোভ, রকেট লাঞ্চার এবং বিভিন্ন প্রকারের তোপ দ্বারা তাদেরই ট্যাঙ্ক এবং হেলিকপ্টারসমূহ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।

মুজাহিদদের আসল হাতিয়ার

সত্য কথা এই যে, মুজাহিদদের সর্ববৃহৎ হাতিয়ার এখলাস, সবর এবং তাওয়াক্কুল। যা ইসলামের ১৪০০ বছরের ইতিহাসে দুশমনের জন্য সর্বদা অপরাজেয় প্রমাণিত হয়েছে এবং এখনো রাশিয়ার ন্যায় পরাশক্তির জন্য অপরাজেয় প্রমাণিত হচ্ছে। মুজাহিদদের এই এখলাস, সবর এবং তাওয়াক্কুলই নিত্য নতুন সফলতা ও বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করছে। বাহ্যিক সাজসরঞ্জাম এবং অস্ত্র লাভ করাও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এখলাস, সবর এবং তাওয়াক্কুলেরই প্রতিফল। এ জিহাদ তাঁরা নিখাদ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করে আরম্ভ করেছিলেন। এতে হক্কানী উলামায়ে কেরাম এবং মাদরাসার তালিবে ইলমগণও অগ্রে ভাগে রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেক রণাঙ্গনে নিজেদের সাথীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করে যাচ্ছেন। অসংখ্য আলেম এবং তালিবে ইলম শাহাদাত মদীরা পান করছেন।

فَمِنۡهُم مَّن قَضٰى نَحۡبَهٗ وَمِنۡهُم مَّن يَّنۡتَظِرُ

অর্থ ঃ তাদের মধ্যে কেউ কেউ (আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ প্রতীক্ষায় আছে। (সূরা আল আহযাব ২৩)

আল্লাহ তাআলার গায়েবী সাহায্য

লড়াইয়ের ময়দানে সহায় সম্বলহীন মুজাহিদগণ যেই অবাক বিস্ময়কর সফলতা লাভ করছেন, তা দেখে মানব বুদ্ধি হতবাক ও বিমূঢ় হয়ে যায়। এসব ঘটনার একমাত্র এই ব্যাখ্যাই প্রদান করা সম্ভব যে, মহান আল্লাহই এই জিহাদকে স্বীয় কুদরতী হাতে পরিচালনা করছেন; তাঁরই সদাজাগ্রত দৃষ্টি তাঁর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। রাশিয়ান হেলিকপ্টারের আক্রমণ করার পূর্বে মুজাহিদদেরকে পাখির ঝাঁক তা অবগত করে দেওয়া, শুধুমাত্র দুআর বদৌলতে ট্যাংক ধ্বংস হওয়া, রণাঙ্গনে একদম অপরিচিত লোকদের মুজাহিদদের পক্ষে লড়াই করা এবং যুদ্ধশেষে তাদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এসব ঘটনা এবং এ জাতীয় আরও অসংখ্য বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা মুজাহিদদের ঈমান ও একীনকেই শুধু অপরাজেয় করেনি, বরং এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এ পর্যন্ত ইউরোপের বেশ কয়েকজন অমুসলিম—যারা এখানে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছিলেন—ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন।

ইটালীর একজন সাংবাদিক এবং ফ্রান্সের ডঃ মালসুন আফগানিস্তানে মুজাহিদদের সম্মুখে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দান করেন। ফ্রান্সের মহিলা ডাক্তার এফলেন ঘোটে প্রখ্যাত আরব মুজাহিদ ডঃ আবদুল্লাহ আযযাম (রহঃ)এর সম্মুখে ইসলাম গ্রহণ করেন। ডঃ আবদুল্লাহ আযযাম (রহঃ) যিনি অনেক বছর ধরে আফগানিস্তানের জিহাদে স্বীয় জীবন ওয়াকফ করে দিয়ে দুশমনের সাথে অব্যাহত লড়াই করে চলছেন—স্বীয় আরবী গ্রন্থ 'আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান'-এ এখানকার বিভিন্ন রণাঙ্গনের আল্লাহ তাআলার গায়েবী নুসরতের অসংখ্য বিরল বিস্ময়কর এবং ঈমানদীপ্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সে গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। এসব ঘটনা সাক্ষ্য দিচ্ছে—

هفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ وتفنگ

تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساماں بھی ہے

'তরবারী ও তোপ ছাড়াই যে শক্তির বলে সপ্তদেশ পদানত হয়ে যায়, তুমি যদি বুঝতে তাহলে সে শক্তি তোমার নিকটও রয়েছে।'

দুশমনের ক্ষয়ক্ষতি

নয় বছর ধরে সমগ্র আফগানব্যাপী জিহাদ অব্যাহত রয়েছে। এ নয় বৎসরে সময়ের দুশমনের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও পরিমাপ তো এখন আমার নিকট নেই। শুধুমাত্র তিন বছরের (১৯৮৩–৮৫) দুশমনের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এখানে পেশ করছি। এ হিসাব ডঃ আবদুল্লাহ আযযাম প্রণীত আরবী গ্রন্থ 'ইবারুন ওয়া বাছাইরু লিল জিহাদ'–এ উল্লেখ করেছেন। তার সারাংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

এই তিন বছরে মুজাহিদগণ দুশমনের নিম্নোক্ত অস্ত্র ও সামরিক যান ধ্বংস করেছে—

১. বিমান ও হেলিকপ্টার	৮০০টি
২. ট্যাংক	৪০৪৬টি
৩. সামরিক যান	৭০৫২টি
৪. ভারী অস্ত্র	৩৮৭টি

এই তিন বছরে যেসব অস্ত্র এবং সামরিক যান অক্ষত অবস্থায় মুজাহিদরা দুশমনের নিকট থেকে ছিনিয়ে এনেছে তার সংখ্যা—

১. ট্যাংক	৮৭টি
২. সামরিক যান	৬০৯টি
৩. ভারী অস্ত্র	৮০৭টি
৪. হালকা অস্ত্র	১৭,৪৮০টি

এই তিন বছরে শত্রুপক্ষের লোকবলের ক্ষয়ক্ষতির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ—

১. মুজাহিদদের হাতে নিহত	৮৩,৩৬৫ জন
(তার মধ্যে অফিসারের সংখ্যা ৩৮৬৮ জন)	
২. মুজাহিদদের হাতে আহত	৪৪,৮৪৪ জন
(তার মধ্যে অফিসারের সংখ্যা ৩০০০ জন)	
৩. মুজাহিদদের হাতে বন্দী	৯৫৮০ জন
(তার মধ্যে অফিসারের সংখ্যা ৩৫১ জন)	

এতদ্ব্যতীত আফগান সেনাবাহিনী এবং মিলিশিয়ার যেসব মুসলমান এ তিন বছরে সুযোগ পেয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে তাদের সংখ্যা ১৬০৪৮ জন, তার মধ্যে ৪৭৭ জন সেনা অফিসার রয়েছে।

এগুলো নয় বছরের মধ্য থেকে মাত্র তিন বছরের পরিমাণ। বাকী ছয়

বছরে দুশমনের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এ থেকে কিছুটা হলেও অনুমান করা যেতে পারে।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষী সত্তা—যিনি একটি মশা দ্বারা নমরুদের গর্ব-অহংকার ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন—সে মহান সত্তাই এখন রাশিয়ার ন্যায় অহংকারী শক্তিকে ইসলামের মুজাহিদদের হাতে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করাচ্ছেন।

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا؟
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

'মর্দে মুমিনের বাহুশক্তির অনুমান কি কেউ করতে পারে? যার দৃষ্টিতে ভাগ্যের লিখনও পরিবর্তিত হয়ে যায়।'

তথাকথিত আমেরিকান সাহায্য

ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য রাশিয়া যেমন বিপদজনক শত্রু, আমেরিকা তার চেয়ে কম বিপদজনক নয়। এই আমেরিকাই তো ফিলিস্তিন, কাশ্মীর এবং বাংলাদেশ প্রভৃতি স্থানের ব্যাপারে সকল সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। আমেরিকা সব সময় অত্যন্ত ছলচাতুরী, ধূর্ততা এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বের শিকড় উৎপাটন এবং তার শত্রুদেরকে সহযোগিতা করে এসেছে। এই আমেরিকাই এখন আফগানিস্তানের জিহাদে তার দেওয়া সহযোগিতার বিষয় খুব জোরেশোরে ঢোল পিটিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচার করে চলেছে। যেন মুজাহিদগণ আল্লাহ তাআলার নুসরাত এবং নিজেদের ঐতিহাসিক কুরবানী ও ত্যাগের বিনিময়ে যে বিজয় লাভ করছেন, তার বিজয়মাল্য তার মাথাতেই শোভা পায়। অথচ বাস্তব অবস্থা এই যে, জিহাদের প্রথম দু' বছর যখন মুজাহিদগণ নিতান্তই নিঃসম্বল ছিলেন, তখন আমেরিকা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করেনি। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তাদের ধারণা ছিল যে, মুজাহিদগণ রুশ সেনাবাহিনীর এই প্লাবনের সম্মুখে দীর্ঘক্ষণ টিকতে পারবে না।

কিন্তু এও ইসলামের মুজাহিদদের এখলাস, সবর এবং তাওয়াক্কুলেরই ফল যে, সমস্ত কুদরতের আধার মহান সত্তা আল্লাহ তাআলা, যিনি ফিরআউনের হাতে মূসা (আঃ)এর প্রতিপালন করান,

তিনিই আমেরিকার মত চরম ইসলাম বিদ্বেষী দুশমনকে মুজাহিদদের সাহায্য করতে বাধ্য করেন। আমেরিকা যখন দেখল যে, আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানগণ দু' বছরের মধ্যে নিজেদের লাশের স্তূপ তৈরী করে রাশিয়ানদের সয়লাবের মুখে বাঁধ খাড়া করেছে, তখন সেও রাশিয়া থেকে ভিয়েতনামের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্রমান্বয়ে মুজাহিদদের নিকট সাহায্য প্রেরণ আরম্ভ করে। চীনও নিজেদের রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক স্বার্থকে সামনে রেখে মুজাহিদদেরকে সাহায্য প্রদান করে। যা সে বাইরে প্রচার করেনি। কিন্তু আমেরিকা যে পরিমাণ সাহায্য করেছে, প্রচার করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। মুজাহিদদের যে কেন্দ্রে বসে আমরা এসব তথ্য সংগ্রহ করছিলাম, সেখানে চীন ও রাশিয়ার অস্ত্র তো দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমেরিকান অস্ত্রের নিশানা পর্যন্ত চোখে পড়ছিল না।

মুজাহিদদের দৃষ্টিতে জেনেভা চুক্তি

আমাদের সমগ্র সফরে আমরা এ বিষয়টি দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করি যে, আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ আমেরিকার ব্যাপারে কোনরূপ সুধারণায় লিপ্ত নয়। তারা ভাল করেই জানে এবং বুঝে যে, আমেরিকার এই সাহায্য মুসলমানদের সহমর্মিতার কারণে নয়, বরং নিরেট আমেরিকান স্বার্থেই তারা প্রদান করছে। আমেরিকার স্বার্থ এর বিপরীতে হলে তখন সে রাশিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েও মুজাহিদদের পিঠে তরবারীর আঘাত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না।

'জেনেভা চুক্তিকেও' মুজাহিদরা নিজেদের পিঠে আমেরিকার একটি আঘাত বলেই মনে করে থাকে। আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই চুক্তির উদ্যোগ এ কারণে গ্রহণ করেছে যে, রাশিয়ার সৈন্যরা আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে গেলে এখানে পাকিস্তানের সমর্থক ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যেন এমন এক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, পাকিস্তানের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক থাকবে না। সে সরকার আমেরিকার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে, আবার রাশিয়ার নিকটও গ্রহণযোগ্য হবে। তথাকথিত এই চুক্তির ভিত্তিতে আমেরিকা মুজাহিদদেরকে অস্ত্র দিতে চাইলে দিতে পারবে ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে যে, সে মুজাহিদদের

কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবে না। তাদেরকে অবিলম্বে পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য করবে। পাকিস্তানের ভূমিতে একজন মুজাহিদের অস্তিত্বকেও মুহূর্তের জন্য বরদাস্ত করবে না। তাদের প্রচার মাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে যেন মুজাহিদদের পক্ষে একটি শব্দও মুখ বা কলম থেকে বের করতে না পারে। রাশিয়ান সেনাবাহিনী এবং আফগানিস্তানের পুতুল কমিউনিষ্ট সরকারের সাথে লড়াই করবে তো মুজাহিদরা, কিন্তু বিজয় লাভের পর এখানে মুজাহিদদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং 'অধিকতর প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে' সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্য ভাষায়, এমন লোকদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, যাদের প্রতি আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। এজন্য মুজাহিদগণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বেই একথা বলে এই চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে—

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو ' پرواز میں کوتاہی

'হে ঊর্ধ্বজগতের পাখি! এমন জীবিকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়, যে জীবিকার দ্বারা ঊর্ধ্বারোহনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।'

আমেরিকান ষ্টিংগার মিসাইল

এখন থেকে প্রায় দেড় বছর পূর্বে আমেরিকা একদিকে তো মুজাহিদদেরকে ষ্টিংগার মিসাইল জোগান দিয়েছে, যার দ্বারা রাশিয়ান বিমান এবং হেলিকপ্টার শিকার করা তাদের জন্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সহজ হয়েছে। সুতরাং মাত্র দেড় বছর সময়কালে মুজাহিদরা প্রায় ৪৩৫টি রাশিয়ান বিমান এবং হেলিকপ্টার ধ্বংস করেছে এবং কমিউনিষ্টদের আকাশ পথের আক্রমণ থেকে তারা অনেকটা নিরাপত্তা লাভ করেছে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই অর্থাৎ যখন মুজাহিদদেরকে এই মিসাইল দেওয়া হচ্ছিল, আমেরিকা জেনেভা আলোচনার জাল নতুন করে বিস্তার করে, মুজাহিদদের প্রত্যাশিত সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে নিজের সঙ্গে এক করে নেওয়া এবং মুজাহিদ ও পাকিস্তানের উপর সম্ভাব্য সবধরনের চাপ প্রয়োগ করে জেনেভা চুক্তিতে দস্তখত করানোর জন্য কট্টর ইহুদী 'আরমণ্ড হিমার' এর সেবা গ্রহণ করে। তার আসল জন্মভূমি রাশিয়া। যে

জীবন অতিবাহিত করে আমেরিকায়। আরমণ্ড হিমার আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল জিওরী' এর একজন বিশিষ্ট সদস্য। আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইসরাইলের উপর তার বিশেষ প্রভাব ও ক্ষমতা রয়েছে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিগ্যান এবং রাশিয়ার জেনারেল সেক্রেটারী গর্বাচেভ তার ব্যক্তিগত বন্ধু। তার লিখিত একটি প্রবন্ধ 'নিউইয়র্ক টাইমস'–এ ৪ঠা জুন ১৯৮৮ ঈসায়ীতে প্রকাশিত হয়। তাতে সে তার ঐসব প্রচেষ্টার বিষয় তুলে ধরে, যা সে জেনেভা চুক্তিকে অস্তিত্ব দানের জন্য সম্পাদন করেছে।

প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো করাচী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'তাকবীর'–এ ২০শে অক্টোবর ১৯৮৮ ঈসায়ীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, সে ১৯৮৭ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারী মাসে এ প্রচেষ্টা আরম্ভ করে (এটি প্রায় সেই সময়, যখন আমেরিকার পক্ষ থেকে মুজাহিদদেরকে ষ্টিংগার মিসাইল যোগান দেওয়া হচ্ছিল) তার বক্তব্য অনুযায়ী সে এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় মাত্র ১৪ মাস সময়ে ছয়বার পাকিস্তান এসেছে। সেখানে সে পাকিস্তানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছে। এতদ্ব্যতীত সে আফগান গেরিলাদের (সে মুজাহিদদের জন্য এ শব্দই ব্যবহার করেছে) সঙ্গেও মিলিত হয়েছে। ওয়াশিংটন এবং মস্কোতে কয়েকবার যাতায়াত করেছে। তাতে সেখানকার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়েছে।

আমেরিকার কপটতা এবং মুজাহিদদের জবাব

সারকথা এই যে, যে সময় আমেরিকা মুজাহিদদেরকে ষ্টিংগার মিসাইল দিয়ে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ান সৈন্যদের পালানোর গতি তীব্রতর করার ব্যবস্থা করছিল, ঠিক একই সময় সে মুজাহিদদের উপরও তাদের জীবনকাল সংকীর্ণ করার উদ্দেশ্যে গভীর থেকে গভীর চক্রান্ত আরম্ভ করেছিল। এ উদ্দেশ্যে আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়ে একত্রিত হয়ে 'জেনেভা চুক্তি'তে স্বাক্ষর করতে পাকিস্তানকে বাধ্য করে। এই হলো সেই আমেরিকান সাহায্য, যার কথা এত ঢোল পিটিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হচ্ছে।

تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خوار

جن کی روباہی کیا آگے ہیچ ہے زور پلنگ

'দীর্ঘদিন ধরে সূদখোর ইহুদী ওৎ পেতে বসে আছে, যাদের ধূর্ততার সম্মুখে সিংহের অপরিসীম শক্তিও তুচ্ছ।'

জনাব ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ—যাঁকে আফগানিস্তানের সমস্ত মুজাহিদ সংগঠন সর্বসম্মতিক্রমে আফগানিস্তানের প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে—অতি সম্প্রতি তার একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছে যে, আপনাদের পক্ষ থেকে 'জেনেভা চুক্তি'কে প্রত্যাখ্যান করার ফলে আমেরিকা যদি তার সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে আপনারা কি করবেন?

তিনি উত্তর দিয়েছেন যে, প্রথম এবং আসল কথা তো এই যে, আমরা এ জিহাদ কোন মানুষ বা আমেরিকার সাহায্যের ভরসায় নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে আরম্ভ করেছি। সুতরাং দুই বছর পর্যন্ত আমরা কোনরূপ আমেরিকান সাহায্য পাইনি। আমরা একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে লড়াই করেছি। আমেরিকান সাহায্য তো দুই বছর পর আসতে আরম্ভ করে। ভবিষ্যতেও যদি আমেরিকা সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে তা নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জিহাদ নিখাদ আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখলাসের সাথে অব্যাহত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সাহায্যও আমরা লাভ করতে থাকবো।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এ জিহাদ আমাদেরকে শত্রুর নিকট হতে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কৌশল খুব ভাল করেই শিখিয়েছে, বিধায় যতক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়ান সেনাবাহিনী বা তাদের অস্ত্র আফগানিস্তানে রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আমাদের অস্ত্রের অভাব হবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, মুজাহিদদের সংখ্যা কমবেশী পাঁচ লক্ষ। পাঁচ লক্ষের এই বিশাল বাহিনী—যারা দীর্ঘ নয় বছর ধরে একটি পরাশক্তির সঙ্গে অবিরাম লড়ে চলছে—আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারেও দক্ষতা লাভ করেছে। উপরন্তু তারা আল্লাহ তাআলার বিরল ও বিস্ময়কর সাহায্য-সহযোগিতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। পাঁচ লক্ষের এমন লড়াকু, অভিজ্ঞ এবং ঈমান ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ সেনাবাহিনী বর্তমান বিশ্বের কোন দেশের নিকটই নেই। তাই আমরা জেনেভা চুক্তিকে মেনে নিব না এবং পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করা পর্যন্ত সর্বাবস্থায় আমরা জিহাদকে

অব্যাহত রাখব, ইনশাআল্লাহ।

خدا کے پاک بندوں کو ' حکومت میں ' غلامی میں

زرہ کوئی ' اگر محفوظ رکھتی ہے ' تو استغنا

'আল্লাহর পবিত্র বান্দাদেরকে ক্ষমতায় থাকাবস্থায় কিংবা দাসত্ব অবস্থায় একমাত্র যে বর্ম রক্ষা করতে পারে তাহলো অমুখাপেক্ষীতা।'

* * *

পাক–আফগান সীমান্তের 'বাগাড়' নামক জায়গায় অবস্থিত মুজাহিদদের যে ক্যাম্পে আমরা রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করছিলাম, সেটি যদিও পাকিস্তানের স্বাধীন গোত্র শাসিত অঞ্চল দক্ষিণ উযিরস্তানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বাধীন গোত্রসমূহ জেনেভা চুক্তিকে পূর্বেই প্রত্যাখ্যান করে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে, এ চুক্তি আমাদের উপর প্রযোজ্য হবে না। আমরা সমগ্র আফগানিস্তানে মুজাহিদদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্য প্রদান করা অব্যাহত রাখব। কিন্তু মুজাহিদরা বললেন যে, আল্লাহ না করুন, পাকিস্তান কোন কারণে এ সমঝোতায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলে আমরা এ ক্যাম্প এবং মুজাহিদদের অন্যান্য সকল ক্যাম্প এখান থেকে অবিলম্বে আফগানিস্তানে স্থানান্তরিত করব, যার ব্যবস্থা খুবই দ্রুত নেয়া হচ্ছে।

তিনজন রাশিয়ান গুপ্তচর

এখানেই ধ্বংসাত্মক কাজের সাথে জড়িত রুশ বাহিনীর তিনজন আফগান গুপ্তচরও বন্দী ছিল। মুজাহিদরা তাদেরকে হাতে নাতে গ্রেফতার করেছিল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে বেড়ী পরিয়ে কামরা থেকে বের করে আনা হয়। তাদের মধ্য থেকে একজনকে বন্দী করার ঘটনা এই যে, উরগুনের রাশিয়ান ছাউনী হতে সে একটি গাধায় আরোহণ করে বের হয়। গাধার পিঠে একটি বোঝাও ছিল। টহলরত মুজাহিদরা তাকে থামিয়ে তল্লাশী করে। বোঝার মধ্য থেকে অনেকগুলো পাকিস্তানী এবং আফগানী মুদ্রা এবং গুরুত্বপূর্ণ গোপন

দস্তাবেজসমূহ বের হয়। এসব কাগজপত্র থেকে আরো বেশ ক'জন গুপ্তচরের নামও পাওয়া যায়।

অবশেষে সে স্বীকার করে যে, এসব জিনিস সে ঐ সমস্ত মুজাহিদদের নিকট নিয়ে যাচ্ছিল—যারা মুজাহিদদের ছদ্মবেশে মুজাহিদদের সঙ্গেই অবস্থান করে থাকে। তারই দিক নির্দেশনা এবং দলীলপত্রের সাহায্যে মাওলানা আরসালান খান রহমানীর ক্যাম্প থেকে তার অপর সঙ্গীকে পাকড়াও করা হয়। তাদের একজনের নিকট থেকে—যে এই জিহাদে মাওলানা রহমানীর ডান হাত রূপে কাজ করছিল—এক ধরনের মারাত্মক বিষ উদ্ধার করা হয়। সে স্বীকার করে যে, এই বিষ মাওলানা আরসালান খান রহমানীকে হত্যা করার জন্য রাশিয়ানরা অতি সম্প্রতি পাঠিয়েছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে যে, তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি রাশিয়ানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এবং তাদের গোপন তথ্য লাভ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছি। তখন আমরা প্রশ্ন করি যে, তাহলে তুমি তোমার আমীর মাওলানা রহমানীকে তোমার পরিকল্পনার কথা জানাওনি কেন এবং তাঁর থেকে অনুমতি গ্রহণ করনি কেন? তখন সে দৃষ্টি নত করে নেয়। এবং তা নতই রয়ে যায়।

یہ مانا اصل شاہینی ہے تیری
تری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے

'স্বীকার করি তুমি ঈগল জাতের, কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে তো সেই নির্ভীকতা নেই।'

•

মুজাহিদদের শরয়ী আদালতসমূহ

আমাদেরকে জানানো হয় যে, মুজাহিদরা আফগানিস্তানের যেসব এলাকা আযাদ করেছে, সেসব এলাকায় নির্ভরযোগ্য আলেমদের সমন্বয়ে শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব আদালতে সব ধরনের মোকদ্দমার ফয়সালা শরী'অতের বিধান অনুপাতে করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয়। যুদ্ধবন্দীদেরকে সেই খাবারই দেওয়া হয়, যা মুজাহিদরা খায়। জানতে পারলাম যে, এই বন্দীত্রয়ের মোকদ্দমাও আফগানিস্তানে একটি

আদালতের অধীনে রয়েছে। আদালত সত্বর শুনানী শেষ করে তাদের সম্পর্কে রায় ঘোষণা করবে।

ক্লাসিনকোভ ও তার প্রশিক্ষণ

রাতের খাবার এবং এশার নামাযের পর রেজিষ্ট্রি খাতায় লিপিবদ্ধ করে আমাদেরকে একটি করে ক্লাসিনকোভ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক ক্লাসিনকোভের সাথে গুলি ভরা একটি করে ম্যাগাজিন লাগানো ছিল। একটি ম্যাগাজিনে একই সাথে ত্রিশটি করে গুলি ধরে। ক্লাশিনকোভের গুলি থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলির চেয়ে বড়। সাবধানতা বশত আরও তিনটি করে গুলি ভরা ম্যাগাজিন প্রত্যেককে প্রদান করা হয়। সেগুলো সৈনিকদের বক্ষবন্ধনীর তিন পকেটে রাখা ছিল। মোটা চামড়ার এই বক্ষবন্ধনী ম্যাগাজিন রাখার জন্যই তৈরী করা হয়। তার মধ্যে বসানো শক্ত ফিতা ঘাড় এবং কাঁধে এমনভাবে ঝুলানো থাকে যে, ফিতার পকেট তিনটি সিপাহীর বুকের সঙ্গে লেগে থাকে। ক্লাসিনকোভের সাথে সংযুক্ত ম্যাগাজিনের সব কয়টি গুলি ব্যবহার শেষ হলে তার স্থলে অপর একটি ম্যাগাজিন ক্লাসিনকোভে সংযুক্ত করা হয়। তাও শেষ হলে তৃতীয় ম্যাগাজিন এবং এমনিভাবে চতুর্থ ম্যাগাজিন সংযুক্ত করে ব্যবহার করা হয়।

আমাদেরকে এসব ক্লাসিনকোভ এবং ম্যাগাজিন সাবধানতা বশত এজন্য প্রদান করা হয়েছিল যে, ভোরবেলা আমাদের কাফেলা আফগানিস্তানের ভিতরে প্রবেশ করবে। উরগুন পৌঁছার জন্য আফগানিস্তানের ভিতর দিয়েই কয়েক ঘন্টার পথ অতিক্রম করতে হবে। পথের এসব অঞ্চল যদিও মুজাহিদরা মুক্ত করেছে। এখন আর রাশিয়ান হেলিকপ্টার এসব অঞ্চলে আসার সাহস করে না, কিন্তু মুজাহিদরা অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের এসে পড়ার সম্ভাবনাকে খাটো করে দেখে না। সুতরাং তারা আমাদের সবাইকে তখনই ক্লাসিনকোভ ব্যবহারের জরুরী প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণে ক্লাসিনকোভ খুলে পরিস্কার করা, পুনরায় জোড়া লাগানো, গুলি ভরা এবং চালানোর পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়। লক্ষ্য ঠিক করার অনুশীলন তো উরগুন গিয়ে করতে হবে। আমার বন্দুক, রিভলবার এবং থ্রি নট থ্রি রাইফেলের কিছু অনুশীলন তো আগে থেকেই করা আছে এবং বিরতি দিয়ে দিয়ে সে অনুশীলন

আলহামদুলিল্লাহ অব্যাহতও রয়েছে। কিন্তু ক্লাসিনকোভ ইতিপূর্বে শুধু দূর থেকেই দেখেছিলাম, ব্যবহারের সুযোগ এখানেই প্রথম পাই। এটি দেখে আমি আনন্দিত হই যে, এর ওজন সাধারণ রাইফেলের ওজনের চেয়ে কম এবং এর ব্যবহার খুব সহজ, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য। এর আরেকটি ভাল গুণ এই যে, ম্যাগাজিন ভরা ত্রিশটি গুলি পৃথক পৃথক ভাবে একটি একটি করে ফায়ার করেও ব্যবহার করা যায় এবং চাইলে এক সঙ্গে একই ফায়ারে ত্রিশটি গুলিই নিক্ষেপ করা যায়।

ক্লান্তি এবং প্রচণ্ড শীতের কারণে উষ্ণ কক্ষ থেকে বাইরে বের হয়ে পায়চারী করার সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু নিয়মিত অভ্যাস পুরা করার উদ্দেশ্যে করাচী থেকে সাথে আনা গরম জুব্বা পরিধান করে বাইরে বের হই। বাইরে এসে জানতে পারি যে, কিছু মুজাহিদ এ সময়েই উরগুন যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু মুজাহিদও ছিলেন, যারা আমাদের সঙ্গে দু'দিন সফর করে আজ সন্ধ্যাতেই এখানে এসে পৌঁছেছেন। এসব মুজাহিদ ধারালো তুষার বায়ু, পর্বতের নিবিড় অন্ধকার এবং রহস্যময় নিস্তব্ধতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে উন্মুক্ত পিকআপ যোগে যাত্রা করার জন্য আপাদমস্তক উন্মুখ হয়েছিলেন। তাদেরকে বিদায় করার পর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পথে তাদের অপূর্ব এই ত্যাগের প্রতিচ্ছবি আমার দৃষ্টির সম্মুখে ঘুরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন প্রাচ্যের কবি মরহুম ইকবাল এদেরই ভ্রমণ বাসনা দেখে বলেছিলেন—

تو رہ نورد شوق ہے ' منزل نہ کر قبول
لیلی بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول
اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تندو تیز
ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول

'তুমি প্রেম পথের পথিক, তোমার পথযাত্রায় কোন গন্তব্য গ্রহণ করো না, প্রিয়তমা সঙ্গিনী হলেও বিরতি দিও না। হে স্রোতস্বীনী! সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরের রূপ পরিগ্রহ কর। কূলের সন্ধান পেলেও তুমি কূল গ্রহণ করো না।'

কামরায় ফিরে এসে দেখি সব সাথী ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রায় বিশ বছর ধরে আমার অবস্থা এই যে, চরম ক্লান্তি সত্ত্বেও রাত একটা দুইটার পূর্বে

ঘুম আসে না। কিন্তু একেও আমি জিহাদেরই বরকত মনে করি যে, দীর্ঘ বিশ বছরে আজ এই প্রথমবার রাত এগারোটার সময় শুতেই চোখ লেগে যায়।

১৬ই শা'বান ১৪০৮ হিজরী

৪ঠা এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী, সোমবার

তৃপ্তিভরে ঘুমানোর পর যখন চোখ খুলল, তখন আযানের হৃদয়গ্রাহী ধ্বনি নতুন প্রভাতের সুসংবাদ শোনাচ্ছিল। এই ক্যাম্পেরই কোন এক মুজাহিদ আল্লাহ জানেন হৃদয়ের কোন্ অন্তস্থল থেকে দরদভরা আযান দিচ্ছিল। প্রাচ্যের কবি মরহুম ইকবাল সম্ভবত এমন আযান সম্পর্কেই বলেছিলেন—

وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود
ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذاں سے پیدا

'সেই ভোর, যার দ্বারা অস্তিত্বের শাবিস্তান প্রকম্পিত হয়, তা মুমিন বান্দার আযান দ্বারাই সৃষ্টি হয়।'

নামায ও নাস্তা ইত্যাদি সেরে প্রায় নয়টার দিকে আমাদের কাফেলা তিনটি জিপে করে রওনা হয়। বাগাড়ের বসতি এলাকা অতিক্রম করে বাইরে এলে এখানেও মুজাহিদদের কয়েকটি ক্যাম্প দেখতে পাই। কোন কোন ক্যাম্পে মুজাহিদদেরকে উর্দি পরিহিতি অবস্থায় প্যারেড করতে দেখতে পাই। তাদের দ্বীপ্তিময় রক্তিম সাদা মুখমণ্ডল দাড়ির নূরে সজ্জিত ছিল। আমাদের সমগ্র সফরে এ বিষয়টি দেখে বড়ই আনন্দিত হই যে, কোন মুজাহিদ দাড়ি চাঁছে না। নিয়মিত নামায রোযা পালন করা তাদের নিদর্শন। তাদের মধ্যে শরী'অতের বিধান অনুপাতে পরিপূর্ণরূপে আমল করার ফিকির সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে

উত্তর পশ্চিম দিকে কাঁচা পাহাড়ী পথ ধরে আনুমানিক পনের মিনিট চলার পর 'আঙ্গুর আড্ডা' নামের একটি কসবা সম্মুখে পড়ে। কেউ বলছিল এটি পাকিস্তানের অংশ, আফগানিস্তানের সীমানা এরপর থেকেই আরম্ভ হয়, আবার কেউ কেউ এটিকে আফগানিস্তানের অংশ বলছিল। এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানতে পারিনি। তবে এখানকার বেশীর ভাগ

লোক আফগানিস্তানেরই দেখতে পাই। দোকান এবং হোটেলসমূহের সাইন বোর্ডও বেশীর ভাগ পশতু বা ফারসী ভাষাতেই লেখা। ধারে কাছে এমন কোন সেনা বা সীমান্ত চৌকিও পাইনি, যার থেকে জানতে পারি যে, কোথা থেকে পাকিস্তানী সীমানা শেষ হয়ে আফগানিস্তানের এলাকা শুরু হয়েছে। এখানে পাকিস্তানী মুদ্রা ব্যবহার হয়, তবে আফগানী মুদ্রাও গ্রহণ করা হয়। মুজাহিদগণ বললেন যে, আফগানিস্তানের যে আশি শতাংশ এলাকা আযাদ হয়েছে, তার সর্বত্র উভয় দেশের মুদ্রাই ব্যবহার হয়। বরং পাকিস্তানী মুদ্রার কদর বেশী।

বসতি এলাকার একধারে জীপ তিনটিকে খাড়া করে আমাদের মেজবান মুজাহিদগণ বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করতে চলে যান। কারণ সম্মুখে উরগুন পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা যদিও আযাদ হয়েছে, কিন্তু পথে এমন কোন বসতি এখন আর অবশিষ্ট নেই, যেখান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যেতে পারে। কমিউনিষ্টদের অপশাসনকালে বেশীর ভাগ জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে। সেখানকার অধিবাসীদের যারা বেঁচে আছেন, তারা হয় বিভিন্ন রণাঙ্গনে লড়াইরত অথবা হিজরত করে পাকিস্তানে চলে গিয়েছেন। উরগুনের মুজাহিদদের ক্যাম্পের জন্যও রসদপত্র 'আঙ্গুর আড্ডা' অথবা 'বাগাড়' থেকেই ক্রয় করা হয়। মুজাহিদরা চাচ্ছিলেন, আমরা যেন জীপের মধ্যেই বসে থাকি। কারণ, এখানে শত্রুর গুপ্তচরও রয়েছে। তারা এখান থেকে অস্বাভাবিক গতিবিধির সংবাদ ওয়ারলেস যোগে উরগুনের রাশিয়ান ছাউনীতে অবহিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

সম্মুখে উরগুনে মুজাহিদদের ক্যাম্পে পৌছার পূর্বেই আমাদেরকে এমন একটি এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, যা শত্রু বাহিনীর তোপের আওতায় পড়ে, তাই মুজাহিদরা আমাদের আগমনের সংবাদ রাশিয়ান ছাউনীর নিকট গোপন রাখতে চাচ্ছিল। কাফেলার আগমনের কথা পূর্বেই জানতে পারলে তাদের পক্ষ থেকে গোলা বর্ষণের প্রবল আশংকা রয়েছে।

প্রায় এক ঘন্টা পর জীপ তিনটি পুনরায় উত্তর পশ্চিম দিকে চলতে থাকে। 'আঙ্গুর আড্ডা' থেকে বের হতেই আমরা নিশ্চিতভাবেই আফগানিস্তানে প্রবেশ করি। এখান থেকে আফগানিস্তানের 'পাকতিকা' প্রদেশ আরম্ভ হয়েছে। এখানে এ বিষয়টিও তুলে ধরছি যে,

আফগানিস্তানে 'পাকতিয়া' নামে একটি প্রদেশ রয়েছে। পূর্বে এটি বড় একটি প্রদেশ ছিল। কমিউনিষ্টরা তাদের শাসনকালে একে বিভক্ত করে দুটি প্রদেশ বানায়। তার একটির নাম পূর্বের ন্যায় পাকতিয়াই থেকে যায় আর অপরটির নাম হয় 'পাকতিকা'। আমাদের গন্তব্য 'উরগুন' পাকতিকা প্রদেশের একটি জেলার ন্যায় গুরুত্ব রাখে। এই প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর 'শারানা'। সেখানকার একটি রক্তাক্ত লড়াইয়ের বিবরণ মাওলানা ইরশাদ আহমাদ (রহঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা প্রসঙ্গে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখন এ প্রদেশের এই দুইটি মাত্র শহর এবং তার ছাউনীসমূহ দুশমনের দখলে রয়েছে। অবশিষ্ট সম্পূর্ণ প্রদেশ স্বাধীন হয়েছে।

আঙ্গুর আড্ডা পর্যন্ত সবুজ শ্যামল পর্বত সারি বিদ্যমান ছিল। সেখান থেকে বের হতেই প্রান্তর শুরু হয়। যার মধ্যে সর্বত্র বিরানভূমিই দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক দূরে কয়েকটি গ্রামও দেখতে পাই। কিন্তু সবগুলো উজাড়, বিরান এবং বিধ্বস্ত। কোন কোন গ্রামের সমস্ত বাড়ীঘর অক্ষত দেখতে পাই। কিন্তু এগুলোতেও কারো বসবাসের চিহ্ন ছিল না। এসব গ্রামের অধিবাসীরা আল্লাহ জানেন এখন কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন। পাহাড়ী নদী থেকে বয়ে আসা পানির এখানেও অভাব নেই। বিভিন্ন লক্ষণ থেকে জানা যাচ্ছিল যে, কয়েক বছর পূর্বে এখানেও লকলকে ক্ষেত এবং সবুজ শ্যামল বাগান ছিল। সেগুলো এ সমস্ত পানি দ্বারাই পরিতৃপ্ত হত। আর এখন শুধুমাত্র সেসব ক্ষেতের অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন কোথাও কোথাও অবশিষ্ট রয়েছে। কোথাও কোথাও কিছু বৃক্ষ এখনও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো দেখা যায়। যেগুলো তাদের মালিকদের বিচ্ছেদে বিবর্ণ হয়ে গেছে। উত্তর পশ্চিমের পাহাড় সারি থেকে বয়ে আসা ঝর্ণাধারার এই পানিও এখন অসহায়ভাবে এদিক সেদিক এমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, যেন এ সমগ্র ভূখণ্ড তাদের মালিকের বিচ্ছেদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অশ্রু বর্ষণ করছে। হায়! পানির প্রবাহিত এ অশ্রুকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতে পারত—

اے آبشار نوحہ گراز بہر کیستی؟
سر رابہ سنگ می زنی وی گریستی؟

'হে ঝর্ণাধারা! কার বিচ্ছেদে তুমি এমন করুণ শোকগাঁথা গাইছো? কাকে হারিয়ে তুমি পাথরে মাথা কুটে চলছো এবং অশ্রু বিসর্জন করছ?'

আফগান ভূমিতে ভ্রমণ করতে করতে ইতিহাসের কত পৃষ্ঠা যে কল্পনার দৃষ্টিতে ভেসে উঠতে থাকে তার শেষ নেই।[১]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাযিঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযিঃ)এর বীরত্ব, দ্বীনী গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ এবং মাহমুদ গজনবী ও আহমদ শাহ আবদালীর মহাপরাক্রম ও প্রতিপত্তির দাস্তান স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠতে থাকে।

دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد

جل چکا حاصل ' مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد

'আসরের উত্তাপের স্মৃতি আজও হৃদয়কে অস্থির করে। আসরের প্রাপ্তিতো ভস্ম হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার স্মৃতি আজও অম্লান রয়েছে।'

প্রায় এক ঘন্টা উপত্যকা অঞ্চল অতিক্রম করার পর জীপ তিনটি পুনরায় পর্বতসারির আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথে প্রবেশ করে। জীপগুলো ভাড়ায় নেওয়া হয়েছিল। ড্রাইভার ছিল আফগানী মুসলমান। কিন্তু তাদের মধ্যে জিহাদের তৎপরতার প্রতি কোন আকর্ষণ চোখে পড়ল না। তাদেরকে সবসময় একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম নিজেদের গাড়ীগুলো দুশমনের হেলিকপ্টার এবং তোপ থেকে রক্ষা করার চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখে।

তারা এখানে পৌছার পর হেলিকপ্টারের আক্রমণের কাল্পনিক

---

১. ৩৩ হিজরীতে হযরত ফারুকে আযম উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)এর খিলাফত কালে বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তর এবং পশ্চিমের সমস্ত এলাকা এবং দক্ষিণ ও পূর্বের কিছু কিছু এলাকা ইসলামের শাসনাধীনে আসে। যার মধ্যে হেরাত, মরভ (ভাটি মারগাব), বল্‌খ, জওযজান, বামিয়ান, তালেকান, ফারিয়াভ, তখার, সিস্তান (সিজিস্তান—কান্দাহার ও জরনয) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আফগানিস্তানের অবশিষ্ট সমস্ত এলাকা—যার মধ্যে কাবুল এবং গজনী রয়েছে—হযরত উসমান গনী (রাযিঃ)এর খিলাফত কালে (২৫—৩৫ হিজরী) বিজিত হয়।

কাবুলকে সর্বপ্রথম ২৫ হিজরীতে তরুণ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাযিঃ) জয় করেন। তিনি তখন বসরার গভর্নর ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। তিনি ভূমিষ্ঠ হলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 'তাহ্‌নিক' করেন। কাবুল বিজয়ের পর তাঁর সেনাবাহিনী ফিরে গেলে এখানে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ৫ বছরের জন্য কাবুল মুসলমানদের

আশংকায় মুজাহিদদের সচরাচর যাতায়াতের পথ পরিহার করে আরেকটি পথে চলতে আরম্ভ করে। সচরাচর যাতায়াতের পথটি যদিও কাঁচা এবং পাহাড়ী গিরিপথ, কিন্তু এ পথ ধরে উরগুনের দূরত্ব মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টায় অতিক্রম করা যায়। তারা এ পথ ছেড়ে পাহাড়ী ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অনুমানের ভিত্তিতে পথ চলতে আরম্ভ করে। যেখান দিয়ে আদৌ কোন পথ ছিল না। আমাদের মেজবান মুজাহিদগণ তাদেরকে এত করে বুঝালেন যে, বহুদিন ধরে এখানে কোন হেলিকপ্টার আসে না, কিন্তু তারা বনের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলার জন্য গোঁ ধরল। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা অধিক সতর্কতার জন্য একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী খালের মধ্য দিয়ে জীপ চালাতে আরম্ভ করল। খালে যদিও পানি কম ছিল এবং কোথাও কোথাও পানির বদলে শুধু আর্দ্রতা ছিল, কিন্তু খালটি ছিল খুব বেশী আঁকাবাঁকা। জীপগুলো বারবার খালের মধ্যে দেবে যাচ্ছিল এবং দোলনার মত দুলতে দুলতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। কোথাও বেশী পানি এলে বাধ্য হয়ে গাড়ী খাল থেকে বের করে ডান–বামের টিলার

হাতছাড়া হয়ে যায়। আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান গনী (রাযিঃ)এর নির্দেশে মশহুর সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযিঃ) পুনরায় সেনাভিযান চালিয়ে কাবুল জয় করেন। তার পরপরই গজনীও জয় করেন। আমীরুল মুমিনীন তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত তাবেঈ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এবং ফুকাহায়ে কেরামের একটি দলকেও প্রেরণ করেছিলেন, যেন বিজিত এই অঞ্চলে ইসলামী বিধান প্রয়োগ এবং তার প্রচার প্রসার এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা যায়। তাঁদের প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর কাবুলে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন করার জন্য ৪৩ হিজরীতে হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ), হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযিঃ)কেই পুনরায় প্রেরণ করেন। তিনি আশেপাশের হ গোল নিশ্চিহ্ন করে ৪৪ হিজরীতে 'মিনজানিক' এর সাহায্যে কাবুলকে নতুন করে জয় করেন। কাবুল জয়ের এই লড়াইয়ে একজন মহান সাহাবী হযরত আবু রিফায়া তামীম বিন উসাইদ আল আদবী (রাযিঃ) শাহাদাত লাভ করেন। সেখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। এক বর্ণনা মতে এখানে যে সাহাবী শহীদ হন, তিনি ছিলেন হযরত আবু কাতাদা আল আদাবী। (আল ইসাবা পৃঃ ৭০,৪র্থ খণ্ড) আফগানিস্তানে ইসলামের আত্মপ্রকাশের বিস্তারিত ইতিহাস এবং এখানকার ইলমী ও দ্বীনী মহান ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে জানার জন্য ডঃ মুহাম্মাদ আলী আল বার প্রণীত 'আফগানিস্তান মিনাল ফাতহিল ইসলামী ইলাল গাজবীর রুসী' (পৃঃ ৯০–১৩০, ৩৪৫–শেষ পর্যন্ত) পুস্তকটি দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য 'দা–ইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া' উর্দু। (পৃঃ ৯৫১–৯৫৪ দ্রষ্টব্য) রফী' উসমানী।

মধ্যে দিয়ে চালাতে হচ্ছিল। আবার যখন পানির পরিমাণ কম দেখা দিত, তখন তারা পুনরায় খালের মধ্য দিয়ে চলতে আরম্ভ করত।

কোমরের ব্যথার কারণে আমাকে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জীপের দেওয়াল সংলগ্ন পিছনের লম্বা সীটগুলোতে উপবেশন করা সাথীদের অবস্থা ঝাকুনি খেতে খেতে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আমি সেখানে বসলে তো কয়েক ধাক্কাতেই কোমর দু' ভাগ হয়ে যেত। এজন্য সম্মুখের সীটেই অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বসে থাকি। একটি জীপ দু'বার এমনভাবে কাদায় ফেঁসে যায় যে, মোটা রশি বেঁধে অন্য জীপের সাহায্যে তাকে উঠানো হয়। তবে জিহাদের জযবা পথের এসব কায়ক্লেশকেও অনাবিল আনন্দময় ও আবেগপূর্ণ করে দেয়। জিহাদী পথের কষ্ট এতই মধুময় ও ভাবপূর্ণ ছিল যে, আজও তার কথা স্মরণ হয়। হযরত মুর্শিদ আরেফীর ভাষায়—

کچھ تقاضائے جنون جستجو ہی دل میں ہے
کیا کشش ورنہ ، طلسم جادہ و منزل میں ہے

'বন্ধুর সন্ধানের এমনই উন্মাদনা হৃদয়ে বিরাজ করছে যে, এর কারণেই প্রেমপথের যাবতীয় কষ্ট মধুময় লাগছে। অন্যথায় পথ ও গন্তব্যে এছাড়া আর কি আকর্ষণ রয়েছে।'

কয়েক ঘন্টার চরম ধৈর্যসহ পথ চলার পর দেড় ঘটিকায় 'রিবাত' নামক একটি জায়গায় পৌছি। এখানে দূর থেকে কিছু বসতিও দেখতে পাই। এখানে ছোট ছোট হোটেল আছে বলে জানতে পারি। কিন্তু জীপ বাজারটিকে পাশ কাটিয়ে একটি পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ী নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়ায়। জীপ থেকে বের হয়ে এসে এখানকার উন্মুক্ত নৈসর্গিক দৃশ্য এবং প্রচণ্ড শীতের মধ্যে চারদিকের ঝলমলে রোদ বড়ই আকর্ষণীয় লাগছিল। সর্বোপরি উরগুনের মুজাহিদদের ক্যাম্প আর মাত্র দুই ঘন্টার পথ বাকী রয়েছে, এই সুসংবাদে আমাদের আনন্দ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

جس قدر تھکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں قدم
اعتبار قرب منزل اور بڑھتا جائے ہ

'পদযুগলে যতই ক্লান্তি অনুভব হয়,
গন্তব্যের নৈকট্য ততই বৃদ্ধি পায়।'

এখানকার আনন্দঘন পরিবেশে কয়েক কদম হেঁটে এবং পাহাড়ী ঝর্ণার নির্মল, স্বচ্ছ, শীতল পানি পান করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ক্লান্তি চলে যায়। সবাই উযূ করে আযান দিয়ে জামাআতের সাথে যোহর নামায আদায় করি। পূর্ব প্রোগ্রাম মতে আমাদেরকে দেড়টার সময় উরগুনের ক্যাম্পে পৌছার কথা ছিল, সেখানেই যোহর নামায পড়ার এবং দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পথ পরিবর্তনের কারণে এখানেই দুটো বেজে যায়। ক্ষুধা অনুভব হতে থাকে। আঙ্গুর আড্ডা থেকে সতর্কতামূলক ক্রয় করা কিছু বুট ভাজা এবং গুড় সাথীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। তারপর জীপ তিনটি পুনরায় উত্তর পশ্চিম দিকে যাত্রা করে।

উরগুন উপত্যকায়

গাড়ী এখান থেকে উরগুন উপত্যকা পর্যন্ত পাহাড়ী বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। এখানকার টিলাগুলো বেশীর ভাগ ছিল মাটির। তাই চলার গতি তুলনামূলক দ্রুত হয়। দেড় ঘন্টা পর্যন্ত বনজঙ্গলে ঢাকা আঁকাবাঁকা এবং উঁচুনীচু টিলাসমূহের উপর দিয়ে চলার পর জীপ আরেকটি টিলার উপর আরোহণ করলে সম্মুখে একটু নীচে অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত একটি প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রান্তরটি চতুর্দিক থেকে পাহাড় সারি দ্বারা বেষ্টিত। তার দৈর্ঘ্য উত্তর–দক্ষিণে কমপক্ষে বিশ কিলোমিটার এবং চওড়া পূর্ব–পশ্চিমে কমপক্ষে পাঁচ কিলোমিটার হবে। ড্রাইভার আনন্দ সংবাদ শুনায় যে, এটিই 'উরগুন উপত্যকা'। আমরা দক্ষিণ–পূর্বের পর্বত থেকে তাতে অবতরণ করব। উপত্যকার অপর প্রান্তে উত্তর পশ্চিমে পাহাড়ের পাদদেশে কিছুটা উচ্চতায় মুজাহিদদের ক্যাম্পসমূহ আবছা আবছা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তিনদিনের ধৈর্যসংকুল পথ চলার পর সম্মুখে গন্তব্য দেখতে পেয়ে আবেগ উচ্ছাসের অপার্থিব ভাবতরঙ্গ দেহের শিরায় শিরায় এক অপূর্ব শিহরণ জাগায়।

دل کو تپش شوق کی یہ لذت پیہم
مل تو گئی لیکن بڑی مشکل سے ملی ہے

'প্রেমের উষ্ণতার বিরামহীন এই স্বাদ হৃদয় লাভ করেছে বটে, তবে তা বড় কষ্টে লাভ হয়েছে।'

উপত্যকার উত্তরে এখান থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে

আকাশচুম্বী পর্বতসারি তুষারের কারণে চমকাচ্ছিল। সেই পাহাড়সারির পাদদেশে উপত্যকার একপ্রান্তে উরগুন শহর এবং কেল্লাবেষ্টিত রুশ সেনাদের উরগুন ছাউনী। আশেপাশের বন-বাগানের কারণে এখান থেকে সেগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না। ওদিকেই ছাউনীর একটু আগে অর্থাৎ আমাদের থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরে রাশিয়ানদের বিরাট মজবুত ভূগর্ভস্থ 'জামাখোলা' চৌকি (পোষ্ট) অবস্থিত। তারা উরগুন শহর এবং ছাউনীকে মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য চৌকিটি তিন চার বছর পূর্বে নির্মাণ করেছে। জামাখোলা পোষ্ট এবং ছাউনীর মাঝখানে আরও বেশ কয়েকটি সেনা চৌকি একই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। জামাখোলা পোষ্টে দুশমনের ট্যাংক এবং তোপ সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকে। সেগুলো প্রায় বিশ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত গোলা নিক্ষেপ করতে পারে। এ উপত্যকা সম্পূর্ণটা তাদের আক্রমণের আওতায় রয়েছে। কমিউনিষ্ট সৈন্যরা উপত্যকায় প্রবেশকারী প্রত্যেকটি গাড়ীতে—সচরাচর যেগুলো মুজাহিদদেরই হয়ে থাকে—গোলাবর্ষণ করে থাকে। কিন্তু মুজাহিদদের গাড়ীসমূহ রাতদিন ঠিকই উপত্যকা অতিক্রম করতে থাকে। তাদের এসব তোপ আজ পর্যন্ত কোন গাড়ীকে নিশানা বানাতে সক্ষম হয়নি।

আমরা পাহাড়ী টিলা থেকে বের হয়ে উপত্যকায় অবতরণ করার পূর্বেই কয়েকটি কাঁচা বাড়ীর বাইরে দু'চারজন স্থানীয় অধিবাসীকে দাঁড়ানো দেখতে পাই। তারা আমাদেরকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল। তাদের নিকট পৌছে জীপ দাঁড় করানো হয়। তারা উত্তর দিকে ইঙ্গিত করে বলে যে, এইমাত্র সেদিকে হেলিকপ্টারের আভাস পাওয়া গেছে। সম্ভবত সেটি সম্মুখের ঝোপঝাড়ের মধ্যে অবতরণ করে লুকিয়ে আছে। বাড়ীর আড়ালে জীপগুলোকে খাড়া করে আমরা সবাই বাইরে চলে আসি এবং দুরবীনের সাহায্যে হেলিকপ্টারটি সন্ধান করতে থাকি। কোন কোন মুজাহিদ শুয়ে পড়ে মাটিতে কান লাগিয়ে তার শব্দ শোনার চেষ্টা করে। অবশিষ্টরা নিজেদের ক্লাশিনকোভ প্রস্তুত করে নেয়। কিন্তু কয়েক মিনিট যাচাই-বাছাই করার পর প্রবল ধারণা জন্মে যে, স্থানীয় লোকদের বিভ্রান্তি হয়েছে। তবে এ ঘটনা থেকে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে হেলিকপ্টারের কারণে সৃষ্ট ভীতি ও হতাশা সম্পর্কে আমরা সম্যক অবগতি লাভ করি। এই ভুল বুঝাবুঝি আমাদের ড্রাইভারদেরকে আরও সাবধানী

করে দেয়, যা আমাদের জন্য অধিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবার তারা মুজাহিদদের কেন্দ্রের দিকে সোজা অগ্রসর না হয়ে উপত্যকায় উৎপন্ন ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলার জন্য বহু দূর ঘুরে পথ চলতে আরম্ভ করে। ফলে আমাদের অত্যাধিক কষ্ট হতে থাকে। উপত্যকা অতিক্রম করতেই আধা ঘন্টা সময় লেগে যায়। সম্ভবত আমাদের উপর দুশমনের নজরই পড়েনি। ফলে এদিকে কোন গোলাই আসেনি।

"دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است"

'দুশমন যদিও শক্তিশালী কিন্তু রক্ষাকর্তা তো অসীম শক্তির অধিকারী।'

খানী কেল্লাস্থ মুজাহিদদের ক্যাম্পে

উপত্যকা অতিক্রম করে আমরা পশ্চিমের সেই পর্বতসারিতে—যার মধ্যে মুজাহিদদের বিভিন্ন সংগঠনের ক্যাম্প রয়েছে—প্রবেশ করতে আরম্ভ করতেই সম্মুখের একটি পাহাড়ের পাদদেশে 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী'র উর্দি পরিহিত তরুণ মুজাহিদদের একটি সশস্ত্র বাহিনীকে পিকআপে আরোহী অবস্থায় আমাদের জন্য প্রতীক্ষমান দেখতে পাই। তাঁরা আমাদেরকে দেখামাত্র 'না'রায়ে তাকবীর' শ্লোগান দিতে দিতে একযোগে ক্লাশিনকোভের ফাঁকা গুলি করতে আরম্ভ করে এবং অনতিবিলম্বে তাঁদের পিকআপ সম্মুখে রওয়ানা করে। আমাদের জীপ তাঁদের পথপ্রদর্শনে পিছনে পিছনে চলতে থাকে। গিরিপথ ধরে প্রায় দুই ফার্লং (৪৪০ গজ) পরিমাণ ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বমুখী কাঁচাপথ ধরে চলার পর জীপ ক্যাম্পের চৌকস ও সদাপ্রস্তুত মুজাহিদদের দুটি সারির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী'র কেন্দ্রীয় কমাণ্ডার জনাব যুবায়ের আহমাদ খালিদ অত্যন্ত উষ্ণতাপূর্ণ গভীর ভালবাসাসহ আমাদেরকে স্বাগত জানান। সকলের সঙ্গে পাগলপারা হয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদদের অসংখ্য তোপ বজ্র আওয়াজে সালাম জানায়। তোপের অনবরত গর্জনে সমগ্র পর্বতসারি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত প্রকম্পিত হতে থাকে। আর সত্যি বলতে কি, প্রথম গর্জনে—যা একেবারে অকস্মাৎ গর্জে উঠেছিল—আমরা সকল নব আগন্তুক ভয়ে ভীষণভাবে কেঁপে উঠি।

دیکھ کر یہ رنگ عالم ' دم بخود ہوں عارفی
جانے یہ کیا ہورہا ہے ' جانے کیا ہونے کو ہے؟

'এ জগতের বিচিত্র রূপ দেখে বিমূঢ় হয়ে আছি। কি জানি এখানে কি হচ্ছে? কি জানি সম্মুখে আরো কি কি হবে?'

তারপর যখন আমরা উর্দি পরিহিত মুজাহিদদের সুসংগঠিত, সুসজ্জিত ও সদাপ্রস্তুত সারির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তারাও ক্লাশিনকোভের ফায়ার করে আমাদেরকে সালাম জানায়। আমরা সারি অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হলে সকল মুজাহিদ স্বীয় আমীরের নির্দেশে সারি ভেঙ্গে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য দৌড়ে আসে। তাদের মধ্যে সিংহভাগ ছিল পাকিস্তানের বিভিন্ন মাদরাসার তালিবে ইলম। পাকিস্তানের মাদরাসাগুলোতে বিভিন্ন প্রদেশের এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ছাত্ররা অধ্যয়ন করে থাকে। তাই এখানেও পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশসহ কাশ্মীর, ইরান, আফগানিস্তান, বার্মা, বাংলাদেশ এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের তালিবে ইলম উপস্থিত ছিলেন। তারা তাদের নিয়ম মাফিক বার্ষিক ছুটির সময় জিহাদ এবং জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য এখানে এসেছেন। স্বীয় উস্তাদদেরকে এখানে উপস্থিত দেখতে পেয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তাদের অধিকাংশের চোখে আনন্দাশ্রু টলমল করছিল। সবাই নিজেদের উস্তাদদের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার জন্য ছিল অস্থির। সে ছিল এক অপূর্ব আবেগঘন পরিবেশ—যার মধুর স্মৃতি সম্ভবত কোনদিন ভুলতে পারবো না। আমরা আমাদের সম্ভাবনাময় তালিবে ইলমদেরকে সুদূরের এই পর্বতসারিতে ঈগলসম মুজাহিদরূপে দেখতে পেয়ে আমাদেরও আনন্দের পরিসীমা ছিল না। মাদরাসার তালিবে ইলম ছাড়াও করাচী ও পাঞ্জাবের অনেক আলিম, কারী এবং সাধারণ নাগরিকও এ মুজাহিদ দলে শামিল ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রায় ন' বছর ধরে নিজের জীবনকে এই জিহাদে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। আমাদের আগমনে তারা সবাই আনন্দাতিশয্যে উচ্ছাসভরে শ্লোগান দিচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল এরা যেন বড় কোন আনন্দ অনুষ্ঠান উদযাপন করছে।

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے
جنہیں تونے بخشا ہے ذوق خدائی
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراء و دریا
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

এঁরা গাজী, এরা তোমার রহস্যপূর্ণ বান্দা,
এঁদের হৃদয়ে তুমি আল্লাহ্‌-প্রেমের স্বাদ ভরে দিয়েছ।
এঁদের আঘাতে মরু ও সাগর বিদীর্ণ হয়ে যায়।
এঁদের প্রভাবে পর্বত সংকুচিত হয়ে সরিষাতুল্য হয়ে যায়।

মুজাহিদদের এই ক্যাম্প সবুজ-শ্যামল প্রশস্ত কয়েকটি টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। টিলাগুলো গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়িয়ে আছে। তারই একটি টিলার উপর খানী কেল্লা নামে ছোট একটি বাড়ী আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। এ বাড়ীতে এখন মুজাহিদরা বসবাস করে। এসব টিলার পূর্ব পার্শ্বে উরগুন উপত্যকা—যা অতিক্রম করে আমরা এখানে এসে পৌছি। উত্তর-দক্ষিণ এবং পশ্চিমে সবুজ-শ্যামল পাহাড়ের দীর্ঘ প্যাঁচানো সারি কয়েক মাইল পর্যন্ত চলে গেছে। খানী কেল্লা নিজেও উঁচু একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।

তরুণ কমাণ্ডার যুবায়ের আহমাদ খালিদ কমাণ্ডের ইউনিফর্মে পরিপূর্ণরূপে সজ্জিত ছিলেন। তিনি এবং তাঁর সাথীরা আমাদেরকে নিয়ে বাড়ীর ছোট কাঁচা আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন। বাড়ীর ডানে বামে এবং সম্মুখে লাকড়ির চালাবিশিষ্ট কয়েকটি কাঁচা কক্ষ রয়েছে। বামদিকের কক্ষগুলোর সম্মুখভাগে ছোট একটি বারান্দাও রয়েছে। এ বারান্দা দ্বারা রান্নাঘরের কাজ নেওয়া হয়। উপর তলায় শুধুমাত্র ডানদিকে একটিমাত্র কক্ষ রয়েছে। সেখানে আরোহণের জন্য সম্মুখের আঙ্গিনার কোণায় মাটির একটি ঢালের মত তৈরী করা হয়েছে। ঢালের মাঝে মাঝে সিঁড়ির ন্যায় ধাপ তৈরী করা হয়েছে। ঢালু এই জায়গাটি উপর তলায় উঠার সিঁড়িরূপে ব্যবহৃত হয়। যখন উপরের কক্ষে এসে পৌছি, তখন পৌনে পাঁচটা বাজে। দস্তরখান বিছানো দেখতে পেয়ে ক্ষুধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আমাদের প্রতীক্ষায় মেজবানরাও দুপুরের খানা খাননি। আমরা বসার পর অনতিবিলম্বে দস্তরখানে খাবার দেওয়া হয়।

মুজাহিদদের খাবার

মুজাহিদ তালিবে ইলমরা খাবার হিসাবে গোশতের তরকারী এবং প্রায় এক গজ ব্যাসের বৃহদাকার অথচ অত্যন্ত পাতলা চাপাতি রুটি ঠিক ঐরূপে তৈরী করেছিল ; বাগাড় ক্যাম্পে আফগান মুজাহিদরা যেরূপ রুটি রান্না করেছিল। আমাদের জন্য বেচারারা কোন রকমে পোলাও রান্না করেছিল। সম্ভবত পোলাও রান্না করার তাদের এটিই প্রথম অভিজ্ঞতা। পাত্রের স্বল্পতাহেতু বড় বড় বাটিতে তরকারী এবং বড় বড় প্লেটে পোলাও দেওয়া হয়, এক একটি পাত্রে কয়েকজন করে সাথী একত্রে আহার করা হয়। ক্ষুধার তীব্রতা এবং আনন্দপূর্ণ পরিবেশে খাবারের স্বাদই আলাদা। জানতে পারলাম যে, মুজাহিদদের জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে গরু ক্রয় করে জবেহ্ করা হয়। তা দ্বারা দু' একদিন চলে যায়। অবশিষ্ট দিনসমূহে গোশতের পরিবর্তে এক বেলা বড় বড় করে কাটা আলুর ঝোল আর অন্য বেলা ডাল পাকানো হয়। কিন্তু আমাদের দু'দিন অবস্থানকালে দু'বেলাই গোশতের তরকারী দেওয়া হয়। তাতে এত ছোট ছোট অনেকগুলো গোশতের টুকরা ছিল, যার একটি টুকরা এক লোকমায় সহজেই খাওয়া যেতে পারে।

আহার শেষ করতেই জামাআতের সাথে আছর নামায আদায় করি। নামাযের পর কফি পান করি। মাওলানা আসআদ সাহেব থানভী এবং কাফেলার অন্যান্য তরুণ সাথী নিশানা বাজির অনুশীলনের জন্য বাইরে চলে যান। মাগরিব পর্যন্ত বিরামহীনভাবে তাদের ফায়ারিংয়ের আওয়াজ আসতে থাকে। হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ্ খান সাহেব হযরত মাওলানা সাহ্‌বান মাহমুদ সাহেব এবং আমি সহ কয়েকজন ঐ কামরাতেই বসে কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব এবং তাঁর সাথীদের থেকে এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হই। পরদিন ভোরবেলা আমাদের নিশানাবাজি অনুশীলন করার ইচ্ছা ছিল।

মুজাহিদদের ক্যাম্পসমূহ

মুজাহিদদের নিকট জানতে পারলাম—একজন আফগান মুসলমান এই বাড়ীর মালিক। যুদ্ধের কারণে নিজের ছেলেমেয়েদেরকে 'বাগাড়' পৌঁছে দিয়ে এই বাড়ী এবং তৎসংলগ্ন জমি তিনি সাময়িকভাবে মাওলানা আরসালান খান রহমানীকে দিয়েছেন। তিনি নিজেও

মুজাহিদদের সাথে এখানেই অবস্থান করেন। মাওলানা আরসালান খান রহমানী—যিনি পাকতিকা প্রদেশের বিখ্যাত বাহাদুর আলিম এবং প্রদেশের মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় কমাণ্ডার—তিনি দয়াপরবশ হয়ে সম্পূর্ণ ক্যাম্পটি পাকিস্তানী মুজাহিদদের সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী'র জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি নিজে আফগান মুজাহিদদের নিয়ে সম্মুখের অপর একটি ক্যাম্পে অবস্থান করেন। আফসোস, মাওলানা সাহেব গজনী গিয়েছেন—যে কারণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হলো না। তাঁর ক্যাম্পের মুজাহিদরাও বর্তমানে এখানে খুবই কম ছিল। কারণ শা'বান মাসে পাকিস্তানের মাদরাসাসমূহের বার্ষিক ছুটি আরম্ভ হতেই এখানে প্রচুর পরিমাণে মুজাহিদ ছাত্র চলে আসে। ফলে আফগান মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য নিজ নিজ গৃহে যাওয়ার সুযোগ হয়। তাদের প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এখানকার বেশীর ভাগ সামরিক তৎপরতা তালিবে ইলমগণই সামলে রাখেন। মাওলানা আরসালান খান রহমানীর স্থলে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর তরুণ কমাণ্ডার জনাব যুবায়ের আহমাদ খালিদের হাতে বর্তমানে এ এলাকার কমাণ্ড রয়েছে। হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর এ ক্যাম্প সাদামাটা একটি ছাউনীর কাজ দিয়ে থাকে। এখানেই মুজাহিদগণ অবস্থান করেন, এখানেই অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে এবং এখানেই মুজাহিদদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।

দুশমনের উরগুন ছাউনীর গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা চৌকি 'জামাখোলা' এখান থেকে উত্তর দিকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আগামীকাল দিনের তৃতীয় প্রহরে সেই চৌকির উপর আক্রমণ করার প্রোগ্রাম রয়েছে। দুশমনের ছাউনী এবং তার নিরাপত্তা চৌকিসমূহের উপর নজরদারী এবং তাদের বিপক্ষে যথাসময়ে তৎপরতা ও আক্রমণ চালনার উদ্দেশ্যে জামাখোলা চৌকির অদূরে পাহাড়ের মধ্যে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর আরেকটি কেন্দ্র রয়েছে। সে জায়গার নাম 'মড়জগাহ'। তার সন্নিকটেই মাওলানা আরসালান খান রহমানীর অপর একটি ক্যাম্প রয়েছে। উক্ত ক্যাম্পদ্বয়ে পুরাতন ও অভিজ্ঞ মুজাহিদদেরকে রাখা হয়। এখানকার মুজাহিদগণ দুশমনের ঘাঁটির একেবারে নিকট পর্যন্ত পাহাড় এবং ময়দানের জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট পরিখা খনন করে মোর্চা বানিয়েছে। পাহাড়ের উপর নিয়োজিত মুজাহিদরা পালাক্রমে দুরবীনের

মাধ্যমে দুশমনের গতিবিধির উপর সর্বদা কড়া নজর রাখে। এমনকি গভীর অন্ধকার রজনীতে প্রচণ্ড তুষারপাতকালেও তাদের উপর নজরদারী অব্যাহত রাখে।

পাকিস্তানের সীমান্ত শহর বাগাড়ের ক্যাম্প থেকে খানি কেল্লা এবং এখান থকে মড়জগাহের ক্যাম্পে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে। তিনটি কেন্দ্রই এভাবে পরস্পরের তাজা সংবাদ পেয়ে থাকে। এ জন্যই কমাণ্ডার যুবায়ের আহমাদ সাহেব কখনোই তাঁর ওয়াকিটকি নিজের কাছ থেকে পৃথক করেন না। এ অঞ্চলে আফগান মুজাহিদদের আরো কয়েকটি সংগঠনের ক্যাম্পও রয়েছে। দুশমনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের আক্রমণ করতে হলে সমস্ত সংগঠন সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা তৈরী করে আক্রমণ করে থাকে।

খানি কেল্লাসহ এখানকার সবগুলো ক্যাম্প সহায় সম্বলহীনতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। মুজাহিদরা এখানে নিজেদের স্থায়ী কোন ক্যাম্প তৈরী করেনি। কারণ, এক অঞ্চল বিজয় হওয়ার পর গেরিলা আক্রমণের ধারাবাহিকতায় এসব ক্যাম্পও সম্মুখে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

گذر اوقات کرلیتا ہے یہ ' کوہ و بیاباں میں
کہ شاہیں کے لئے ذلت ہے کار آشیاں بندی

'পর্বতচূড়ায় ও মরুর বুকে এরা সময় অতিবাহিত করে। আবাস নির্মাণের মত অসার কাজ ঈগলের জন্য অপমানজনক।'

প্রত্যেক অঞ্চলে মুজাহিদরা নতুন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার জন্য এমন নিরাপদ বাড়ীসমূহ পেয়ে যায়, যার অধিবাসীরা হিজরত করে পাকিস্তান চলে গেছে। উরগুন অঞ্চলের মুজাহিদদের এ সমস্ত ক্যাম্পের বর্তমান টার্গেট উরগুন শহর, তার ছাউনী এবং নিরাপত্তা চৌকিসমূহ জয় করা।

اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے
وہ فتح مبین ' فتح مبین' فتح مبین ہے

'আল্লাহর ওয়াদার উপর রয়েছে মুজাহিদদের অবিচল বিশ্বাস। এটিই তাদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয়! সুস্পষ্ট বিজয়! সুস্পষ্ট বিজয়।'

আফগানিস্তানের অবশিষ্ট শহরসমূহের—যেগুলো এখনো আযাদ করা যায়নি—নিকটেও মুজাহিদদের এমন অনেক ক্যাম্প রয়েছে। মুজাহিদরা সেসব ক্যাম্প থেকে দুশমনের চতুর্দিকে নিজেদের বেষ্টনীকে ক্রমান্বয়ে

সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করে চলছে।

আজ ৪ঠা এপ্রিল। করাচী, মুলতান এবং ডেরা ইসমাঈল খানে বেশ গরম দেখে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে 'বাগাড়ের' মতই তীব্র শীত এবং তেমনই ধারালো তুষারবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়া এমন পুলকোদ্দীপক এবং দৃশ্যাবলী এমন নজরকাড়া যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই সফরের যাবতীয় ক্লান্তি বিদূরিত হয়ে যায়।

আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য এবং মুলাকাতের উদ্দেশ্যে আশপাশের কেন্দ্রসমূহ এবং সম্মুখবর্তী মোর্চাসমূহের অনেক মুজাহিদও এখানে এসেছেন। তাদের সঙ্গে আসা একজন সম্ভাবনাময় তালিবে ইলম মৌলভী মুহাম্মাদ ইউনুসও আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে চিত্রালের অধিবাসী এবং দারুল উলূম করাচীর অধ্যয়নরত ছাত্র। সে ১৯৮৫ ঈসায়ীতে রণাঙ্গনে দুশমনের বিছানো মাইন বিস্ফোরণে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং তার একটি চোখও শহীদ হয়। এখন পাথরের তৈরী কৃত্রিম চোখ তার সে চোখের স্থান দখল করে নিয়েছে। তবে এখনো সে বার্ষিক ছুটিসমূহ সম্মুখের মোর্চাগুলোতে অতিবাহিত করে। এরা নিজেদের মোর্চায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে মাগরিব নামাযের কিছুক্ষণ পর আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে। প্রচণ্ড শীতের গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন এই নিশীতে মোর্চায় পৌঁছতে তাদেরকে দুই ঘন্টার গিরিপথ পদব্রজে অতিক্রম করতে হবে। সেখান থেকে পদব্রজেই তারা আজ এখানে এসেছিল। শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের নিকট ছিল দেহ আবৃত করার অপ্রতুল বস্ত্র, আর পায়ে পুরাতন জুতা। কিন্তু তাদের নির্ভীক ও দৃঢ় সংকল্প পদক্ষেপ বলছিল—

شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا
پر دم ہے اگر تو ' تو نہیں خطرہ افتاد

'অধিক উড়ার ফলে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঈগল কখনো ভূপাতিত হয় না। দেহে যতক্ষণ প্রাণবায়ু রয়েছে, ততক্ষণ তার ভূপাতিত হওয়ার কোন আশংকা নেই।'

ছয়টি হেলিকপ্টারের সাথে নাসরুল্লাহর মোকাবেলা

পাকিস্তানী মুজাহিদ নাসরুল্লাহ। বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। নির্ভীক

এ মুজাহিদ একাই ছয়টি রাশিয়ান গানশিপ হেলিকপ্টারকে পরাভূত করে। তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা পূর্বেও করা হয়েছে। এখানেই তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। শীর্ণদেহের ক্ষীণকায় এই তরুণকে দেখে বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, সেই বিরল ও বিস্ময়কর কৃতিত্ব সম্পাদন করেছে এবং সেই শত্রুপক্ষের এত অধিক সংখ্যক ট্যাংক ধ্বংস করেছে যে, মুজাহিদ সাথীরা তাঁকে ট্যাংক সিকান (ট্যাংক সংহারক) আখ্যা দিয়েছে। নীরব প্রকৃতি, কোমল স্বভাব, নিতান্ত সহজ–সরল এবং আপাদমস্তক ভালবাসার অধিকারী এই তরুণ মুজাহিদ যেন প্রাচ্যের কবি মরহুম ইকবালের কবিতায় চিত্রিত সেই 'মর্দে মুমিনের' জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

'মুমিন ব্যক্তি বন্ধুদের আসরে রেশমের ন্যায় কোমল, আর হক ও বাতিলের লড়াইয়ে ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ়।'

আমি তাকে হেলিকপ্টারের সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের ঘটনাটি শোনানোর জন্য অনুরোধ করি। ইতিপূর্বে আমি এক জায়গায় উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত মুজাহিদকে ইখলাস ও বিনয়ের এমন মহান দৌলত দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন যে, লৌকিকতা, প্রদর্শন প্রবৃত্তি এবং যশ ও খ্যাতির প্রতি মোহের হীন মনোবৃত্তি তাঁদের আঁচলকে কালিমা লিপ্ত করতে পারেনি। এঁরা নিজেদের কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাবলী শোনানোকে এড়িয়ে চলে। প্রত্যেক মুজাহিদ অন্য মুজাহিদের কৃতিত্বের দাস্তান শোনালেও নিজেরটা শোনায় না। নাসরুল্লাহও আমাদের অনুরোধের উত্তরে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য বলে নীরব হয়ে যায়।

প্রাচ্যের কবি মরহুম ইকবাল প্রেমিকসুলভ ঢংয়ে মর্দে মুসলমানের যেই গুণাবলী বর্ণনা করেছেন—তার চারটি এই—

اس کی امیدیں قلیل ' اس کے مقاصد جلیل

اس کی ادا دل فریب ' اس کی نگہ دل نواز

'তার আশা অল্প, তার উদ্দেশ্য মহান। তার অঙ্গভঙ্গী হৃদয়গ্রাহী, তার দৃষ্টি মনকাড়া।'

নাসরুল্লাহকে আমি এই গুণ চতুষ্টয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা যে প্রশ্নই করতাম, সে তার উত্তরে হাঁ বা না বলে নিরব হয়ে যেত, কিন্তু আমি তাঁর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকি। আধা ঘন্টার অবিরাম পরিশ্রমের ফলে ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি তা নিম্নে সাজিয়ে লিখছি।

সে বলল—কয়েক বছর আগের ঘটনা। আমি আমার সংগঠনের আমীর সাহেব এবং তাঁর কয়েকজন সহচরকে নিয়ে একটি পিকআপযোগে 'বাগাড়' থেকে উরগুনের ক্যাম্পে এসে পৌঁছি। রাত তখন তিনটা। এখানে পৌঁছে অবগত হই যে, এখনই আমাকে 'বাগাড়' ফিরে গিয়ে সেখান থেকে আরো কিছু মুজাহিদকে নিয়ে আসতে হবে। কাজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক করার। আমি অনতিবিলম্বে একজনকে সাথে নিয়ে 'বাগাড়' অভিমুখে যাত্রা করি। অর্ধেক পথে 'রিবাত' নামক একটি অঞ্চল রয়েছে। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে যায়। সে সময় রাশিয়ার গানশিপ হেলিকপ্টার মুজাহিদদের জন্য ওৎ পেতে থাকত। সর্বদা তাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা ছিল। তাই আমরা পিকআপটিকে একটি টিলার আড়ালে পাহাড়ী খালের মধ্যে খাড়া করে ফজর নামায আদায় করি। বিরামহীন কর্মব্যস্ততার কারণে রাতে খানা খাওয়া হয়নি। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা ছিল, সঙ্গে যা ছিল তাই খেতে আরম্ভ করি। ইতিমধ্যে হেলিকপ্টারের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। আমার সঙ্গীটি দেখার জন্য দ্রুত সম্মুখের টিলার উপর আরোহন করে। তাড়াহুড়ার ফলে সে ক্লাশিনকোভও সঙ্গে নেয়নি। সে চূড়ার নিকট পৌঁছতেই আকাশে ছয়টি হেলিকপ্টার আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ক্লাশিনকোভ এবং পাশে যতগুলো ম্যাগজিন ছিল তা হাতে নিয়ে দ্রুত ঐ টিলাতে আরোহণ করি। কিছুটা উপরে উঠে বড় একটা পাথরের আড়ালে পজিশন নিয়ে বসে পড়ি।

হেলিকপ্টারগুলো আমাকে দেখে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে সেগুলো মাথার উপর এসে পড়ে। সম্মুখে এসে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ শুরু করে। আমি ছিলাম পাথরের আড়ালে। সেখান থেকেই আমি ফায়ার করতে থাকি। সে সময় ফায়ার করা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের হুঁশ আমার ছিল না। আমার সাথীটি কোথায় আছে এবং কি অবস্থায় আছে, সে খবরও আমার ছিল না। অকস্মাৎ আমার এক বা একাধিক গুলি একটি

হেলিকপ্টারকে আঘাত করে এবং দেখতে দেখতে তা ভূপাতিত হয়। হেলিকপ্টারটিতে আগুন জ্বলে ওঠে। হেলিকপ্টারের পাইলটটিও সম্ভবত জাহান্নামে পৌঁছে যায়। কারণ তার মধ্য থেকে কাউকে আমি বাইরে বের হতে দেখিনি। অবশিষ্ট পাঁচটি হেলিকপ্টার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে অবতরণ করে। তার মধ্য থেকে সৈনিকরা বাইরে বের হয়ে এসে কিছু জ্বলন্ত হেলিকপ্টারের দিকে অগ্রসর হয়, আর বাকিরা ফায়ার করতে করতে আমার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ইউনিফর্ম দেখে মনে হচ্ছিল তারা সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসার। আমি তাদের দিকে এলোপাতাড়ি ফায়ারিং আরম্ভ করি এবং ম্যাগজিনের সবকয়টি গুলি একবারে বর্ষণ করি। যার আঘাতে কয়েকজন সৈনিককে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়তে দেখি। তারপর কি হল—তা আমি বলতে পারব না। আমি অচেতন হয়ে পড়ি।

আল্লাহ জানেন কত ঘন্টা পর সম্বিত ফিরে পাই। সম্বিত ফিরে এলে আমি নিজেকে একটি কাঁচা কক্ষের চৌকির উপর আবিষ্কার করি। আমি তখন কম্বলাবৃত ছিলাম। হঠাৎ রানে তীব্র ব্যথা অনুভব করি। তাকিয়ে দেখি রক্তাক্ত কাপড়ের পট্টি দ্বারা আমার রান বাঁধা রয়েছে। সম্মুখে একজন তরুণ বসা ছিল। ধীরে ধীরে আমার স্মৃতি ফিরে আসতে আরম্ভ করে। তখন আমার সফরসঙ্গীর কথা স্মরণ হয়। তার পরপরই সেই ছয় হেলিকপ্টারের ঘটনাও স্মরণ হয়। আমি উঠে বসতে চাইলে মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। সম্মুখে উপবিষ্ট তরুণটি তৎক্ষণাৎ উঠে এসে আমার মাথায় তার তার হাত রাখে। সে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—'তোমার তীব্র জ্বর। আরামে শুয়ে থাক। ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।' আমি আমার সেই সাথী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তরুণটি বাইরে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাকে ডেকে নিয়ে আসে। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক ভিতরে প্রবেশ করে। আমার সঙ্গীকে জীবন্ত এবং সহীহ সালামতে দেখে আমার আনন্দের পরিসীমা রইল না। কিন্তু আমার রানের ব্যথা প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা আমাকে বললেন—আমি 'রিবাতের' একটি হোটেলে রয়েছি।

আমার সঙ্গী আমাকে মুবারকবাদ জানায় এবং বলে যে, তুমি যখন হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত কর এবং অবশিষ্ট সৈন্য তোমার দিকে অগ্রসর হয়, তখন তোমার গুলিতে কয়েকজন সৈনিক তখনই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু

সাথে সাথে তোমার দিক থেকে ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমি ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার হাত ছিল খালি। আমি পাহাড়ের চূড়ার নিকট বড় একটি পাথরের আড়াল থেকে দুশমনের সমস্ত অবস্থা দেখছিলাম। দুশমন আমাকে দেখতে পায়নি। সৈন্যরা তোমার দিকে অগ্রসর হতে হতে ফায়ার করে। পরে জানতে পারি যে, তোমার রানে একটি গুলি লাগে। তার আঘাতে তুমি বেহুঁশ হয়ে যাও। সৈন্যরা তোমাকে মৃত মনে করে ফিরে চলে যায়। দ্রুত তাদের সাথীদের লাশ এবং আহত সৈন্যদেরকে হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে আকাশে উড়ে যায়। আমি সাথে সাথে নিচে নেমে তোমার নিকট আসি। রান থেকে খুন প্রবাহিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে 'রিবাতের' লোকজন এসে সমবেত হয়। আমরা তোমার রানে পট্টি বেঁধে এখানে নিয়ে আসি। আঘাত মারাত্মক নয়, ইনশাআল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।

নাসরুল্লাহ জানালো, তার রানের হাড্ডি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাকে পাকিস্তান এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ফযল ও করমে তাকে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ করে পুনরায় রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেন। সে বলে—এখান থেকে ফিরে যেতে মন চায় না। মা-বাবা আমাকে বিবাহ করাতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার মন চায় বিবাহের পূর্বে উরগুন বিজয় হয়ে যাক। আমি নাসরুল্লাহর মধ্যে সেই ঈর্ষণীয় গাজীর দীপ্তি দেখতে পাই যাঁর স্তূতিগাঁথায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يَطِيْرُ عَلٰى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ –

অর্থ ঃ মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম অবস্থাসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম এই যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বীয় অশ্বের বাগ ধারণ করে তাতে আরোহণ করে ধেয়ে চলছে। যখনই (দুশমনের) ভয়ংকর আওয়াজ কিংবা (কোন মজলুমের) আহবান শুনতে পায়, তখন সেই মৃত্যু এবং হত্যার সুযোগ সন্ধান করতে করতে সেখানে উপনীত হয়। (সহীহ মুসলিম)

আমি এবং মুজাহিদগণ

তারা তো মাশাআল্লাহ নিজেদের যৌবনের যাবতীয় শক্তি জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। আমার মত স্বল্প সাহসী, কোমরের ব্যথায় আক্রান্ত রোগী তাদের মত উচ্চ সাহসের আশা কি করে পোষণ করতে পারি? কিন্তু মনের আকুল আকাংখা তাঁদের সঙ্গে এই পবিত্র জিহাদে বেশী না হোক অল্প কয়েকটি লড়াইতেও যদি অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়।

ہاں راہ تیری اور میری منزل غم اور
دوگام ہی مل جائے شرف ہم سفری کا

'হ্যাঁ, তোমার পথ ভিন্ন, আর আমার বিষাদময় গন্তব্যও ভিন্ন। তবুও দুই মুহূর্তের জন্যও যদি তোমার সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হত!'

কেননা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও জিহাদে সামান্যতম অংশ নেওয়া ছাড়াই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়—

مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسِهِ، مَاتَ عَلَي شُعْبَةٍ مِّنْ نِّفَاقٍ-

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে কখনো জিহাদও করল না এবং অন্তরে জিহাদের ইচ্ছাও পোষণ করল না তাহলে সে এক প্রকারের নেফাকের উপর মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম শরীফ)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন—

مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ اَثَرٍ مِّنْ جِهَادٍ ، لَقِيَ اللّٰهَ وَ فِيْهِ ثُلْمَةٌ -

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের কোন চিহ্ন না নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে তার মধ্যে একপ্রকার ত্রুটি থাকবে। (তিরমিযী শরীফ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ তো দেহে ভীষণ কম্পন সৃষ্টি করে—

مَنْ لَمْ يَغْزُ اَوْيُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلِفْ غَازِيًا فِي اَهْلِهِ بِخَيْرٍ، اَصَابَهُ

اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কখনো জিহাদ করল না, কিংবা কোন মুজাহিদের সামানের ব্যবস্থা করল না কিংবা কোন মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার পরিজনের দেখাশোনাও করল না, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের পূর্বেই কোন বিপদে নিপতিত করবেন।

(আবূ দাউদ শরীফ)

এমতাবস্থায় মহান আল্লাহর বিরাট করুণা যে, তিনি এসব মুজাহিদদের উসীলায় আমার মত অধমকেও রণাঙ্গনে আসার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহর অফুরন্ত রহমতে এটি কোন কঠিন ব্যাপার নয় যে, তিনি তাদের সঙ্গে হাশরেও আমাকে উঠাবেন। হযরত মুর্শিদ আরেফীর ভাষায়—

اک توشہ امید کرم لے کے چلا ہوں

کچھ اس کے سوا پاس نہیں زاد سفر اور

'একমাত্র তাঁর করুণার আকাংখাকে পাথেয় বানিয়ে পথ চলছি, এছাড়া আমার নিকট আর কোন পথসম্বল নেই।'

একটি বেদনা

কিন্তু একটি সমস্যা এই দেখা দেয় যে, সফর সম্পর্কে মুজাহিদদের থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা থেকে আমরা একটি ভুল অনুমান করেছিলাম যে, করাচী থেকে এখান পর্যন্ত পৌঁছতে একদিন এক রাত লাগবে। এই ভুল অনুমানের ভিত্তিতে আমরা সমগ্র সফরের জন্য মাত্র সাতদিন সময় নিয়ে বের হই। আসতে যেতে দু'দিন ব্যয় হবে, আর রণাঙ্গনে পাঁচ দিন থাকা যাবে। এভাবে এখানকার কয়েকটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাব বলে আশা ছিল। এই ভুল অনুমানের ভিত্তিতে ডেরা ইসমাঈল খান থেকে মুলতান এবং সেখান থেকে করাচীর শুক্রবারের প্লেনে ফিরতি সিটও বুকিং করিয়েছিলাম। শুক্রবার দিন করাচী প্রত্যাবর্তন করব এর ভিত্তিতে দারুল উলূম করাচী মাদরাসার পরিচালনা কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংও আহবান করা হয়েছিল। সদস্যদেরকে মিটিংয়ের ব্যাপারে অবহিতও করা হয়েছিল। কিন্তু করাচী থেকে এখানে পৌঁছতে তিনদিন ব্যয় হবে সে কথা পথিমধ্যে এমন সময়

জানতে পারি, যখন প্লেনের সিটের তারিখ পরিবর্তনও সম্ভব ছিল না এবং করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য মিটিং এর তারিখেও রদবদল করা সম্ভব ছিল না। বিধায় ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আমরা শনিবার সকালে করাচী থেকে রওনা করে আজ সোমবার সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছি। এবং ডেরা ইসমাঈল খান থেকে জুমুআর দিন সকালে প্লেন ধরার জন্য বুধবার দিন সকালে এখান থেকে আমাদের রওয়ানা হওয়া আবশ্যক। বিধায় এখানে অবস্থানের জন্য শুধুমাত্র আজ সন্ধ্যা থেকে পরশু বুধবার সকাল পর্যন্ত সময় হাতে পাই। কবিতার এই পংক্তিটি কখন কোথায় পড়েছিলাম তা মনে নেই, কিন্তু এর পরিপূর্ণ অর্থ এখানে এসেই উপলব্ধি করলাম।

یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ را ہم دور شد

এক মুহূর্তের জন্য গাফেল হয়েছি, ফলে একশত বছরের জন্য পিছিয়ে পড়েছি।'

এই সেই বেদনা, যা সারা সফরে অন্তরে কাঁটার ন্যায় বিঁধতে থাকে। এ সময় তার কয়েক মাস পর যখন একথাগুলো লিপিবদ্ধ করছি, এখনো সেই বেদনা কাঁটা হয়ে বিঁধছে। তবে হযরত আরেফী (রহঃ)এর এই কবিতা কিছু সান্ত্বনা যোগায়—

رہرو عشق نا امید نہ ہو
داغ حسرت نشان منزل ہے

'প্রেমপথের পথিক নিরাশ হইও না।
কারণ, আক্ষেপের ক্ষত গন্তব্যের চিহ্ন।'

এ বেদনাকেও আমি আল্লাহর পক্ষ হতে নেয়ামত মনে করি। মুর্শিদ আরেফী বলেছেন—

اے بیخودی یاس! نہ مٹ جائے کہیں آہ
یہ ایک خلش درد ' جو ہے جان تمنا

'হে মত্ততা ! নৈরাশ্য যেন বিলুপ্ত হয়ে না যায়। প্রেমের এই একটি মাত্র
বেদনা আমার হৃদয়ের বাসনা।'

সংক্ষিপ্ত এই অবস্থানকালের প্রোগ্রাম এই ছিল যে, কাল প্রত্যুষে নাস্তার পর আমাদের আগমনের আনন্দ উপলক্ষে মুজাহিদদের কুচকাওয়াজ ও সামরিক নৈপুন্যের প্রদর্শন এবং একটি সমাবেশ

অনুষ্ঠিত হবে। তারপর আমাদেরকে নিশানাবাজির অনুশীলন করতে হবে। যোহর নামাযের পর দুশমনের এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ নিরাপত্তা চৌকি জামাখোলার উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা করতে হবে। আক্রমণের প্রোগ্রাম কমাণ্ডার যুবায়ের আহমাদ সাহেব পূর্বেই সম্পন্ন করে রেখেছেন। কেননা আমরা এখানে আসার জন্য এ শর্তটিই করেছিলাম যে, আমরা এমন সময় আসব, যখন কোন লড়াই হবে এবং আমরা তাতে কার্যত অংশগ্রহণ করতে পারব। সাধারণ অবস্থায় আক্রমণের প্রোগ্রাম অত্যন্ত গোপন রাখা হয়, যাত্রাকালেও সচরাচর মুজাহিদদেরকে বলা হয় না যে, কোথায় যাওয়া হবে। যেন দুশমনের গুপ্তচররা গন্তব্য সম্পর্কে জানতে না পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন, তবে আমাদের সঙ্গে উদারতা দেখিয়ে আজই প্রোগ্রামের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

রাতের পাহারাদারী

এশার পূর্বে হঠাৎ স্মরণ হল যে, ক্যাম্পের নিরাপত্তার জন্য রাতে অবশ্যই পাহারার ব্যবস্থা থাকবে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এশার পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত মুজাহিদদের কয়েকটি দল পালাক্রমে দুই ঘন্টা করে এই খেদমত সম্পাদন করে থাকে। এই খেদমতকে শরীয়তের পরিভাষায় 'রিবাত' বলা হয়। হাদীস শরীফে এর অনেক গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। এতদসংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে 'পাকিস্তানী সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' শিরোনামে র উদ্ধৃত করেছি।

লড়াই চলাকালীন অবস্থায় সেনা ক্যাম্প পাহারা দেওয়ার একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে—শহীদে মিল্লাত খান লিয়াকত আলী খান মরহুমের শাসনকালে যখন আমরা স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্তি হয়ে জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলাম, তখন করাচীর বাইরে 'মংঘু পীরের' পিছনের পাহাড়ের মধ্যে সামরিক অনুশীলনের উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য কয়েক দিনের ক্যাম্প বসানো হয়। সেখানে পাহারা দেওয়ার সেই বিশেষ পদ্ধতির অনুশীলনও করা হয়েছিল—সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আমি এবং কিছু তরুণ সাথী আজ রাত দশটা থেকে বারটা পর্যন্ত পাহারা দেওয়ার জন্য নিজেদের নাম লেখাই।

মুজাহিদদের পোষাক রঙ্গিন হয়ে থাকে। সামরিক তৎপরতা এবং রাতের পাহারা দেওয়া ইত্যাদি কাজে এর উপকার এই হয় যে, দূর থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। রাত্রিবেলা তো নিকট থেকেও অতি কষ্টেই তা দৃষ্টিগোচর হয়। মুজাহিদদের পশমী গোলটুপিও রঙ্গীন এবং শানদার হয়ে থাকে। সেগুলো এখানকার আবহাওয়ার এবং সামরিক তাৎপরতার জন্য খুবই উপযোগী। জনাব শাহেদ মাহমুদ সাহেব আফগানিস্তানে প্রবেশ করার পূর্বেই আমাকে এমন একটি টুপি দান করেছিলেন। এখানে সেটিই ব্যবহার করতে থাকি। এশার নামায এবং রাতের আহার সমাপ্ত করে সেই টুপি এবং আমার পশমী মোটা জুব্বাটি পরিধান করি। আমার পরিধানকৃত সাদা কাপড়ও তার মধ্যে ঢেকে যায়। ম্যাগজিনের বক্ষবন্ধনী কষে বাঁধি। ক্লাশিনকোভ সাথে নিয়ে দশটার সময় ডিউটিতে পৌঁছে যাই।

ক্যাম্প পাহারা দানের বিশেষ পদ্ধতি

কারী নেয়ামতুল্লাহ সাহেব প্রহরীদের কমাণ্ডার নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সবাইকে পাহারাদানের পদ্ধতি বুঝিয়ে দেন। আজ রাতের নির্দিষ্ট কোড ওয়ার্ড (প্রতীকী শব্দ) জানিয়ে দেন। নিয়ম এই যে, প্রতি রাতে নিজেদের ক্যাম্পের লোকদের প্রতীকরূপে কোন কোর্ডওয়ার্ড নির্ধারিত করে তা সকল প্রহরী এবং সংশ্লিষ্ট লোককে বলে দেওয়া হয়। যেমন—কিতাব, লাকড়ী, গোলাপ, মুলতান কিংবা অন্য কোন শব্দ। ক্যাম্পের বাইরের কোন ব্যক্তি যেন আজ রাতের নির্দিষ্ট প্রতীকী শব্দ অবগত হতে না পারে সে ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেক প্রহরীর সীমানা নির্দিষ্ট থাকে যে, সে এখান থেকে ঐখান পর্যন্ত পাহারা দিবে। তার অবশ্য কর্তব্য হলো—সে কোন শব্দ শুনতেই কিংবা কোন অস্বাভাবিক বস্তুকে নড়াচড়া করতে দেখলেই অনতিবিলম্বে পজিশন গ্রহণ করে তার দিকে রাইফেল তাক করে গম্ভীর আওয়াজে তাকে বাধা প্রদান করে নির্দেশ দিবে যে, 'উভয় হাত উপরে উঠাও, অন্যথায় গুলি করব।' যদি সে হাত না উঠায় তাহলে গুলি করবে। আর হাত উঠালে তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, 'তুমি কে?' উত্তরে সে যদি নির্দিষ্ট সেই প্রতীকী শব্দ বলে দেয় তাহলে তা এর নিদর্শন যে, এ নিজেদের লোক। বিধায় তাকে সসম্মানে নিকটে আহবান করে তার মর্যাদা অনুপাতে আচরণ করবে। আর যদি সে ঐ প্রতীকী শব্দ বলতে না পারে তাহলে এটি তার অন্য লোক হওয়ার

নিদর্শন হবে। তাই তার দিকে রাইফেল তাক করে রেখে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার তল্লাশী নিবে। কোন অস্ত্র বের হলে নিজের অধিকারে নিয়ে নিবে। তারপর তাকে রাইফেলের মুখে সম্মুখে হাঁটিয়ে ক্যাম্পের মধ্যে নিয়ে আসবে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অন্যদের হাতে ন্যাস্ত করবে।

আমার পূর্ব থেকেই এ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল। পার্থক্য ছিল এই যে, প্রহরী তার সম্মুখের লোকের সাথে যে কথপোকথন করে তা আমাদেরকে ইংরেজী ভাষায় শেখানো হয়েছিল, আর এখানে শেখানো হয় পশতু ভাষায়।

প্রহরীদের কমাণ্ডার সাহেব আমাকে নির্দিষ্ট কোন এলাকার পাহারাদানের কাজে নিয়োজিত না করে, একথা বলে তাঁর সঙ্গে নিয়ে নেন যে, 'আমরা উভয়ে প্রহরীদের কাজের তত্ত্বাবধান করব।'—রাত এগারটার কাছাকাছি আকাশে অনেক উঁচুতে নক্ষত্রের মত একটি আলোর নড়াচড়া চোখে পড়ে। কারী সাহেব বললেন—এটি যাত্রীবাহী বিমান। কাবুল থেকে দিল্লী যাচ্ছে। আমরা যাত্রীবাহী বিমানকে টার্গেট বানাই না। তাই বিমানটি এখন এদিক দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে যাচ্ছে।

কারী সাহেব কোন কোন প্রহরীকে পরীক্ষা করেও দেখেন। মাশাআল্লাহ তারা পরিপূর্ণ সচেতন ও প্রস্তুত ছিল। তারা আমাদেরকে দেখেই দূর থেকে গর্জে ওঠে এবং বাধা দেয়। পজিশন গ্রহণ করে আমাদের উভয়ের হাত উপরে উঠায়। নাম জিজ্ঞাসা করে। আমরা যখন নির্দিষ্ট প্রতীকী শব্দ বলি, তখন কাছে এসে সসম্মানে সালাম করে ডিউটিতে চলে যায়।

রাসূল (সাঃ)এর যুগে কোর্ডওয়ার্ডের ব্যবহার

সেনা ক্যাম্পের পাহারাদান ইত্যাদিতে কোর্ডওয়ার্ডের ব্যবহারকে সম্ভবত আধুনিক যুগের আবিষ্কার মনে করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জিহাদে কোর্ডওয়ার্ড ব্যবহারের প্রচলন ছিল। তখন কোর্ডওয়ার্ডকে 'শিআর' বলা হত। মেশকাত শরীফে (বাবুল কিতাল ফিল জিহাদ) আছে যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُّ، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ -

অর্থ ঃ দুশমন যদি আজ রাতে আক্রমণ করে তাহলে তোমাদের 'শিআর' (কোর্ডওয়ার্ড) হবে حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ (হামীম লা ইউনছারুন)।
(তিরমিযী শরীফ)

মেশকাত শরীফের একই অধ্যায়ে আরেকটি হাদীস আছে—

كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدُ اللّٰهِ وَ شِعَارُ الْاَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ-

অর্থ ঃ (এক সময়) মুহাজিরদের শিআর (কোর্ডওয়ার্ড) 'আবদুল্লাহ' এবং আনসারদের শিআর (কোর্ডওয়ার্ড) 'আবদুর রহমান' নির্ধারিত করা হয়। (আবু দাউদ শরীফ)

এ অধ্যায়েই হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা আবূ বকর (রাযিঃ)এর সঙ্গে জিহাদে যাই এবং দুশমনের উপর রাতে আক্রমণ করি। তারপর তিনি বলেন—

وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ اَمِتْ اَمِتْ

অর্থ ঃ সে রাতে আমাদের শিআর (কোর্ডওয়ার্ড) ছিল امت امت ('আমিত' 'আমিত') (আবু দাউদ)

রাত বারটার কাছাকাছি সময় কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেবও আমাদের সঙ্গে টহলের কাজে শামিল হন। আমরা তাঁর নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ লড়াইয়ের ঘটনা শুনতে থাকি। এই ঘটনাপ্রবাহ এত আকর্ষণীয় ছিল যে, কখন যে রাত একটা বেজে যায় তা আমরা বুঝতেই পারিনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর থেকে বিদায় গ্রহণ করে কক্ষে ফিরে আসি। কক্ষের অপরাপর প্রায় দশজন সাথী ঘুমিয়ে ছিল। আমিও আমার জন্য বিছানো স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ি। আগামীকাল যে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করতে যাচ্ছিলাম, তার কল্পনায় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আত্মবিস্মৃত হয়ে যাই।

جلوہائے عالم حیرت سے دل لبریز ہے
اللہ اللہ ! بے خودی بھی کیا تصور خیز ہے

'বিস্ময়ের জগত দর্শনে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ।
হায় আল্লাহ ! আত্মহারা হওয়াও কত কল্পরূপের উদ্রেক করে।'

১৭ই শাবান ১৪০৮ হিজরী
৫ই এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী, মঙ্গলবার

প্রত্যুষে যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন তুষারাচ্ছন্ন খোলা আকাশে একজন মুজাহিদের আযান গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

حَيَّ عَلَي الْفَلَاحِ এবং حَيَّ عَلَي الصَّلٰوةِ এর আবেগ উদ্দীপক শব্দাবলী আহবান জানাচ্ছিল—

مسلم خوابیدہ اٹھ ' ہنگامہ آرا تو بھی ہو
وہ چمک اٹھا افق ' گرم تقاضا تو بھی ہو

'হে নিদ্রামগ্ন মুসলমান! জেগে ওঠ, তুমিও তৎপর হও! দেখ! দিগন্ত জ্বলে উঠেছে, তুমিও তেজোদ্দীপ্ত হও।'

মুজাহিদরা নিজেরা সরঞ্জামহীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আরামের ব্যবস্থা করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। প্রত্যেক নামাযের সময় গরম পানি দ্বারা উযু করানোর জন্য প্রত্যেক মেহমানের নিকট একজন করে মেজবান পৌঁছে যেতেন। তাঁরা নিজেরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে বনে যেতেন। কিন্তু আমাদের জন্য তাঁরা তুষারবায়ু থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাইরে একটি অস্থায়ী 'বাইতুল খলা' তৈরী করেছিলেন। তার পরিস্কারের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিও তাঁদেরই আবিস্কৃত ছিল।

শীত ছিল তীব্র। ফজর নামাযান্তে আমরা আমাদের কক্ষেই অবস্থান করি। কিন্তু জানতে পারলাম যে, কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব প্রশিক্ষণরত মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ে চলে গেছেন। সেখানে তাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এটি তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

আমরা নাস্তার কাজ রাতের বেঁচে যাওয়া তরকারী, চাপাতি এবং বিস্কুট দ্বারা পূর্ণ করি। চা পান করে বাড়ীর বাইরে বের হয়ে কাম্পের সবাইকে কমাণ্ডার সাহেবের জন্য প্রতীক্ষারত দেখতে পাই। তিনি নয়টার সময় এখানে এসে পৌঁছবেন। ঠিক নয়টার সময় একটি টিলার উপর থেকে তিনি এবং তাঁর বাহিনী দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে ডবল মার্চ করতে করতে আত্মপ্রকাশ করেন। অপূর্ব ভাবময় ছিল সে দৃশ্য। দেখতে দেখতে ইউনিফর্ম পরিহিত দূরন্ত সেই বাহিনী আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। এ বাহিনীরই একজন তরুণ মুজাহিদের দিকে ইশারা করে জনৈক

ব্যক্তি বললেন যে, 'এটি কারী সাঈদুর রহমান সাহেবের ছেলে।' কারী সাঈদুর রহমান সাহেবের সঙ্গে অধমের অতি পুরাতন আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। মাশাআল্লাহ তিনি নিজেও অত্যন্ত গুণধর ব্যক্তিত্ব। [১] এবং একজন অতি মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব কামেলপুরী (রহঃ)এর সুযোগ্য সন্তান। হযরত মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)এর খলীফা ছিলেন। কারী সাহেবের কলিজার টুকরাকে এই পর্বতের দেশে ঈগলের ন্যায় মুজাহিদরূপে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হই। পিতা-পুত্র উভয়ের জন্য মনের মণিকোঠা হতে দুআ করি।

প্রায় পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত মুজাহিদরা কুচকাওয়াজ এবং সামরিক নৈপুণ্যের আবেগোদ্দীপক কলাকৌশল প্রদর্শন করে। পাহাড়ের উপর রশির ফাঁদ নিক্ষেপ করে তা বেয়ে পর্বতারোহন করার প্রতিযোগিতা ছিল তার মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয়। তাতে আমাদের কাফেলার এক তরুণ সাথী হারুন সাহেব—যিনি করাচী থেকে এই প্রথমবার রণাঙ্গনে এসেছেন—শুধু অংশই গ্রহণ করেননি বরং প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন।

جھپٹنا ' پلٹنا ' پلٹ کر جھپٹنا

لہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ

'লাফ দেওয়া, পল্টি খাওয়া, পল্টি খেয়ে আবার লাফ দেওয়া—দেহের খুন তপ্ত রাখার একটি বাহানা মাত্র।'

পত্রপত্রিকায় মুজাহিদদের আক্রমণের সংবাদ পাঠ করে বোধগম্য হত না যে, সুউচ্চ এসব পাহাড়ের উপর তোপ নিয়ে তারা কিভাবে আরোহণ করে? এবং এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে এগুলোকে কিভাবে স্থানান্তরিত করে! এই প্রদর্শনী দেখে তার উত্তরও পেয়ে যাই। আমাদের সম্মুখে কয়েক প্রকারের তোপ বসানো ছিল। মর্টার তোপ, এন্টি এয়ারক্রাফট ইত্যাদি। প্রত্যেক তোপের নিকট দুই তিনজন করে মুজাহিদ

---

১. এখন যখন এই প্রবন্ধ ছাপার জন্য যাচ্ছে—আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে কারী সাহেব ১৯৮৮ ঈসায়ীর নভেম্বরের নির্বাচনে পাঞ্জাব এসেম্বলীর রোকন নির্বাচিত হয়ে প্রাদেশিক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দেশ ও জাতির অধিক থেকে অধিকতর খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

চলে যায় এবং ঘড়ি দেখে নির্দিষ্ট মিনিটের মধ্যে তার একেকটি অংশ খুলে ফেলে। তারপর প্রত্যেকটি তোপকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পুনরায় জোড়া লাগিয়ে মোর্চায় বসিয়ে দেয়। এসব মুজাহিদ ঐ সমস্ত মাদরাসারই তালিবে ইলম, যাদের সম্পর্কে সাধারণত বলা হয় যে, এরা নিজেদের কিতাব ছাড়া অন্য কিছুর খবর রাখে না। কিন্তু যারা জড়বস্তুর ওপারে দৃষ্টি দিতেই অনিহা পোষণ করে থাকে ; তারা কি করে বুঝবে—

"ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مؤمن کا ہاتھ"

'মুমিন বান্দার হাত সে তো আল্লাহর হাত।'

এটি দেখে আমার আনন্দপূর্ণ বিস্ময় জাগছিল যে, কমাণ্ডার সাহেব এবং তাঁর সঙ্গের মুজাহিদগণ ফজরের নামাযের পর থেকে এখন পর্যন্ত ক্লেশপূর্ণ কাজে নিমগ্ন ছিলেন। সম্ভবত তাঁরা নাস্তাও করেননি। কিন্তু অশুভ দৃষ্টি থেকে আল্লাহ রক্ষা করুন—তাঁদের ইস্পাতসম দেহ ক্লান্তির যাবতীয় চিহ্ন থেকে মুক্ত, এবং মুখমণ্ডল গোলাপের ন্যায় সজীব ছিল। হে আল্লাহ ! তুমি তাঁদের রক্ষা কর।

কমাণ্ডার যুবায়ের আহমাদ খালিদ

বিশেষত কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেবের সদা হাস্যোদ্দীপ্ত প্রশান্তিময় অবয়ব দেখে কেউ তো বলতেই পারবে না যে, তিনি রাতেও একটার পর পর্যন্ত পাহারাদানের কাজে টহল রত ছিলেন এবং আজই তাঁকে দুশমনের উপর আক্রমণের কমাণ্ডও করতে হবে। প্রাণান্তকর এই কর্মতৎপরতার সাথে সাথে 'ওয়াকিটকি' কখনো তাঁর কানের উপর এবং কখনো তাঁর মুখের উপর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তিনি সম্মুখের মোর্চাসমূহ এবং পশ্চাতের 'বাগাড়ে'র ক্যাম্পের সাথে ধারাবাহিক সংযোগ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবং আজ তৃতীয় প্রহরে দুশমনের উপর যে আক্রমণ চালানো হবে, সে সম্পর্কে তাদেরকে কিছুক্ষণ পরপর ওয়ারলেস যোগে নির্দেশনা দান করছিলেন।

কৃশকায় দেহের ২৫ বছর বয়সী এই তরুণ কমাণ্ডারের বিবাহ হয়েছে মাত্র দেড় বছর পূর্বে। জিহাদের প্রেম, শাহাদাতের উদগ্র বাসনা, দেশ ও জাতির ভালবাসা, অবিরাম কায়ক্লেশ, আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা এবং রণাঙ্গনের দীর্ঘ আট বছরের শীত ও তাপ বিদ্যুৎসম এই মুজাহিদকে পোক্ত ও অভিজ্ঞ সিপাহসালারে পরিণত করেছে। তিনি আফগানিস্তানের

জিহাদের কাজে ইতিপূর্বেও দারুল উলূম করাচীতে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ঈর্ষণীয় গুণাবলী এবং সিপাহসালারসুলভ যোগ্যতার সুপ্ত প্রতিভা এখানেই বিকশিত হয়। মাঝারী গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামলা গায়ের রং, স্কন্দ স্পর্শী কেশদাম, বীরত্ব ও পৌরুষের প্রতীক, ঈগলের ন্যায় প্রখর দৃষ্টি, চালচলনে সুন্নাতের উদ্ভাস, মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাসি, ধীর ভঙ্গি, জ্বালাময় ও মধুবর্ষী কথপোকথন, বিনয় ও নম্রতা, সর্বদা গামবুটসহ ইউনিফর্ম পরিহিত, সদা সশস্ত্র ও সদা প্রস্তুত, হস্তে ধারণকৃত ওয়াকিটকি, নিজের সিপাহীদের জন্য মনেপ্রাণে অনুরক্ত, রণাঙ্গনে তাদের মা-ও সেই এবং বাপ-ও সেই, তাদের উস্তাদও, চিকিৎসকও, দলপ্রধান আবার বন্ধুও, ভাই আবার শাসকও, অকৃত্রিম কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ, প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়—প্রত্যেক সৈনিককে তাঁর তর্জনীর হেলনে জীবন দিতে শুধু প্রস্তুতই নয়, বরং ব্যাকুল দেখা যায়।

সবেমাত্র দরসে নিযামীতে চতুর্থ বছর পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন। এমন সময় ১৯৮১ ঈসায়ীতে জিহাদের উদ্দীপনা তাঁকে রণাঙ্গনে টেনে নিয়ে আসে। এখানে কখনো পরিখার মধ্যে, কখনো মোর্চার মধ্যে আর কখনো ক্যাম্পের মধ্যে—যখন যেখানে যেভাবে সুযোগ হয়েছে স্বীয় আমীর শহীদ মাওলানা ইরশাদ আহমাদ (রহঃ)এর নিকট পাঠ্যপুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করতে থাকেন। এভাবে জিহাদী তৎপরতার মধ্যেও ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্তের শিক্ষা, কোন না কোনভাবে তিনি সম্পন্ন করেন। ১৯৮৫ ঈসায়ীতে স্বীয় আমীরের শাহাদাতের কয়েক মাস পর 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর' মজলিসে শুরা তাঁকে কেন্দ্রীয় কমাণ্ডার নির্বাচিত করে। তখন থেকেই এ কাজই শয়নে জাগরণে তাঁর একমাত্র সঙ্গী। কোন শহীদকে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছানো, তাঁর আপনজনদের সান্ত্বনা প্রদান করা, আহতদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা কিংবা সাংগঠনিক কাজ নিয়ে পাকিস্তান যাওয়া হলে তখন কিছু সময়ের জন্য মুলতান জেলার তহসিল 'কবিরওয়ালায়' নিজ গ্রাম আবদুল হাকীমেও ঘুরে আসেন।

خاکی و نوری نہاد ' بندۂ مولی صفات
ہر دوجہاں سے غنی ' اس کا دل بے نواز
نرم دم گفتگو ' گرم دم جستجو
رزم ہو یا بزم ہو ' پاک دل و پاک باز

'তাঁর খামিরা মাটি ও নূরের তৈরী, তিনি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত বান্দা। উভয় জাহান হতে অমুখাপেক্ষী, হৃদয় তাঁর নির্মোহ। কথায় নরম, কাজে গরম, নির্জন ও জনসমাগমে একই রকম—পবিত্র হৃদয় ও পবিত্র কর্মের অধিকারী তিনি।'

দুইদিনের সাহচর্যেই তাঁর সঙ্গে এমন হৃদ্যতা গড়ে ওঠে যে, আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরও তাঁর মধুময় কল্পনা মনমগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রণাঙ্গন থেকে ফেরার পর হতে একথাগুলো লেখা পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে করাচী এবং লাহোরেও তাঁর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ ঘটেছে। প্রত্যেক বারের সাক্ষাতে আমার হৃদয়ে তাঁর ভালবাসার চিত্র আরো গভীর হয়েছে। তাঁর ঈর্ষণীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, বিজয় লাভের চেয়ে শাহাদত লাভের আগ্রহ তাঁর অধিক। যার অবস্থা সবাক হয়ে বলে ওঠে—

سوار ناقہ و محمل نہیں میں
نشان جادہ ہوں منزل نہیں میں
مری تقدیر ہے خاشاک سوزی
فقط بجلی ہوں میں حاصل نہیں میں

'উষ্ট্রী ও হাওদার আরোহী নই আমি। পথের প্রতীক ; গন্তব্য নই আমি। খড়কুটা জ্বালানো আমার ভাগ্যলিপি। আমি শুধু বিদ্যুৎ, জড়বস্তু নই আমি।'

আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা সাহবান মাহমুদ সাহেব (দাঃ বাঃ)কে জুমুআর দিন সকালে করাচী থেকে উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে, তাই তিনি এবং কাফেলার অপর একজন সঙ্গী—জনাব কারী হেলাল আযাদ সাহেবও কোন এক সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে আজই সকাল দশটার দিকে জীপে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যেন তাঁরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে করাচী পৌঁছতে পারেন। ডেরা ইসমাঈল খান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দুই তিনজন মুজাহিদও তাঁদের সঙ্গে যান।

মুজাহিদদের সমাবেশ

প্রোগ্রাম মুতাবেক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলে কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব আমাদের আগমনে অপরিসীম আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁর

ভাষণের শব্দাবলী তো এখন স্মরণ নেই, তবে তাঁর আলোচনার সারকথা ছিল এই—

"আপনাদের আগমনে আমাদের হৃদয়ে যে শক্তি সঞ্চয় হয়েছে, তা আপনারা অনুমান করতে পারবেন না। আমার নিকট তার স্বরূপ তুলে ধরার মত ভাষাও নেই। আল্লাহ তাআলার গায়েবী নুসরাত, আমাদের সেই মহামূল্যবান পুঁজি, যার বদৌলতে আমরা বিশ্বের সর্বাধিক জালিম পরাশক্তির সঙ্গে মুকাবেলা করে চলছি। আমেরিকার দ্বিমুখী নীতি এবং প্রতারণাপূর্ণ দুশমনী সম্পর্কেও আমরা সম্যক অবগত আছি। আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে আমরা তাদের সম্পর্কে কখনো অলীক সুধারণায় লিপ্ত হইনি। তারা আমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করা এবং আফগানিস্তানকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত করার জন্য এখন রাশিয়ার সাথে মিলিত হয়ে আমাদের উপর 'জেনেভা চুক্তি'কে চাপিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। কিন্তু আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে সেই চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছি। এভাবে আজ আমরা দুই পরাশক্তির মারাত্মক চক্রান্তের মুখোমুখী। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! শহীদদের খুন সফলতার দ্বার উন্মোচন করছে। আপনাদের মত বুযুর্গদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং দুআর বদৌলতে সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন আফগানিস্তান কমিউনিষ্টদের নির্যাতন ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবে। কাবুলের আকাশে ইসলামের পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে থাকবে। এখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের মজলুম আফগান মুহাজির ভাইয়েরা পুনরায় এখানে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করবে।

রণাঙ্গনের পরিখাসমূহ এবং মোর্চাসমূহের মধ্যে, গোলার তীব্র বর্ষণ এবং রক্তাক্ত লড়াইয়ের মধ্যে এই কল্পনা সর্বদা আমাদের শক্তি বর্ধন করে এসেছে যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের ব্যাপকভাবে এবং আপনাদের ন্যায় বুযুর্গদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং দুআ বিশেষভাবে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, আপনাদের আগমনে এ কল্পনা আজ বাস্তব হয়ে আমাদের সম্মুখে ধরা দিয়েছে। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর যতই শুকরিয়া আদায় করি না কেন তা কমই হবে।"

তারপর তিনি আর্দ্র কণ্ঠে বলেন—'আজ রাতে আমি শহীদ আমীর (রহঃ) (মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব)কে স্বপ্নে দেখেছি।'

একথা বলতেই তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রু ছলকে ওঠে। কণ্ঠে কথা আটকে যায়। এদিকে সমস্ত মুজাহিদ তাদের শহীদ আমীরের নাম শুনে জার জার হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন। সমগ্র সমাবেশ হতে নিম্নস্বরে ফোফানির আওয়াজ শ্রুতিগোচর হতে থাকে। তিনি অতি কষ্টে তাঁর ভাষণ অব্যাহত রেখে বলেন—

"আমি স্বপ্নে দেখি, যেন শহীদ আমীর সাহেব আমাকে ওয়ারলেস যোগে বলছেন যে, তুমি পূর্বেই আমাকে কেন বলনি যে, আমাদের বুযুর্গ এবং উলামায়ে কেরাম তাশরীফ এনেছেন। বহুদিন ধরে আমি তাঁদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু এখন আমি গজনীর রণাঙ্গনে একটি লড়াইয়ে ব্যস্ত আছি। তা রেখে এখন আসা সম্ভব নয়।"

উপস্থিত সমাবেশকে সম্বোধন করে আমরাও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখি। বক্তব্য চলাকালে কখনো আকাশ বিদীর্ণকারী না'রায়ে তাকবীর গুঞ্জরিত হতে থাকে, আর কখনো বক্তা ও শ্রোতাদের চোখে অশ্রু ছলকে উঠতে থাকে।

کیوں بزم دل و جاں میں ' ہلچل ہے خدا جانے

یاد آگئے پھر شاید ' بھولے ہوئے افسانے؟

'হৃদয়ের গহীনে কেন এ আলোড়ন তা আল্লাহ ভাল জানেন।
হয়ত বা বিস্মৃত দাস্তান পুনরায় স্মরণ হয়েছে।' (হযরত আরেফী)

যুদ্ধের সরঞ্জামে স্বাবলম্বী হওয়া একটি দ্বীনী দায়িত্ব

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে—

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

অর্থ ঃ এবং তাদের (কাফেরদের মুকাবিলার) জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি সঞ্চয় কর। (আল আনফাল)

'শক্তি' শব্দের অর্থের মধ্যে যাবতীয় সামরিক অস্ত্র এবং এতদসংক্রান্ত সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শারীরিক ব্যায়াম এবং সামরিক কৌশল শিক্ষা করাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রজ্ঞাময় কুরআন এ স্থলে তৎকালীন সময়ের প্রচলিত হাতিয়ারসমূহ উল্লেখ করেনি। বরং ব্যাপক অর্থবোধক 'শক্তি' শব্দ নির্বাচন করে এদিকেও ইঙ্গিত করেছে যে, স্থান–কাল–পাত্রভেদে এ শক্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে।

সে যুগের সমরাস্ত্র ছিল তীর, তরবারী, বর্শা ও মিনজানিক। তারপর এলো বন্দুক ও তোপের যুগ। এখন এসেছে বোমা, রকেট ও মিসাইলের যুগ। 'শক্তি' শব্দের মধ্যে এসবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই বর্তমান যুগের ধর্মীয় দায়িত্ব হল—সামর্থ্য অনুপাতে আনবিক শক্তি, অত্যাধুনিক মিসাইল, ট্যাংক, বিমান, নৌশক্তি ইত্যাদি প্রস্তুত করা। কারণ এ সবই 'শক্তি' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এই শক্তি অর্জন করতে যে জ্ঞান, শিল্প ও টেকনোলজি শিক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে, তা যদি এ নিয়তে শিক্ষা করা হয় যে, এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং কাফেরদের সাথে মুকাবেলার কাজ নেওয়া হবে, তাহলে তাও জিহাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে মারিফুল কুরআন)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন সাহাবী হযরত উরওয়া বিন মাসউদ (রাযিঃ) এবং হযরত গায়লান বিন আসলাম (রাযিঃ) হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শুধুমাত্র এ কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি যে, তাঁরা কিছু সমরাস্ত্র ও সমর সরঞ্জাম তৈরী করার পদ্ধতি শিক্ষার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার 'জারশ' নামক শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে 'দাব্বাবা' এবং 'জাবুর' নামক বিশেষ এক ধরনের সমরযান তৈরী হতো। সে যুগে ঐসব গাড়ী দ্বারা বর্তমান যুগের ট্যাংকের কাজ নেওয়া হত। এমনিভাবে 'মিনজানিকের' কারিগরী শিক্ষাও সেখানে ছিল। যার দ্বারা ভারি ভারি পাথর দূর্গ প্রাচীরে নিক্ষেপ করে তোপের কাজ নেওয়া হত। এই কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ দুই সাহাবী শাম দেশ সফর করেন। (রিসালা 'জিহাদ' ১৫–১৭)

এ ঘটনা দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক যুগের অত্যাধুনিক অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও টেকনোলজীতে দক্ষতা অর্জন করে স্বাবলম্বী হওয়া জরুরী। অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকা উচিত নয়। কারণ সিরিয়া থেকে এ সমস্ত সামরিক যান এবং মিনজানিক আনিয়ে নেওয়াও তো সম্ভব ছিল, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে যথেষ্ট মনে করেননি। বরং নিজেরা তা তৈরী করার কর্মকৌশল অবলম্বন করেছেন।

এ পর্যায়ে আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা আবশ্যক যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন রূহানী শক্তি এবং খোদায়ী মদদ অর্জিত ছিল যে, তা বর্তমান থাকতে বৈষয়িক শক্তির কোন প্রয়োজন

ছিল না। কিন্তু তারপরও তিনি এ ব্যাপারে এই এই অধিক পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদের জন্য এর প্রয়োজন কত বেশী। আমাদেরকে এ ব্যাপারে গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা–ভাবনা করতে হবে যে, বর্তমান যুগের অত্যাধুনিক অস্ত্র–শস্ত্র, আনবিক বোমা প্রভৃতি এবং এ সবের অত্যাধুনিক টেকনোলজীতে স্বাবলম্বী না হয়ে আমরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও কেমন অপরাধমূলক গাফলতিতে লিপ্ত রয়েছি। সততা, সাধুতা, শ্রম, শিল্প, সরলতা ও অল্পতুষ্টিকে বাস্তবায়ন করে পাকিস্তানের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য স্বাবলম্বী হওয়ার এই অবশ্যম্ভাবী গন্তব্যে পৌঁছা কঠিন অবশ্যই, তবে অসম্ভব নয় আদৌ। তাছাড়া এই জটিল সমস্যা সমাধান করা ছাড়া আমাদের কোন গত্যান্তরও নেই। কেননা—

تقدیر کے قاضی کا یہ ہے فتویٰ ازل سے
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات

'ভাগ্যের বিচারকের আদিকাল থেকেই এই ফতোয়া রয়েছে যে, অপমৃত্যুই দুর্বলতার শাস্তি।'

নিশানাবাজি অনুশীলন একটি মহান ইবাদত

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে যে শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তার তাফসীর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করেছেন—

اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

অর্থ ঃ মনে রাখবে সে 'শক্তি' হল 'আর্ রমী'। মনে রাখবে সে 'শক্তি' হল 'আর্ রমী'। মনে রাখবে সে 'শক্তি' হল 'আর্ রমী'।

'আর্ রমী' শব্দের অর্থ হলো নিক্ষেপ করে আঘাত করা, বা লক্ষ্যস্থির করা। এতে জানা গেল যে, পবিত্র কুরআন এমনি তো জিহাদের সর্বপ্রকার অস্ত্র ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করা মুসলমানদের জন্য শরয়ী দায়িত্ব সাব্যস্ত করেছে এবং তার সবগুলোই কুরআনে ব্যবহৃত 'শক্তির' অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার মধ্যেও যে সমস্ত হাতিয়ার নিক্ষেপ করে মারতে হয়, যেমন তীর, গুলি, বোমা, রকেট, মিসাইল ইত্যাদি—ইসলামে তার

বিশেষ তাকিদ ও গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানের বিজ্ঞানের যুগে তো যাবতীয় লড়াই—স্থলের, জলের, আকাশের এমনকি শূন্যেরও এই—'আর্‌ রমী' (নিক্ষেপ)এর কৃপাধীন রয়েছে। এজন্য এমনও বলা যেতে পারে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেএর এই এরশাদের মধ্যে এই ভবিষ্যৎ বাণীও নিহিত রয়েছে যে, এমন এক যামানা আসবে, যখন দূর থেকে লড়াই হবে এবং সামরিক শক্তির ভিত্তিই হবে 'আর্‌ রমী' (নিক্ষেপ করে মারা/নিশানা স্থির করা)। তখন বর্শা, তরবারী, খঞ্জর ইত্যাদি হাতিয়ার দ্বারা পরিচালিত সম্মুখ যুদ্ধ পরিত্যক্ত হবে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্যস্থির অনুশীলনের অত্যন্ত তাকিদ করেছেন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়সমূহের ফযীলত বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍفِي الْجَنَّةِ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَ مُنَبِّلَهُ، فَارْمُوْا وَارْكَبُوْا، وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا –

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান। (এক) তার প্রস্তুতকারীকে, যে তা ভাল (সওয়াব ও জিহাদের) নিয়তে বানিয়েছে। (দুই) নিক্ষেপকারীকে। (তিন) ঐ ব্যক্তিকে যে তা নিক্ষেপকারীর হাতে তুলে দিয়েছে। তাই নিশানার অনুশীলন কর, অশ্বারোহন কর, আর আমার নিকট নিশানাবাজি করা, অশ্বারোহণ করার চেয়ে অধিক প্রিয়। (তিরমিযী শরীফ)

"اِرْمُوْا ، فَمَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً، قَالَ اِبْنُ النَّحَّامِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ اَمَا اَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ اُمِّكَ وَلٰكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِاَةَ عَامٍ"

আরো ইরশাদ হচ্ছে—তীর নিক্ষেপ কর। যে ব্যক্তি দুশমনকে একটি তীর মারবে আল্লাহ তাআলা তার বদৌলতে (বেহেশতের মধ্যে) তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। ইবনে নাহহাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! মর্যাদা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আরে! মর্যাদা দ্বারা তোমার মায়ের চৌকাঠ তো উদ্দেশ্য হতে পারে না। বরং (বেহেশতের) দুই মর্যাদার মাঝে একশ' বছরের দূরত্ব রয়েছে। (নাসায়ী শরীফ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপত্তাকালীন সময়ের জন্যও এ নির্দেশ দান করেছেন—

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اَرْضُوْنَ وَ يَكْفِيكُمُ اللّٰهُ، فَلَا يَعْجِزْ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلْهُوَ بِاَسْهُمِهٖ –

অর্থ ঃ তোমাদের হাতে অনেক ভূখণ্ড বিজিত হবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদের পর্যাপ্ত জীবিকার ব্যবস্থা করবেন। তখন (সেই নিরাপত্তাকালীন সময়ে) তোমরা যেন তোমাদের তীরের খেলায় অপারগ না হও। (অর্থাৎ এর চর্চা ছেড়ে না দাও) (মুসলিম শরীফ)

যেমনিভাবে পবিত্র কুরআন হিফয করে ভুলে যাওয়া গোনাহ, তেমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশানাবাজী শিক্ষা করে তা ভুলে যাওয়াকেও মারাত্মক গোনাহ আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে—

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، اَوْ قَدْعَصٰي –

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি লক্ষ্যস্থির করা [তীর (গুলি) চালনা] শিক্ষা করল, তারপর তা ভুলে গেল। তাহলে সে আমার দলভুক্ত নয়, (বর্ণনাকারী বলেন—) অথবা এরূপ বলেছেন যে, সে অবাধ্য হল। (মুসলিম শরীফ)

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) তাঁর গভর্নর আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ)এর নিকট একটি ফরমান প্রেরণ করেন—তাতে লেখা ছিল—

اِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوْ بِالرَّمْيِ، وَاِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوْا بِالْفَرَائِضِ –

অর্থ ঃ যখন খেলা করবে, তখন নিশানাবাজীর খেলা খেলবে, আর যখন পরস্পরে কথা বললে—মিরাসের (উত্তরাধিকার সম্পদ) মাসআলা নিয়ে কথা বলবে। (হাকিম)

আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে আমার নিশানাবাজীর শখ বাল্যকাল থেকে। ধাপে ধাপে বন্দুক, রিভলবার ও রাইফেলের প্রশিক্ষণও আমি গ্রহণ করি। শ্রদ্ধেয় পিতা [(হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব

(রহঃ)] লাইসেন্স করে আমাকে কয়েকটি অস্ত্র এজন্যই জোগাড় করে দিয়েছিলেন, যেন শিকারের মাধ্যমে অনুশীলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তাঁর ওফাতের পর এখন বিভিন্ন দায়িত্ব ও ব্যস্ততার ভীড়ে সে অনুশীলন হারিয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, এজন্য সবসময় নিশানাবাজীর সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। কারণ—

اے شیخ ! بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن
بنتی ہے بیابانی میں ' فاروقی و سلمانی

'হে শায়েখ ! পাঠশালার পরিবেশ বড়ই সুন্দর বটে, তবে ফারুকী ও সালমানী বীরত্ব বিয়াবানেই তৈরী হয়।'

সমাবেশ শেষ হওয়ার পর যোহর পর্যন্ত আমরা ক্লাশিনকোভ দ্বারা মনভরে নিশানাবাজীর অনুশীলন করতে থাকি। নিশানা ছিল বেশ উঁচুতে। সঠিক নিশানায় আঘাত করার কারণে কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব আদব ও আনন্দ সহকারে 'সাবাসী' দেন। অপর একটি বড়গান (সালডাজী) দ্বারাও নিশানাবাজীর সুযোগ হয়। তা থেকে এক ফায়ারে অবিরাম একশ' গুলি বের হয়। এন্টি এয়ারক্রাফট—যাকে মুজাহিদরা স্থানীয় ভাষায় দাশাক্কা বলে—তা দ্বারাও ফায়ার করি। এটি বিমান বিধ্বংসী একটি কামান। কিন্তু তা দ্বারা ভূমি থেকে ভূমিতেও আঘাত করা যায়। এর গর্জনে সমগ্র পর্বত অঞ্চল প্রকম্পিত হয়। অপ্রত্যাশিত বিষয় এই ঘটে যে, আমি তা দ্বারাও ঠিক ঠিক নিশানায় আঘাত করি। আল্লাহরই সকল প্রশংসা।

আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা

যোহর নামায এবং দুপুরের আহার থেকে অবসর হতেই আনুমানিক দেড়টার দিকে সবাই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়ীর বাইরে সমবেত হয়। মেজবান মুজাহিদ এবং আমরা যারা মেহমান ছিলাম সব মিলে লোকসংখ্যা ষাটের কাছাকাছি ছিল। সবার নিকট ক্লাসিনকোভ এবং গুলি ভরা চারটি করে ম্যাগাজিন ছিল। অনেক মুজাহিদ সাবধানতাবশত অতিরিক্ত গুলি নিজেদের জ্যাকেটের পকেটে বাদামের মত ভরে রেখেছিল। কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব যিনি সবার মধ্যমণি ছিলেন—যাত্রার ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ওয়াকিটকিতে চতুর্পার্শ্বের ক্যাম্পসমূহ এবং সম্মুখবর্তী মোর্চাসমূহের সাথে তাঁর অব্যাহত যোগাযোগ চলছিল।

বিভিন্ন ধরনের তোপ ও তার বিভিন্ন অংশ পৃথক করে করে দৈত্যাকৃতির বিরাট একটি হিনো ট্রাকে উঠানো হয়েছিল। অনেকগুলো রকেট লাঞ্চার, গ্রেনেড ইত্যাদিও ঐ ট্রাকে নেওয়া হয়েছিল। ক্যাম্পের হেফাজতের জন্য যাদেরকে এখানে অবস্থান করতে হবে, তারা ছাড়া সকল মুজাহিদ ঐ ট্রাকের মধ্যেই গাদাগাদি করে উঠে যায়। ড্রাইভারের পাশে দুইজন মুজাহিদ আরোহণ করেন। তাদের পাশে কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব উপবেশন করবেন। আমাদের জন্য দুটি জীপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব আরোহণ করতেই ঠিক দুটার সময় কাফেলা যাত্রা করে। সম্মুখে অস্ত্র ও মুজাহিদ ভর্তি ট্রাক, পিছনে আমাদের জীপ। পর্বত থেকে অবতরণ করে তার পাদদেশ দিয়ে গাড়ী তিনটি উরগুন উপত্যকার সেই প্রান্ত ধরে উত্তরমুখে রওনা হয়, যেখানে দুশমনের অত্যন্ত মজবুত ভূগর্ভস্থ সেনা চৌকি 'জামাখোলা' অবস্থিত।

لے تو چلی ہے ہمت پرواز سوئے گل
پہنچائیں جتنی دور بھی اب بال و پر مجھے

'উড়ার অফুরন্ত সাহস আমাকে পুষ্পপানে নিয়ে চলেছে। এখন আমার ডানা ও পালক যতদূর নিয়ে পৌঁছায়।' (হযরত আরেফী (রহঃ)

উরগুন ছাউনীর সামরিক গুরুত্ব

উরগুন ছাউনী—যার নিরাপত্তার জন্য 'জামাখোলা' ও অন্যান্য সেনা চৌকি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—দুশমনের অতি মজবুত একটি সেনা ছাউনী। সেখানে অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, ট্যাংক এবং সাঁজোয়া গাড়ীর সমন্বয়ে গঠিত এক ডিভিশন সৈন্য সর্বদা উপস্থিত থাকে। এছাড়া গোত্রীয় ছয়শত লড়াকু সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত মিলিশিয়াও সেখানে রয়েছে। মালবাহী বিমান এবং গানশিপ হেলিকপ্টারের জন্য এখানে একটি সামরিক বিমান বন্দর ব্যবহার করা হয়। এ সবের মাধ্যমে ছাউনী সব সময় রসদ ইত্যাদি পেয়ে থাকে। রাশিয়ান এবং আফগান কমিউনিষ্টরা এই ছাউনীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যার একটি কারণ এই যে, এটি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে বসবাসকারী লড়াকু গোত্রসমূহের নিকটবর্তী ছাউনী। সীমান্তের অতি নিকটবর্তী গোত্রশাসিত এ এলাকার লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতে এবং তাদেরকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে উসকানি

দিতে এই ছাউনী গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এটি পাকিস্তান সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তা এখান থেকে পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে।

তৃতীয় কারণ এই যে, এদিক থেকে কাবুল পর্যন্ত গাড়ীর সংক্ষিপ্ত পথ একমাত্র এটিই। এই ছাউনীর শক্তি সম্পর্কে এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, পাকতিকা প্রদেশের এদিকের সমস্ত অঞ্চল মুজাহিদরা আযাদ করেছে, কিন্তু এই ছাউনী এবং তার নিরাপত্তা চোকিসমূহের উপর এখনো দুশমনের দখল রয়েছে।

জামাখোলা পোষ্ট

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব রাতেই বলেছিলেন যে, তিন চার বছর পূর্বে এই চৌকি ছিল না। আমরা তখন সরাসরি ছাউনীর উপর আক্রমণ করতাম। একবার চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করে পূর্ণ শক্তি নিয়ে তার উপর আক্রমণ করি এবং ছাউনীর ভিতরে প্রবেশ করি। দুশমন অবিচল থেকে পদে পদে আমাদের সাথে মোকাবিলা করতে থাকে। অবশেষে তারা অনেক জান ক্ষয় করে পিছু হটতে থাকে। আমাদেরও কিছু মুজাহিদ শহীদ হন। তারপরও ছাউনীর অর্ধেকের বেশী আমাদের কব্জায় এসে যায়। এরপর আমরা ছাউনীর যেদিকেই অগ্রসর হই দুশমন অস্ত্র সমর্পণ করে পালিয়ে যেতে থাকে। সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসার তাদের অফিস এবং বাড়ী খোলা ফেলে রেখে পালাতে থাকে। অনেকে বন্দী হয়। তারপরও ছাউনীর এক অংশে তারা অবিচল থেকে মোকাবেলা করতে থাকে। আমরা সেদিকে অগ্রসর হলে তারা রকেট নিক্ষেপ শুরু করে। সেদিন আমাদের সঙ্গে রাশিয়ানদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটি ট্যাংকও ছিল। ট্যাংকটি গোলা নিক্ষেপ করে চলছিল। তার আড়াল থেকে মুজাহিদরাও গুলি বর্ষণ করছিল। আমাদের সকল সাথী সবদিক থেকে এসে এখানে জড় হয়ে এই অংশের উপর পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে আক্রমণ করতে থাকে। পরিপূর্ণ আমাদের বিজয়ের সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় চিত্র পাল্টে যায়। আমাদের ট্যাংকের তোপচী একটি রকেটের আঘাতে শহীদ হয়ে ট্যাংকের বাইরে ঝুলে পড়ে। ট্যাংকের ড্রাইভার তাকে উঠাতে গিয়ে সেও একটি রকেটের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে

পড়ে যায়। আমাদের অগ্রাভিযান থেমে যায়। বিকল্প কোন ড্রাইভার এবং তোপচী সঙ্গে ছিল না। বাধ্য হয়ে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

এই ঘটনা শুনিয়ে কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব মুখমণ্ডলে প্রশান্তিভরা হাসি টেনে বললেন—

"হযরত! আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক ফায়সালার পিছনে অনেক হেকমত নিহিত থাকে। এর মধ্যেও কত হেকমত যে রয়েছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। একটি হেকমত হয়ত এও ছিল যে, ছাউনী বিজয় হলে কোটি কোটি টাকার গনিমতের মাল হস্তগত হত। এক একজন মুজাহিদ লাখপতি হয়ে যেত। তখন হয়ত সেই ধনদৌলত আমাদের জন্য পার্থিব সম্পদের ভালবাসা এবং জিহাদের ব্যাপারে অলসতার কারণ হতো। এ ঘটনা আমাদেরকে একটি শিক্ষা এও দান করে যে, সেদিন আমাদের মধ্যে আমাদের পরিকল্পনার নিপুণতার কারণে অহমিকা এসে যায়। আমাদের মুখে বার বার একথা উচ্চারিত হচ্ছিল যে, 'আজ আর উরগুন রক্ষা করতে পারবে না।' আমরা 'ইনশাআল্লাহ'ও বলছিলাম না। সেদিন আমাদের দৃষ্টি আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্যের পরিবর্তে নিজেদের ট্যাংক, সাজসরঞ্জাম ও শক্তির উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দেন যে, আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তোমরা কোন বিজয় লাভ করতে পারবে না। বিজিত লড়াইও পরাজয়ের রূপ পরিগ্রহ করবে।"

এই ঘটনার পর দুশমন সেই ছাউনীর নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কাবুল থেকে একটি বিশাল সেনা কনভয় এখানে আসে। তার মধ্যে হাজার হাজার ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ী ছিল। কয়েক ডজন গানশিপ হেলিকপ্টার এবং বিমান তাদের উপর টহল দিচ্ছিল। এই অপরিসীম সামরিক শক্তির জোরে কনভয়টি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাউনীর আশেপাশের যে সমস্ত জায়গা থেকে মুজাহিদদের আক্রমণের আশংকা ছিল সে সমস্ত জায়গায় ভূগর্ভস্থ সুদৃঢ় চৌকি নির্মাণ করে।

জামাখোলা, খান–এ আলম কেল্লা, নেক মুহাম্মাদ পোষ্ট এবং ছোট বড় চৌকির সংখ্যা বারটি। সবচেয়ে শক্তিশালী পোষ্ট 'জামাখোলা'। উপযুক্ত অবস্থানের কারণে সমগ্র উরগুন উপত্যকা তার তোপের আওতায় রয়েছে। এর মাধ্যমে দুশমন এখান থেকে গজনি ও কাবুলের পথ

মুজাহিদদের জন্য বন্ধ করে রেখেছে। উরগুন ছাউনী এবং শহর বিজয়ও এই চৌকি ধ্বংস করা ছাড়া সম্ভব নয়।

এজন্যই এখন মুজাহিদদের প্রধান লক্ষ্য এই চৌকি। তারা প্রতিনিয়ত এই চৌকির উপর আক্রমণ করে থাকে। কিন্তু দুশমন জামাখোলার চতুর্পার্শ্বে বহুদূর পর্যন্ত কল্পনাতীত ভূমি মাইন বিছিয়ে রেখেছে। তার দিকে ধাবিত প্রতিটি নদীনালা, পাহাড় ও প্রান্তরে এই 'মৃত্যুবীজ' মুজাহিদদের জন্য ওৎ পেতে আছে। জামাখোলা সংলগ্ন এলাকার চতুর্দিকে তো মাইনের এমন জাল বিছিয়ে রেখেছে যে, একটি পা ফেলার জায়গাও খালি রাখেনি। এই 'মৃত্যুবীজ' দ্বারা এ পর্যন্ত অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন এবং অনেকে পা হারিয়েছেন।

তবে এ সমস্ত অগ্নি পরীক্ষা এবং বিপদাপদ নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের জিহাদী উদ্দীপনাকে অনমনীয় এবং শাহাদাতের বাসনাকে অপরাজেয় করে দিয়েছে। তারা জানতে পেরেছে—

عالم ہے فقط مؤمن جانباز کی میراث
مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے

'শুধু জানবাজ মুমিনদের উত্তরাধিকার এ বিশ্বজগত।
যে পৃথিবীকে অর্থপূর্ণ করতে পারেনি সে প্রকৃত ঈমানদার নয়।'

আমরা এখন জামাখোলা পোষ্ট অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছি। অস্ত্র ও মুজাহিদ দ্বারা গাদাগাদি ভরা দৈত্যাকৃতির হিনো ট্রাকটি উঁচুনিচু কাঁচা পথ ধরে অনেকটা ঝাকি ছাড়াই বেশ দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের জীপ দুটি এমনভাবে তার পিছনে পিছনে ছুটছিল—যেন তার সাথে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সম্মুখে যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে কল্পনাশক্তি তার বিভিন্ন পরিস্থিতি চিন্তা করে চলছিল। এখনো লড়াইয়ের পূর্ণ পরিকল্পনা আমাদেরকে জানানো হয়নি। তাই প্রত্যেক সাথীর চেহারা প্রশ্নবোধক চিহ্নের রূপ ধারণ করেছিল। জিহাদী স্পৃহায় সকলের হৃদয় ব্যাকুল আর রসনা আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

আমরা মাত্র দুই তিন কিলোমিটার অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় আমাদের ডান দিকে উরগুন উপত্যকার প্রশস্ত প্রান্তরে দুশমনের গোলা এসে আমাদের থেকে একটু দূরে পড়ে বিস্ফোরিত হতে থাকে। এগুলো 'জামাখোলা পোষ্ট' থেকে আসছিল। ধারণা করা হচ্ছিল—দুশমন

আমাদের অগ্রাভিযান সম্পর্কে অবগত হয়েছে। কিন্তু কমাণ্ডার সাহেব বললেন, হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব প্রায় তিন ঘন্টা পূর্বে বাগাড় ক্যাম্প হতে মিসাইল ভর্তি একটি ট্রাক নিয়ে খানী কেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। তারা এখন উরগুন উপত্যকা অতিক্রম করবেন। দুশমন তাদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে। এসব গোলা তাঁকেই লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে। কিন্তু কমাণ্ডার সাহেব ঐ ট্রাক বা আমীর সাহেবের ব্যাপারেও কোন শংকা প্রকাশ করলেন না। মুজাহিদরা তার কারণ এই বললেন যে, এ তো প্রতিদিনের ব্যাপার। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা রাতদিন কতবার যে এমন গোলা বর্ষণের মধ্য দিয়ে এই উপত্যকা অতিক্রম করি তার ইয়ত্তা নেই। আল্লাহর মেহেরবানীতে এদের গোলা কারো কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না।

গোলা এসে এসে বিস্ফোরিত হচ্ছিল আর আমাদের কাফেলা যথারীতি সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরা কয়েকটি বিরান জনপদ অতিক্রম করি। রাস্তায় কিছু আফগান রাখাল এবং বেদুঈনেরও সাক্ষাৎ পাই। তারাও আমাদের মত উপত্যকা এড়িয়ে তার উত্তর পশ্চিম প্রান্ত ধরে পর্বতের পাদদেশ ঘেঁষে সফর করছিল, কারণ উপত্যকা ছিল দুশমনের তোপের আওতায়। প্রায় দেড় ঘন্টা পথ চলার পর আমাদের কাফেলা বামদিকের সবুজ শ্যামল পাহাড় বেষ্টিত একটি প্রশস্ত ঢালুতে আরোহণ করে রহস্যময় একটি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়।

মুজাহিদদের মড়যগাহ ক্যাম্পে

এখানে অনেক দূর পর্যন্ত কোন মানুষ চোখে পড়ছিল না। কিন্তু আমরা গাড়ী থেকে নামতেই চতুর্দিক থেকে বহুসংখ্যক সশস্ত্র তরুণ বের হয়ে আসে। দেখতে দেখতে প্রায় পঞ্চাশ জন মুজাহিদ আমাদের নিকট সমবেত হয়। ক্লাশিনকোভ ছাড়াও অনেকে তোপের গোলা, রকেট লাঞ্চার এবং হাত বোমাও বহন করেছিল। ঐ ক্যাম্পের এসব মুজাহিদও আজকের আক্রমণে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে। এই জায়গার নাম 'মড়যগাহ'। এখান থেকে দুশমনের জামাখোলা পোষ্ট একেবারে নিকটে হওয়া সত্ত্বেও উঁচু পাহাড়ের প্রাকৃতিক বেষ্টনী এখানে তাদের গোলা পৌঁছতে দেয় না। এখানে বোমারু বিমান এবং গানশীপ হেলিকপ্টারের

ভয়ও এজন্য নেই যে, দুশমন ময়দানের মুজাহিদদের মিসাইলের আঘাতে এমন পর্যুদস্ত হয়েছে যে, এখন তারা মারাত্মক অপারগতা ছাড়া আকাশে উড়ার ঝুঁকি গ্রহণ করে না। তবে এই ক্যাম্প যেসব পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত, সেগুলোর উপর আরোহণ করে মজাহিদরা দুশমনের সবধরনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এই ক্যাম্পে শুধুমাত্র দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ তরুণ মুজাহিদদেরকে রাখা হয়। তাদেরকে এখানে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয়, তার মধ্য থেকে কিছু এই—

১. সবসময় এবং সর্বাবস্থায় দুশমনের পোষ্টসমূহ এবং ছাউনীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। তাদের অস্বাভাবিক গতিবিধি সম্পর্কে ওয়ারলেস যোগে খানীকেল্লা প্রভৃতি স্থানে কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেবকে অবহিত করা।

২. তাৎক্ষণিক নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুশমনের বিরুদ্ধে দ্রুত তৎপরতা চালানো।

৩. গুপ্তচরদের মাধ্যমে দুশমনের অবস্থাদি অবগত হওয়া।

৪. দুশমনের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানোর জন্য তার অতি নিকটে গিয়েও মোর্চা ও পরিখা খনন করা।

৫. এসব তৎপরতার জন্য পথের মাইন পরিস্কার করা।

৬. লড়াই চলাকালে যেসব মুজাহিদ আহত বা শহীদ হয়, লড়াই থামা পর্যন্ত তাদেরকে এখানে হেফাজতে রাখা।

মাশাআল্লাহ এ সমস্ত 'ঈগলছানাদের' মধ্যে দারুল উলূম করাচীর কয়েকজন তালিবে ইলমের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। তাদের সঙ্গে মুআনাকা করার সময় আনন্দাশ্রু চেষ্টা সত্ত্বেও ধরে রাখতে গারিনি। এখানে ছোট একটা অসম্পূর্ণ ঝুপড়ি ছাড়া কোন ঘর বা তাঁবু নজরে পড়ে না। এরা তাহলে থাকে কোথায়? গিরিগুহায় নাকি পর্বতচূড়ায়? ন।।৮ পর্বতের পাদদেশে জঙ্গলের মধ্যে ঘর রয়েছে? এসব বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের আপাদমস্তক বলছিল—

بجلی ہوں ' نظر کوہ و بیاباں پر ہے میری
میرے لئے شایاں ' خس و خاشاک نہیں ہے

'আমি বিদ্যুৎ, পর্বত—বিয়াবানে নিবদ্ধ আমার দৃষ্টি। খড়কুটার আবাস আমার শোভা পায় না।'

যথাসময়ের একটি সংবাদ

কমাণ্ডার সাহেবের ইঙ্গিত পাওয়ার সাথে সাথে ঐ ক্যাম্পের মুজাহিদগণ সহ আমরা সবাই তাঁর পাশে সমবেত হই। প্রত্যেকের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন তার কথা শোনার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে আছে। তিনি হাসিমুখে বললেন—এখনই রাস্তায় সংবাদ পেলাম যে, জামাখোলা পোষ্টের শত্রুসেনা—যারা সাধারণত ভূগর্ভস্থ মোর্চা, বাংকার ও পরিখার মধ্যে ঢুকে থাকে, তারা আজ বাইরে বের হয়েছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে। হয় তারা জ্বালানী লাকড়ী সংগ্রহ করার জন্য বের হয়েছে, এমতাবস্থায় আমাদের জন্য তাদেরকে শিকার করা ইনশাআল্লাহ খুব সহজ হবে। অথবা তাদের ইচ্ছা আমাদের দিকে অগ্রসর হওয়া। এমন হয়ে থাকলে, এটি হবে এক অস্বাভাবিক বিষয়। কারণ, আজ পর্যন্ত তারা আমাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস করেনি। তবে এ অবস্থায় আপনারা মন খুলে লড়াই করার সুযোগ পাবেন। কারণ, তখন লড়াই হবে অতি নিকট থেকে। ফলে আপনারা মন ভরে ক্লাশিনকোভ ব্যবহার করতে পারবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের নিকট গুলির কমতি নেই। শত্রুর জামাখোলা পোষ্ট তিন দিক থেকে আক্রমণ করা হবে। সেজন্য পৃথক পৃথক তিনটি জামা'আত ভিন্ন ভিন্ন আমীরের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ আমীরের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে।

কমাণ্ডার সাহেবের উপদেশ

কমাণ্ডার সাহেব স্বভাবমাফিক হাসিমুখে প্রশান্ত আওয়াজে বলেন—আমি আপনাদেরকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাকীদ করছি—

১. প্রথম কথা এই যে, ধৈর্যকে আপনাদের আদর্শ ও স্বভাবে পরিণত করুন। একজন মুজাহিদের জন্য এটি সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হাতিয়ার। কুরআন ও হাদীসে বারবার এর তাকীদ এসেছে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যেক জটিল সময়ে ধৈর্যের হুকুম রয়েছে। কিন্তু একজন মুজাহিদ—যে হাতের তালুতে প্রাণ নিয়ে আল্লাহর পথে বের হচ্ছে—তারজন্য ধৈর্যের গুরুত্ব অত্যাধিক। আল্লাহর পথে লড়াইকারীদেরকে পদে পদে অত্যন্ত বিপদসংকুল পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়। আমি আপনাদেরকে এ কথারই তাকীদ করছি যে, কঠিন থেকে

কঠিন মুহূর্তেও ধৈর্যের আঁচল হাতছাড়া করবেন না।

প্রত্যেক কষ্টকে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে হাসিমুখে বরণ করে নিবেন। ধৈর্য সফলতার এমন চাবি—যার বদৌলতে আল্লাহ তাআলার সাহচর্য নসীব হয়। বান্দা কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থাতেও আল্লাহ তাআলার বিরল ও বিস্ময়কর রহমত প্রত্যক্ষ করে। তার জন্য বিজয় ও নুসরতের দ্বার উন্মোচিত হয়।

২. লড়াই চলাকালে আমাদের কোন সাথী যদি আহত হয়, তাহলে মনে রাখবেন—আমাদের নিকট প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামও নেই। আহত ব্যক্তিকে এখান থেকে পাকিস্তানের কোন হাসপাতালে পৌঁছাতে দু'দিন সময় লেগে যায়। এজন্য আমার নিবেদন এই যে, কেউ আহত হওয়ার সাথে সাথে তার রক্ত বন্ধ করতে আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। কারণ, আমাদের কয়েকজন সাথী শুধুমাত্র এজন্যই শহীদ হয়েছেন যে, হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতে তাদের দেহের সমস্ত রক্ত ঝরে তারা রক্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্যথায় তাদের আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না। আমাদের নিকট ক্ষতস্থান বাঁধার জন্য পট্টিও নেই। তাই আপনারা আহত ব্যক্তির রক্ত বন্ধ করার জন্য অনতিবিলম্বে নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিবেন।

৩. রণাঙ্গনে প্রতি মুহূর্তে যে কোন মুজাহিদ শহীদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার জোরাল অসীয়ত এই যে, কোন সাথী শহীদ হলে, কোনভাবেই তার লাশ শত্রুর হাতে যেতে দিবেন না। জীবন বাজি রেখে হলেও শহীদকে হেফাজত করবেন। তাঁকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবেন। আফগান জিহাদের পুরো সময়টিতে আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কোন লাশ দুশমনের হাতে যেতে দেইনি। আমাদের এই ঐতিহ্যকে অটুট রাখবেন।

৪. চতুর্থ দরখাস্ত এই যে, আল্লাহ না করুন, আপনারা যদি দুশমনের বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হয়ে যান এবং দুশমন আপনাদেরকে ঘিরে ফেলে, তাহলে আপনারা নিজেদেরকে কখনোই তাদের হাতে বন্দী হতে দিবেন না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাবেন। এমনকি হয় বিজয় না হয় শাহাদত আপনাদের পদচুম্বন করবে।

৫. পঞ্চম এবং শেষ কথা এই যে, সর্বাবস্থায় নিজ নিজ আমীরের আনুগত্য করবেন। তার প্রত্যেকটি হিদায়াত অনুযায়ী কোন রকম উচ্চবাচ্য করা ছাড়া আমল করবেন। তা আপনার মতের পরিপন্থী হলেও।

আমীরের আনুগত্যকে কুরআন ও হাদীস ফরয করেছে। জিহাদের ময়দানে এর সবচাইতে কঠিন পরীক্ষা হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ করায় আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন এবং অনেক সময় বিজয়ও পরাজয়ে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের সংরক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। আমীন।

* * *

সংক্ষিপ্ত ও প্রভাবপূর্ণ এই বক্তৃতার পর আমরা সম্মিলিত ভাবে আহাজারী করে কাকুতি মিনতির সঙ্গে আল্লাহর দরবারে দুআ করি। তারপর প্রত্যেক দল স্বীয় আমীরের নেতৃত্বে পদব্রজে যাত্রা করে। অনেক মুজাহিদ তোপের পৃথক পৃথক অংশ বহন করেন। ঐসব তোপ সম্মুখে নিয়ে মোর্চার মধ্যে বসাতে হবে। অবশিষ্ট সকল মুজাহিদ তোপের গোলা ও অন্যান্য অস্ত্র বহন করেন। আমাদেরকে কমাণ্ডার সাহেব দয়াপরবশ হয়ে নিজের দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি নিজ দলের অন্যান্য মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে আমাদেরকে এ কথা বলে রওনা হন যে, আপনাদের জন্য জীপ রয়েছে। সহকারী কমাণ্ডার ক্বারী নেয়ামতুল্লাহ সাহেব আপনাদেরকে জীপে করে রণাঙ্গনে নিয়ে আসবেন।

মনের দুরাবস্থা

বাল্যকাল থেকে এ পর্যন্ত জিহাদের যতগুলো লড়াইয়ের কথা স্মরণ আছে, সবগুলোতেই অংশগ্রহণের বাসনা হৃদয়ে বিরাজ করেছে। কখনো মৃত্যু ভয়ে আক্রান্ত হইনি। আফগানিস্তানের এ সফরেও আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত এ অবস্থাই বিরাজ করে যে, মুরশিদ আরেফীর ভাষায়—

دل ہوا ہے جب سے لذت گیر نشترہائے غم
ہر نفس ذوق جراحت میں تپش انگیز ہے

'বেদনার অস্ত্রপাচারের স্বাদ যখন থেকে আমার হৃদয় উপভোগ করতে শিখেছে, আমার প্রতিটি শ্বাস অস্ত্রপাচারের স্বাদে উত্তপ্ত হয়ে আছে।'

কিন্তু যখন কমাণ্ডার সাহেব আমাদেরকে আহত ও শহীদদের ব্যাপারে হিদায়াত দান করছিলেন, তখন কি আর বলব—অন্তর কেমন ঘুরপাক ও অপরিপক্কতায় আক্রান্ত হয়ে যায়। আমি এ বইয়ে সফরের ঘটনাবলীই

শুধু নয়, বরং কিছু প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করছি, তাই এখানে আমার একথা স্বীকার করাই উচিত যে, মৃত্যুর এক অজানা ভীতি চুপে চুপে সারাদেহে প্রবাহিত হয়ে যায়। নানাপ্রকার আশংকা ও বিচলিতকর কল্পনা কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনের এ অবস্থা করে রাখে—

راہ وفا میں رکھنے کو رکھ تو دیا قدم

دنیائے پیچ و تاب ہے اب دل کے سامنے

'ভালবাসার পথে পা তো বাড়িয়েছি, কিন্তু এখন হৃদয়ের সম্মুখে এক জগত ঘুরপাক খাচ্ছে।' (হযরত আরেফী)

মনের জগতে ভেসে ওঠে যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত লাভের জন্য সবসময় দুআ করে এসেছি। হয়ত বা দুআ কবুলের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর হয়ত বাড়ী ফেরা নসীব হবে না। আমার একমাত্র ছেলে (মৌলভী) যুবায়েরও (সাল্লামাহু) আমার সঙ্গে রয়েছে। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। সাথে সাথে জীবন সঙ্গিনী এবং তিন মেয়ের বিষাদময় মুখচ্ছবি সম্মুখে ভেসে ওঠে।

ছোট মেয়েটি যখন আমার আফগানিস্তানের প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সে নীরবে অনেক কেঁদেছে। তারপর রওনা হওয়ার একদিন পূর্বে সে আমাকে মিনতী করে বলে যে, 'আব্বু! আফগানিস্তানে তো প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে। আব্বু! আপনি সেখানে যাবেন না এবং ভাইজানকেও যেতে দিবেন না।' আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম যে, 'বেটি! সেখানে লড়াই হচ্ছে না—জিহাদ হচ্ছে। সেখানে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা বহুবছর ধরে জীবন বাজী রেখে লড়াই করে চলছেন। মুসলমান নারীরা সাহসী হয়ে থাকে। ভীরুতা মুসলমান নারীর স্বভাব নয়। তাছাড়া আমাদের একথাও জানা নেই যে, আমরা জিহাদে সশরীরে অংশগ্রহণের সুযোগ পাব কি পাব না।'

তারপর আমি তার সঙ্গে মিথ্যা বলিনি, তবে এমনভাবে কথা বলেছি, যাতে সে একথাই বুঝেছে যে, আমরা কোন লড়াইয়ে শরীক হব না—আমি ভাবছিলাম—এখানে শাহাদত ভাগ্যে থাকলে, তাহলে সে ভাববে যে, আব্বু আমার সাথে মিথ্যা ওয়াদা করেছিলেন। যদিও আমি তার সঙ্গে ওয়াদা করিনি, কিন্তু সে আমার কথার এ অর্থ বুঝেই নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

আমাদের নিজস্ব বাড়ীটি নির্দয় ভাড়াটিয়া অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে। বর্তমানে আমরা যেখানে অবস্থান করছি, তা মাদরাসার কোয়ার্টার। আমি শহীদ হয়ে গেলে বউ বাচ্চারা কোথায় থাকবে?

বড় বোনকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমি যদিও তার অবস্থা কিছুটা আশংকামুক্ত হওয়ার পরই রওনা হয়েছি, কিন্তু জানিনা এখন তার কি অবস্থা।

দারুল উলূমের কয়েকটি নতুন কাজ অতি সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে এবং দারুল উলূমের তা'লীম ও তরবিয়তের অঙ্গনে নতুন কিছু কাজ আমার জীবদ্দশায় করার সংকল্প রাখি সেগুলোর কি হবে?

শহীদ হওয়ার পরিবর্তে অন্যান্য বহু মুজাহিদের ন্যায় হাত বা পা যদি অকেজো হয়ে যায়, তাহলে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বাহ্যতঃ মুজাহিদদের দলত্রয়কে শত্রুর জামাখোলা পোষ্টের দিকে যেতে দেখছিলাম, কিন্তু আমি নিজেই বিভিন্ন শংকা ও কুমন্ত্রণায় মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ছিলাম।

আল্লাহর সাহায্য

হঠাৎ আমার অন্তর ডেকে ওঠে এবং স্নেহপরায়ণ মুরশিদ হযরত আরেফী (রহঃ)এর পবিত্র চেহারা সম্মুখে ভেসে ওঠে। এবং তাঁর এই বাণী অন্তরে প্রবেশ করে—

جائز نہیں اندیشہ جاں عشق میں اے دل!
ہشیار کہ یہ مسلک تسلیم و رضا ہے!

'হে অন্তর! প্রেমের পথে প্রাণ হারানোর আশংকা করা অপরাধ। সাবধান!
এটি সন্তোষ ও সমর্পণের পথ।'

তখন আমি লজ্জিত হয়ে মনে মনে নিজেকে বুজদিল, ভীরু আরো অনেক রকম তিরস্কার করতে থাকি। মন বলতে লাগল—এটি তোমার পাপের ফল যে, শয়তান তোমার পথ ঠিক ঐ মুহূর্তে কালিমা লিপ্ত করছে, যখন কিনা তোমার দীর্ঘ দিনের লালিত পবিত্র এক বাসনা পূর্ণ হতে চলছে। মুরশিদের হিদায়াত স্মরণ হলো। লা হাওলা.... পাঠ করলাম। আল্লাহর নিকট বারবার কাকুতি মিনতি করে ইস্তেগফার

করলাম এবং এসব শয়তানী কুমন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দুআ আরম্ভ করলাম। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সাহায্য করলেন। একের পর এক পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত স্মরণ হতে থাকে, ফলে মনের জগৎ পাল্টে যায়।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (আলে ইমরান ১৮৫)

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

অর্থ ঃ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে আলিঙ্গন করবে। যদিও তোমরা মজবুত কিল্লায় অবস্থান।

(সূরা নিসা ঃ ৭৮)

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا

অর্থ ঃ যখন কোন প্রাণীর (মৃত্যুর জন্য) নির্দিষ্ট সময় এসে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে আর অবকাশ দেন না।

(সূরা মুনাফিকুন ১১ আয়াত)

এসব আয়াত সাবধান করে দেয় যে, মৃত্যুর যে জায়গা ও যে সময় নির্ধারিত আছে—তা যেখানেই এবং যে সময়েই হোক আসবেই। কোনভাবেই তা অগ্রপশ্চাৎ হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহর পথে শাহাদত লাভকে ভয় করা নির্বুদ্ধিতা এবং শয়তানের ধোঁকা ছাড়া আর কি? এ জাতীয় আশংকার মধ্যে এ সমস্ত মুজাহিদরাও যদি আক্রান্ত হতেন, তাহলে আজ রুশ বাহিনী পাকিস্তানের সীমান্তের কড়া নাড়ত।

نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر
نغمہ ہے سودائے خام' خون جگر کে بغیر

'কলিজার রক্ত ছাড়া চিত্র হয় অসম্পূর্ণ। কলিজার রক্ত ছাড়া সঙ্গীত হয় অপক্ক পণ্য।'

এভাবে আলহামদুলিল্লাহ মৃত্যুর ভয় ও অন্যান্য আশংকা তো উবে যায়, কিন্তু একটি নতুন ভয় এই সওয়ার হয় যে, আল্লাহ না করুন, যুদ্ধের তীব্রতায় যদি আমার পদস্খলন ঘটে, তাহলে আমার আখেরাতে কি হবে। পবিত্র কুরআনের এই ফরমান স্মরণ হয়ে অন্তর কেঁপে ওঠে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰهُ جَهَنَّمُ، وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন কল্পে কিংবা সে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত—অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান। (সূরা আনফাল ১৫–১৬ আয়াত)

কিন্তু সাথে সাথেই মহানবী (সাঃ)এর প্রার্থিত দীর্ঘ একটি দুআ স্মরণ হয়, যার সারসংক্ষেপরূপে আমি এভাবে দুআ করি—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا –

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার পথে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে মৃত্যুবরণ করা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হৃদয় ও রসনায় এই দুআ জারী হতেই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে অন্তরে নতুন ভরসা ও নতুন আস্থা জন্ম নেয়। সকল আশংকা বিদূরিত হয়। মনের এই বেদনাদায়ক অবস্থা খুব বেশী হলে মিনিট পাঁচেক স্থায়ী হয়। কিন্তু এই পাঁচ মিনিট সময়ে কি পরিমাণ চিন্তা যে অন্তরকে আক্রমণ করে বসে এবং কি পরিমাণ মধুময় স্মৃতি যে তাকে ধরাশায়ী করে, সে কথা এখন স্মরণ হলে তাতেও স্বাদ অনুভব হয়।

مرا دل ' مری رزم گاہ حیات
گمانوں کے لشکر ' یقین کا ثبات!
یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر!
اسی فقیری میں ہوں میں امیر

'আমার হৃদয় আমার জীবনের লড়াই ক্ষেত্র। একদিকে কল্পনার সেনাবাহিনী আর অপরদিকে বিশ্বাসের অবিচলতা। ওহে সাকী! এই তো ফকীরের জীবন সম্বল, এ নিয়েই আমি দরিদ্র অবস্থাতেও বিত্তশালী।'

যন্ত্রণাকর সেই পাঁচ মিনিট চলাকালে এক প্রিয় সাথী আমার নিকটে এসে নিম্নস্বরে বলে যে, 'আমরা রণাঙ্গনে অবস্থান করছি। যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। আপনার নিকট আমার আবেদন—আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আপনি আমার সন্তানদের
ধর্মীয় ও প্রচলিত শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন।' আমি
ধর্মীয় ও প্রচলিত শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন।' আমি তাকে সান্ত্বনা দান করি। কিন্তু সে কি জানে যে, সে সময় আমি নিজেও কেমন দুশ্চিন্তার আক্রমণে পর্যুদস্ত। অন্যান্য সাথীদের মনের অবস্থা তো বলতে পারি না। সবাই নীরব ছিল, প্রত্যেকের ঠোঁট ধীরে ধীরে নড়ছিল।

ہزار خوف ہو ' لیکن زباں ہو دل کی رفیق
یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

'হাজার ভীতির মাঝেও রসনা যেন হৃদয়ের সঙ্গী থাকে।
আদিকাল থেকে এই ছিল আল্লাহওয়ালাদের পন্থা।'

যুদ্ধের ময়দানে

ড্রাইভাররা জীপগুলোকে নাজানি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল। এগুলো সেই জীপই ছিল, যেগুলো ভাড়ার বিনিময়ে আমাদেরকে বাগাড় থেকে খানিকেল্লা এবং সেখান থেকে এখানে এনেছিল। তাদেরকে তালাশ করতে আরো কয়েক মিনিট লেগে যায়। এই ফাঁকে আমি নতুন করে উযু করি। রণাঙ্গন বেশী দূরে নয়। ভাবছিলাম পায়ে হেঁটেই রওনা করি। ইতিমধ্যে একটি জীপ চলে আসে। জীপটিতে করে হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেবের সঙ্গে আমি সহ কয়েকজন সাথী রওনা হয়ে যাই। তার মধ্যে সহকারী কমাণ্ডার ক্বারী নেয়ামতুল্লাহ সাহেব এবং আরো কয়েকজন পুরাতন মুজাহিদও ছিলেন। অবশিষ্ট সাথীরা এই জীপেরই ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকেন।

মুজাহিদদের সেই দলত্রয়টি পাহাড়ের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে রণাঙ্গনে গিয়েছেন। আমাদের জীপটি পাহাড়ের পাদদেশ সংলগ্ন সামান্য উন্মুক্ত জমিনের উপর দিয়ে উরগুন উপত্যকা অভিমুখে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পথটি কিছুটা বিপদজনকও ছিল। কারণ, এখান থেকে আমাদের ও জামাখোলা পোষ্টের মাঝে শুধুমাত্র ছোট ছোট কয়েকটি টিলা আড়াল করে রেখেছিল। কোন কোন জায়গায় টিলাও ছিল না।

দুশমন আমাদেরকে সহজেই দেখে ফেলতে পারে। আফগান ড্রাইভার অতি সাবধানে অগ্রসর হচ্ছিল। মুজাহিদ সাথীরা আমাদেরকে শুনিয়ে এ আয়াতটি পাঠ করেন—

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ -

অর্থ ঃ আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।

(সূরা ইয়াসীন ৯ আয়াত)

আমরাও এ আয়াত পাঠ করতে থাকি। স্মরণ হলো—এ আয়াত শত্রুর দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার পরীক্ষিত আমল। জিহাদের প্রত্যেক অবস্থার উপযোগী কুরআন ও হাদীসের দুআসমূহ মুজাহিদদের খুব ভালভাবে মুখস্থ আছে—

جس منزل دشوار پہ اب دل کا گذار ہے

اک ایک قدم پر وہاں آتا ہے خدا یاد

'হৃদয় যে কঠিন গন্তব্য অতিক্রম করছে,
তার প্রতি পদে পদে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।'

এসব দুআই মূলত মুজাহিদদের সর্ববৃহৎ অবলম্বন এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী হাতিয়ার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থ ঃ দুআ মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আসমান ও জমিনের নূর। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

এভাবে আল্লাহকে স্মরণ করার বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করায় তাদের ঈমান ও ইয়াকীন দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করছে।

একটি শুষ্ক নদী পার করানোর জন্য জীপটি সামান্য দাঁড় করালে সহকারী কমাণ্ডার সাহেব ড্রাইভারকে আওয়াজ দিয়ে বলেন—'জলদি কর, দুশমন ডান দিকে একেবারে সম্মুখে।' এবং প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ছোট বড় কয়েকটি অস্পষ্ট বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন—'এটিই

জামাখোলা চৌকী।'

আমি খুব তাড়াতাড়ি যুক্তি পেশ করে বলি। জীপ খুব সহজেই দুশমনের নজরে পড়তে পারে এবং একটি গোলাই সবার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তাই এখান থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত।

সহকারী কমাণ্ডার সাহেব সাথে সাথে আমার কথা সমর্থন করলেন। সম্ভবত তিনি এটিই চাচ্ছিলেন। ড্রাইভার তো এ প্রস্তাবকে লুফে নেয়।

আমরা আমাদের ক্লাশিনকোভ সামলে নেই এবং দ্রুত জীপ থেকে অবতরণ করে মাথা নিচু করে নদী পার হই। জীপ বাকী সাথীদেরকে আনার জন্য ফিরে যায়। এখান থেকে আমরা উঁচু নিচু টিলার আড়াল দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হই। কিছু দূর গিয়ে পুনরায় কোন আড়াল ছাড়া পথ অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু এমন লাগছিল, যেন আল্লাহ তাআলা দুশমনকে অন্ধ করে দিয়েছেন। তাদের উপর মৃত্যুর নীরবতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

রণাঙ্গনের চিত্র

আমাদের সম্মুখে ডানে বামে সুদূর বিস্তৃত একটি নিচু কাঁচা টিলা দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর তার আড়ালে মুজাহিদদেরকে দণ্ডায়মান দেখতে পাই। এঁরা হলেন কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদল। তাঁরা টিলার উপর নিজেদের মর্টার তোপ বসিয়ে দেন। কমাণ্ডার সাহেবের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আমাদেরকে পেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কমাণ্ডারের ইউনিফর্মে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁর দৃঢ় সংকল্পের সেই প্লাবনের সংবাদ দিচ্ছিল, যা সচরাচর তাঁর মুচকি হাসির আড়ালে ঢাকা থাকে।

اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا
ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز
جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن
جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز

'হে দরবেশদের সমাবেশ! বল, সেই খোদাপ্রেমিক কেমন? যার বক্ষমাঝে প্রলয়ের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ লুকিয়ে রয়েছে। যার বক্ষ যিকিরের উত্তাপে অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তময়। যার চিন্তার গতি বিদ্যুতের চেয়েও গতিময়।'

তিনি পায়ের পাঞ্জার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে জামাখোলা পোষ্টের উপর তাঁর ঈগলের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে করতে বললেন, ঐ ভীরুর দলেরা পুনরায় ভূগর্ভস্থ কক্ষে এবং মোর্চার মধ্যে আত্মগোপন করেছে।

তারপর আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন—'আমরা আমাদের রণাঙ্গনকে ডানে বামে প্রায় এক এক কিলোমিটার পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি করে বিস্তৃত করেছি। যেন দুশমনের কোন আত্মগোপনকারী বাহিনী ডান বা বাম দিক থেকে জবাবী আক্রমণ করতে না পারে। এটি শুধুমাত্র লড়াইয়ের মূলনীতির ভিত্তিতে করা হয়েছে। অন্যথা আল্লাহর মেহেরবানীতে দুশমন এত সন্ত্রস্ত থাকে যে, তারা কখনোই বাইরে বের হয়ে আক্রমণ করার সাহস করেনি।

যে টিলার আড়ালে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তার উচ্চতা সর্বাধিক এক মানুষ পরিমাণ হবে। পশ্চিমে বাম দিকের টিলাটি ক্রমান্বয়ে উঁচু হতে হতে প্রায় আধা কিলোমিটার পর একটি উঁচু পাহাড়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেই পাহাড়ের উপরও আমাদের মুজাহিদদের একটি দলকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত দেখতে পাই। তাঁদের নিকট এন্টি এয়ারক্রাফট ছিল। তাঁরা সেটিকে পাহাড়ের চূড়ার উপর ফিট করে রেখেছে। এন্টি এয়ারক্রাফট বিমান এবং হেলিকপ্টারকে তো শিকার করেই, ভূমি থেকে ভূমিতেও আঘাত করে। পূর্বে ডানদিকের টিলাটি ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে আধা ফার্লং (১১০ গজ) পর বিস্তৃত ময়দানে গিয়ে শেষ হয়েছে। ঐ ময়দানের কিছু ভিতর দিকে মুজাহিদদের তৃতীয় দল নদী–নালা এবং নিজেদের খননকৃত পরিখার মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিল যে, আমরাও তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

জামাখোলা চৌকির পশ্চাতে ও আশে–পাশে দুশমনের 'নেক মুহাম্মাদ' পোষ্ট সহ আরো কয়েকটি চৌকি রয়েছে। এ সমস্ত চৌকি উরগুন ছাউনী এবং উরগুন শহরের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তৈরী করা হয়েছে। সেগুলো এই টিলার পশ্চাতে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। আমি সেগুলোকে দেখতে পেলাম না। জামাখোলা চৌকির পিছনে একসারি টিলা রয়েছে। যা উত্তরে তুষারাচ্ছাদিত পর্বতের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

জামাখোলা চৌকি এবং আমাদের এই টিলার মাঝখানে একটি

উন্মুক্ত ময়দান রয়েছে। ময়দানটিতে রাশিয়ানরা তাদের নিরাপত্তার জন্য মাইন বিছিয়ে রেখেছে। এমনিভাবে ঐ চৌকি পর্যন্ত সমস্ত পথ এবং প্রত্যেকটি নদীনালাও মাইন দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে। বিশেষ করে চৌকি সংলগ্ন চতুর্দিকে তো তারওয়ালা মাইনের পনের গজ চওড়া এমন বেড়া রয়েছে, যার মধ্যে একটি পা রাখার মত জায়গাও ফাঁকা নেই।

এমতাবস্থায় ক্লাশিনকোভ দিয়ে লড়াই করার আশাই করা যায় না। কারণ, নিকট থেকে সামনাসামনি লড়াই করা তখনই সম্ভব ছিল, যখন শত্রুসেনারা আমাদের দিকে অগ্রসর হত, কিংবা আমরা চৌকির নিকট গিয়ে আক্রমণ করতাম। কিন্তু কমিউনিষ্ট সেনারা ভূগর্ভস্থ কক্ষে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল, আর মাইনের কারণে আমরাও নিকটে গিয়ে আক্রমণ করতে পারছিলাম না। কারণ এর জন্য ম্যাপ তৈরী করা, জটিল পরিকল্পনা গ্রহণ করা, এমনিভাবে ধাপে ধাপে অনেকগুলো তৎপরতা গ্রহণ ছিল আবশ্যকীয়। যেগুলোর ধারাবাহিকতা আলহামদুলিল্লাহ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে চৌকির উপর প্রতি দু' চার দিন পর পর যে ছোট ছোট আক্রমণ করা হচ্ছে—তাও এই ধারাবাহিকতারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এই পলিসির অন্তর্ভুক্ত যে, দুশমনকে অসংখ্য ক্ষুদ্র আঘাতে দুর্বল করতে হবে। চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য অবশ্যই এক দুই মাস অপেক্ষা করতে হবে।

বিধায়, আজ আমাদের আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিষ্ট বাহিনীর উপর তোপ দ্বারা গোলা বর্ষণ করে তাদের জান-মালের ক্ষতিসাধন করা এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত রাখা। নিজেদের গোলাবারুদ কম থেকে কম ব্যয় করে তাদের কেন্দ্রসমূহকে লক্ষ্যবস্তু বানানো এবং তাদের গোলাবারুদ অধিক থেকে অধিকতর ব্যয় করানো।

আমাদের অন্তরে ক্লাশিনকোভ ব্যবহারের আক্ষেপই শুধু রয়ে গেল।

প্রশান্তি

আক্রমণ আরম্ভ করার একটু পূর্বে জামাআতের সাথে আছর নামায আদায় করা হয়। নামাযের পর দুআর উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারিত করলে নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ এবং রসনা নির্বাক হয়ে যায়। আবেগাতিশয্যে দুআর ভাষা মনে আসছিল না। স্মৃতিশক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করে সেই দুআ স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে খন্দকের মাটি বহন করতে করতে রণসঙ্গীতের আঙ্গিকে করেছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পেট মাটি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সম্পূর্ণ দুআটি এই—

وَاللّٰهِ لَوْ لَا اَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا
اِنَّ الْاُوْلٰي قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا
اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا!

'আল্লাহর শপথ! (হে আল্লাহ!) আপনি না হলে আমাদের হেদায়াত নসীব হত না। আমরা না সদকা-খয়রাত করতাম, না নামাযের তাওফীক লাভ করতাম। তাই আপনি আমাদের উপর 'সাকীনা' (প্রশান্তি) নাযিল করুন। তারা (কাফেররা) আমাদের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। তারা যখনই কোন অনিষ্ট করার চেষ্টা করবে, আমরা তা প্রতিরোধ করবো।

(মুসলিম শরীফ)

কিন্তু সে সময় সম্পূর্ণ দুআর মধ্যে থেকে আমার فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا 'আমাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করুন', এটুকু মাত্র স্মরণ হচ্ছিল। আমি এটুকুই রোনাজারী করতে করতে আওড়াতে থাকি। দুআ শেষ করলে অন্তরে এমন বিরল ও বিস্ময়কর প্রশান্তি বিরাজ করছিল, যার মত প্রশান্তি সারাজীবনে লাভ করেছি বলে স্মরণ হয় না। সে সময় না বর্তমানের ফিকির ছিল, না ভবিষ্যতের কোন দুশ্চিন্তা ছিল। কি বলব! কেমন বিরল, অবর্ণনীয় ও অপার্থিব ভাব ও পুলক হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পবিত্র কুরআন জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য একটি বিরল ও বিস্ময়কর নেয়ামতের সুসংবাদ মাঝেই মাঝেই দান করেছে, তা হলো—

لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থ ঃ তাদের কোন ভীতি এবং দুশ্চিন্তা থাকবে না।

অনেক সময় একথা চিন্তা করে বিস্মিত হতাম যে, হে আল্লাহ! তখন কেমন ভাবময় অবস্থা হবে, যখন ভবিষ্যতের কোন ভয়ও থাকবে

না এবং বর্তমান বা অতীতের কোন দুশ্চিন্তাও হবে না! পৃথিবীর বুকে তো এমন অপূর্ব ভাবের কল্পনা করাও অসম্ভব মনে হয়। পরম শান্তি, নিরাপত্তা, আনন্দ ও পুলক বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেও যতক্ষণ চেতনা বহাল থাকে প্রত্যেক মানুষের নাজানি কত বিষাদ, কত চিন্তা, কত সমস্যা এবং কত শংকা লেগে থাকে। কিন্তু জিহাদের ময়দানের বরকতে আল্লাহ তাআলা সেই বিরল–বিস্ময়কর নেয়ামতের এক ঝলক এখানে দেখিয়ে দেন। প্রত্যেক সাথী প্রকটভাবে উপলব্ধি করেন—

دیکھا جو اپنے دل میں وہ دیکھا نہ پھر کبھی

یوں تو مری نگاہ سے دنیا گذری گئی

'হৃদয় জগতে যা দেখেছি, পুনরায় আর তা কখনো দেখতে পাইনি। যদিও আমার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে এক জগৎ অতিক্রম করেছে।'

নামাযের পরই কমাণ্ডার সাহেব ওয়াকিটকির মাধ্যমে বাম দিকের পাহাড়ের উপর মোর্চা করা মুজাহিদদলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কথোপকথন চলছিল প্রতীকী শব্দের মাধ্যমে, যেন দুশমনের ওয়ারলেস তা হরণ করলেও বুঝতে না পারে। আমরা শুধুমাত্র কমাণ্ডার সাহেবের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। পাঠক আপনারাও তা শুনুন—

'আস্‌সালামু আলাইকুম' ....

'জ্বি হাঁ' ....

'তুমি বল খাবার তৈরী কিনা?'....

'তাহলে তোমরা দস্তরখান বিছাও'....

'আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে আসছি'....

'ঠিক আছে'.....

'ওয়াআলাই কুমুস্‌সালাম'.....

ইতিমধ্যে আমাদের ঐসব সাথী এসে পৌঁছেন, যাদেরকে 'মড়যগাহ' থেকে আনার জন্য জীপ ফিরে গিয়েছিল। কমাণ্ডার সাহেবের নির্দেশ মত আমরা সবাই টিলার আড়ালে বসে পড়ি। শুধুমাত্র দু' চারজন পুরাতন অভিজ্ঞ মুজাহিদ তাঁর সঙ্গে মর্টার তোপের নিকট থেকে যায়।

কমাণ্ডার সাহেব বলে দিয়েছিলেন—আমরা তোপ দ্বারা প্রথম ফায়ার করলেই দুশমন গোলা বর্ষণ করে আমাদেরকে নিশানা বানানোর চেষ্টা করবে। তাদের নিকট সোজা গোলা বর্ষণকারী তোপ ছাড়া মর্টার তোপও

রয়েছে। তার গোলা উপরে গিয়ে কামানের মত হয়ে নিচে পতিত হয়। যেন তা পাহাড় বা টিলার পশ্চাতে আত্মগোপনকারী মুজাহিদদেরকেও লক্ষ্য বানাতে পারে। দুশমনের ফায়ারের আওয়াজ কেমন হবে, তারপর ঐ গোলা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে কেমন আওয়াজ শোনা যাবে, মাটিতে পতিত হয়ে বিস্ফোরণ কালে কেমন শব্দ হবে, তাও তিনি বলে দিয়েছিলেন। এবং এও বলে দিয়েছিলেন যে, গোলা বিস্ফোরিত হওয়ার পর তার জ্বলন্ত ধারালো লোহার টুকরা রাইফেলের গুলির গতিতে অনেক দূর পর্যন্ত উড়ে যায় এবং সেগুলো রাইফেলের গুলির চেয়েও অধিক মারাত্মক রূপ ধারণ করে। তা থেকে আত্মরক্ষা করার পন্থা এই যে, দুশমনের ফায়ারের শব্দ শুনতেই সবাই মাটির উপর শুয়ে পড়বে। কারণ, বিনা কারণে নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা শরী'অত পরিপন্থী কাজ।

فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند
مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا

'প্রকৃতির দাবী অনুপাতে আমলের পথ বন্ধ করো না। সন্তোষ ও সমর্পণের উদ্দেশ্যই অন্য কিছু।'

আক্রমণের সূচনা

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব দুশমনের একটা মোর্চার উপর মর্টার তোপের নিশানা তাক করে উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলেন। উত্তরে আমরা সবাই আকাশ বিদীর্ণকারী 'আল্লাহু আকবার' তাকবীরে গর্জে উঠি। মুজাহিদরা পূর্বেই বলেছিলেন যে, আমরা সব সময় তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে আক্রমণ আরম্ভ করি। কারণ, দুশমন এতে মারাত্মক ভয় পেয়ে যায়। মুজাহিদরা তাদের স্বচক্ষে দেখা সেই ভীতির অনেক মনোমুগ্ধকর ঘটনা আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন। তাকবীর ধ্বনির গর্জনের ভিতর দিয়ে আমাদের কামান গর্জে ওঠে। আমরা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতে থাকি—

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

অর্থ ঃ এবং [(হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন

আপনি কংকর নিক্ষেপ করলেন তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন। (আনফাল, ১৭)

এই আয়াত ঐ সময় নাযেল হয়েছিল, যখন বদরের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুঠভর্তি কংকর নিয়ে কাফের বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। রাসূলের মু'জেযা স্বরূপ দুশমনের প্রত্যেক সিপাহী তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

কমাণ্ডার সাহেব যে গোলা দ্বারা ফায়ার করেছিলেন তার বিস্ফোরণের আওয়াজ আনুমানিক ৩০/৪০ সেকেণ্ড পর শ্রুতিগোচর হয়। সাথে সাথে দূরবীনে নিয়োজিত মুজাহিদগণ 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলে সুসংবাদ শোনায় যে, গোলা সঠিক স্থানে আঘাত হেনেছে। বাম দিকের পাহাড়ে নিয়োজিত মুজাহিদ দলও তৎক্ষণাৎ ওয়ারলেস যোগে মুবারকবাদ প্রদান করে বলেন যে, গোলা ঠিক মোর্চার উপর বিস্ফোরিত হয়েছে। এটি ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের নুসরাত। অন্যথায় সাধারণত মর্টার তোপের প্রথম ফায়ার সঠিক নিশানায় আঘাত করে না। দু'একটি গোলা ভ্রষ্ট হওয়ার পরই সঠিক টার্গেট স্থির করা সম্ভব হয়। কিন্তু এখানে তো প্রতি মুহূর্তে এ হাকীকতের পর্দা উন্মোচিত হচ্ছিল—

وے ولولہ شوق جسے لذت پرواز
کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ و مہرکو تاراج
مشکل نہیں یاران چمن ' معرکہ باز
پر سوز اگر ہو ' نفس سینہ دراج

'প্রেমের উচ্ছাস যাকে উড্ডয়নে উৎসাহিত করে, সে অতি তুচ্ছ হলেও রবি শশীকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। কাননের বন্ধুরা! তুচ্ছ পাখির হৃদয়ে লড়াকু সৈনিকের দহন থাকলে তার জন্য এটা কোন জটিল ব্যাপার নয়।'

অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে দুশমনের ট্যাংক ও তোপের গোলাবর্ষণের আওয়াজ মুহুর্মুহু গর্জে উঠতে থাকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ডজন খানেক গোলা আমাদের ডানে, বামে ও পশ্চাতে অনেক দূরে পতিত হয়ে বিস্ফোরিত হতে আরম্ভ করে। ট্যাংকের গোলার তো এজন্য কোন আশংকা ছিল না যে, তা সোজা গিয়ে আঘাত করে। এর দ্বারা সেই আক্রান্ত হতে পারে যে টিলা ইত্যাদির আড়ালে নেই। তবে দুশমনের

মর্টার তোপও অগ্নি উদ্গীরণ করছিল। যার গোলাসমূহ কামানের মত ক্রমশ উপরে উঠে নিচে নেমে আসে। এর দ্বারা তারা আমাদেরকে টিলার পশ্চাতে নিশানা বানাতে পারতো। কিন্তু তাদের চেতনার মত নিশানাও বিভ্রান্ত হচ্ছিল। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে এমন প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছিলেন যে, গোলা বর্ষণের এই লড়াই জীবনের পরম আনন্দময় স্মরণীয় খেলার রূপ ধারণ করে। চতুর্পাশে একই মুহূর্তে ভীষণ আওয়াজে যেসব গোলা বিস্ফোরিত হচ্ছিল—কয়েক মিনিটের মধ্যেই কান তাতে এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, চুলায় বুট ভাজার পটপট শব্দের মত তা গুরুত্বহীন হয়ে যায়।

رہے ہیں ' اور ہیں فرعون میری گھات میں ابتک
مجھے کیا غم کہ میری آستین میں ہے ید بیضاء

‘ফেরাউন অতীতেও এবং বর্তমানেও আমার জন্য ওৎ পেতে আছে। কিন্তু আমার আস্তিনের মধ্যে ‘ইয়াদে বায়যা’ [(‘দীপ্তিময় হস্ত’–এর দ্বারা মূসা (আঃ)এর মুজিযার প্রতি ইঙ্গিত করে অলৌকিক শক্তি বুঝানো হয়েছে।)] থাকতে আমার কিসের চিন্তা?’

কমাণ্ডার যুবায়েরের দ্বিতীয় গোলা

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব এ অবসরে তাঁর কামানকে দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করে নেন। তখন তিনি চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ আবার কখনো ভাসা ভাসা দৃষ্টি ফেলে এমনভাবে হাঁটাহাঁটি করছিলেন, যেমন কিনা ক্রিকেট ম্যাচে বোলার প্রথম সফল বল নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় বার নিক্ষেপ করার জন্য বল ফিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকে। এর মধ্যে এ কৌশলও নিহিত ছিল যে, নিজেদের গোলা নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত গোলাবর্ষণ হতে থাকে ততক্ষণ নিরব থাকো। তাদের গোলা বর্ষণের উৎসের দিকে লক্ষ্য করে নিজেদের নতুন লক্ষ্য বের করো। তারপর যখন দুশমন শ্বাস গ্রহণের জন্য গোলা বর্ষণে ক্ষান্ত দেয়, তখন ‘স্বর্ণকারের শত ঘা’ এর উত্তরে ‘কর্মকারের এক ঘা’ রূপে গোলার দ্বিতীয় আঘাত কর। যাতে নিজেদের গোলা বারুদ অতি কম এবং দুশমনের গোলা বারুদ অধিকতর বেশী ব্যয় হয়।

শত শত গোলা নষ্ট করার পর দুশমনের গোলা বর্ষণ বন্ধ হতেই কমাণ্ডার সাহেব দ্বিতীয় গোলাটি নিক্ষেপ করেন। দুশমনের ট্যাংকের

একেবারে নিকটে গিয়ে সেটি বিস্ফোরিত হয়। কতক তরুণ সাথী আনন্দাতিশয্যে টিলার উপর আরোহণ করে দুশমনের অবস্থা দেখছিল। কারণ—

ہے سلسلہ احوال کا ہر لحظہ دگر گوں

'পটের ধারাবাহিকতা প্রতি মুহূর্তে ভিন্নরূপ ধারণ করছিল।'

দুশমনের অর্থহীন গোলা বর্ষণ

ওদিকে দুশমন বাধ্য হয়ে পুনরায় ফায়ারিং আরম্ভ করে। তাদের গোলা আমাদের ডান, বাম এবং উপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে চলে যাচ্ছিল। আমি হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেবের ডান দিকে ছিলাম আর আমার ডানদিকে ছিলেন ভাই জনাব মুহাম্মাদ বিন্নুরী। তারপর অপরাপর সাথীরা ছিলেন। আমরা সবাই টিলার সঙ্গে টেক লাগিয়ে দক্ষিণ দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে বসেছিলাম। উত্তর দিক থেকে নিক্ষিপ্ত দুশমনের বিস্ফোরিত গোলা থেকে উত্থিত ধোঁয়া ও ধূলাবালির মেঘ দর্শন করছিলাম। দুশমনের ফায়ার করার শব্দ শুনে শুয়ে পড়ার উপদেশের উপর প্রথম প্রথম আমল করা হয়। কিন্তু দুশমনের বেদিশা অবস্থা এবং তাদের লক্ষস্থিরের পারদর্শিতা (?) দেখে শুয়ে পড়তে কৃত্রিমতা অনুভব হতে থাকে। তাই এখন শুধু ঐ সময় শোয়া হচ্ছিল, যখন কোন গোলা নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল। কোন কোন গোলার জ্বলন্ত টুকরা পাশে এসেও পতিত হচ্ছিল। প্রত্যেকে তা হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তীব্র শীতের মধ্যেও তার তপ্ততা এত অধিক ছিল যে, অনেক দেরীতেই তা হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল।

অপরদিকে আমাদের কিছু উৎসাহী বন্ধু গোলাবর্ষণকে উপেক্ষা করে টিলার একেবারে উপরে উপবেশন করছিল এবং কখনো দাঁড়িয়ে দুশমনের গতিবিধি দেখছিল। একজন নীচে চলে এলে অপর সাথী তার স্থান দখল করছিল। এ অবস্থা রণাঙ্গনকে অধিকতর উপভোগ্য করে দেয়। কারণ, এতে করে প্রতি মুহূর্তে আঘাতের ফলাফল জানা যাচ্ছিল। কিন্তু সামরিক নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল মারাত্মক ভুল। দুশমনের জন্য সবচেয়ে সহজ লক্ষ্যবস্তু ঐ ব্যক্তি হয়, যে টিলা, পাহাড় ইত্যাদির উপরাংশে (স্কাইলাইন)-এ থাকে। তাছাড়া এতে কমাণ্ডার সাহেবের উপদেশও লংঘন হচ্ছিল। তিনি তো মেজবান হওয়ার কারণে কিছু

বলছিলেন না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আমাকেই নিবেদন করতে হয়। তখন নিয়ম ভঙ্গের এ ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়। তবে বাস্তবতা এই যে, আমরাও শুধুমাত্র রণাঙ্গনেরর মূলনীতি এবং আমীরের নির্দেশ পালনার্থেই নীচে বসেছিলাম। অন্যথায় মনতো কিছুক্ষণ পরপরই বলছিল—

کب تک رہے محکومی انجم میں مری خاک
یا میں نہیں ' یا گردش افلاک نہیں ہے!

'আমার অস্তিত্ব কতদিন নক্ষত্রের অধীন হয়ে থাকবে, আমার অবর্তমানে
তো আকাশের পরিভ্রমণও স্তব্ধ হয়ে যাবে।'

এবার দুশমনের গোলাবর্ষণ ছিল আরো তীব্র। দীর্ঘক্ষণ তা অব্যাহত থাকে। তারপর তাদের গোলাবর্ষণ বন্ধ হতেই কমাণ্ডার সাহেব তৃতীয়বার ফায়ার করেন। এ গোলাটি দুশমনের আরেকটি মোর্চার উপর গিয়ে আঘাত হানে। আমাদের তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়। দুশমনের তোপ আরো মরিয়া হয়ে অগ্নি উদগীরণ করতে আরম্ভ করে, কিন্তু তার অবস্থা এ কথাই বলছিল—

مرے نالے ہیں میرے دل کی تسکین
مجھے مطلب نہیں ان کے اثر سے

'অন্তরের তৃপ্তির জন্যই আমার এ আর্তনাদ।
তার ফলাফল আমার উদ্দেশ্য নয়।'

নব আগন্তুকদের গোলাও সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব সহাস্যে আমার নিকট এলে আমি বললাম, 'আমরা সবাইও কমপক্ষে একটি একটি করে গোলা নিক্ষেপ করি।' আমার প্রস্তাব শুনে তাঁর মুখোমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

শ্রদ্ধাবনত মস্তকে বললেন—'এখন সবকয়টি গোলা আপনাদেরকেই পালাক্রমে ফায়ার করতে হবে। আমি শুধু কামানকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করে দেব।'

এবার তিনি খুব সতর্কতার সাথে কামান ফিট করলেন এবং দুশমনের গোলা বর্ষণকালে তার লক্ষ্যবস্তুকে চেক করতে থাকেন। অনেক অপেক্ষার

পর দুশমনের গোলা বর্ষণ যখন বন্ধ হয়, তখন তিনি নিকটে এসে শ্রদ্ধাভরে হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেবকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য আহবান করেন। তখন মুজাহিদদের আবেগ উত্তেজনা দেখার মত ছিল। আকাশ বিদীর্ণকারী 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনির মধ্যে হযরত ফায়ার করেন। তিনি ফিরে এসে স্বস্থানে বসতেই তাঁর নিক্ষিপ্ত গোলা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। তখন আকাশ পুনরায় তাকবীর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়। জানা যায় যে, যে দুই মোর্চার উপর প্রথম এবং তৃতীয় গোলা বিস্ফোরিত হয়েছিল এই চতুর্থ গোলা সেই মোর্চাদ্বয়ের মাঝখানে পতিত হয়ে বিস্ফোরিত হয়। এতে বাহ্যতঃ উভয় মোর্চা ও তার সৈন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

فقر جنگاہ میں بے ساز و یراق آتا ہے
ضرب کاری ہے' اگر سینہ میں ہے قلب "سلیم"

'যে ব্যক্তি দারিদ্র্য নিয়ে অশ্ব ও রসদহীন অবস্থায় রণাঙ্গনে আসে। বক্ষমাঝে 'সলীম' (সুস্থ) হৃদয় থাকলে সেও কার্যকর আঘাত হানে।'

দুশমনের ট্যাংক ও কামান এবার গোলার যে প্রচণ্ড বর্ষণ আরম্ভ করে, তার মধ্যে ক্রোধের লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট। কারণ, এখন তাদের গোলা আমাদের অবস্থান থেকে অনেক দূরে গিয়ে পতিত হচ্ছিল।

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব—যাকে লড়াইয়ের বর্তমান অবস্থা আনন্দের সাথে বিনয় এবং সংকল্পের সঙ্গে পরিনামদর্শিতার অপূর্ব ও মহান প্রতিচ্ছবি বানিয়েছিল—নিকটে এসে দাঁড়ান এবং হযরত মাওলানাকে সহাস্যে বলেন—হযরত! আপনার ফায়ার তাদের উপর মোক্ষম আঘাত হেনেছে। আমাদের বহুবারের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, তাদের উপর যত বেশী কার্যকর আঘাত হয়, তারা ততদীর্ঘ সময় এলোপাতাড়ী ফায়ারিং করতে থাকে। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, তাদের গোলা বর্ষণ কত তীব্র ও অধিক হয়েছে।

তিনি আবার নতুন নিশানায় কামান তাক করতে চলে যান। আর আমি ব্যাকুল হয়ে তার 'ডাকের' অপেক্ষা করতে থাকি। হৃদয় বলছিল—'ইয়া আল্লাহ! জীবনে এই প্রথম আপনার দুশমনের উপর কামান চালানোর সুযোগ লাভ করছি, আর আপনিই জানেন—ভবিষ্যতে আর এই সৌভাগ্য হবে কি হবে না? যদি এই আঘাত নিস্ফল হয়,

তাহলে সারাজীবন আফসোস রয়ে যাবে, ইয়া আল্লাহ এ আঘাতকে আপনি দুশমনের জন্য 'ধ্বংসাত্মক' এবং আমার জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন।' আর এ ছাড়া আরো যেসব মসনুন দুআ মনে আসছিল, তা পাঠ করে যাচ্ছিলাম।

অবশেষে দুশমনের গোলা বর্ষণ থামতেই কমাণ্ডার সাহেব সহাস্যে এসে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। কামান নিকটেই টিলার সুউচ্চ চূড়ায় একটু নীচে বসানো ছিল, শুধু কামানের মুখ টিলার উপরে ছিল। যা অত্যাধিক সতর্কতার সাথে তাক করা হয়েছিল। আমার কাজ ছিল শুধু ফায়ার করা।

আজ সকালে 'খানিকেল্লায়' এন্টি এয়ারক্রাফট' দ্বারা ফায়ার করার কিছু অনুশীলন করেছিলাম। কিন্তু মর্টার তোপের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তাতে স্তম্ভাকৃতির একটা মুখও ছিল। কমাণ্ডার সাহেব একটি ভারী গোলা আমার দুই হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—এটাকে সরু দিক থেকে ঐ স্তম্ভের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। এটা ভিতরে গিয়ে পৌঁছতেই ফায়ার হবে। কিন্তু আপনি গোলা ভিতরে ঢুকানো মাত্র দু' হাত দিয়ে কান চেপে ধরে ডান দিকে সরে আসবেন। যেন বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ কানে না আসে। এবং গোলার খোলস যা তৎক্ষণাৎ বাম দিকে ছিটকে পড়ে তা থেকে নিরাপদ থাকেন। চোখাকৃতির এই ভারী গোলাটি ছিল আনুমানিক এক বা সোয়া ফুট লম্বা এবং ছয় সাত ইঞ্চি মোটা। পিছনে তীরের মত চরকার ন্যায় একটি বস্তু লাগানো ছিল।

গোলা মুখ দিয়ে প্রবেশ করতেই নল দিয়ে ভয়ংকর আওয়াজ করে দুশমনের দিকে ধেয়ে যায়। আমি মনে মনে একথা বলতে বলতে ফিরে আসি—

شعلہ بن کر پھو نکدے ' خاشاک غیر اللہ کو

خوف باطل کیا' کہ ہے ' غارت گر باطل بھی تو

'গাইরুল্লাহর খড়কুটাকে অগ্নিশিখা হয়ে ভস্ম করে দাও। বাতিলের ভয় কিসের, বাতিলের যমই তো তুমি !'

গোলা বিস্ফোরণের শব্দ হতেই দূরবীনে নিয়োজিত মুজাহিদরা সুসংবাদ শোনায় যে, 'এটি তৃতীয় মোর্চার উপর আঘাত করে বিস্ফোরিত হয়েছে।' তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পুনরায় প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। কৃতিত্ব তো পুরোটাই ছিল কমাণ্ডার সাহেবের। কিন্তু আমার জন্য এ

সৌভাগ্যও কম কিসের যে, আল্লাহ তাআলা আমার মত আনাড়ী এবং ভীরুর হাতের স্পর্শ তাতে লাগিয়েছেন। আনন্দে আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ (হে আল্লাহ তোমার জন্যই সকল প্রশংসা এবং তোমার জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা।

দুশমনের ব্যর্থ চাল

গোলা সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে কিনা তার সত্যায়নের জন্য কমাণ্ডার সাহেব নিয়মমাফিক পাহাড়ে নিয়োজিত মুজাহিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—

'ভুল মারছো, পিছনে মারো, অনেক পিছনে।'

সাথে সাথে পরিচিত কণ্ঠস্বর 'লোকমা' দিয়ে বলে ওঠে—

'কমাণ্ডার সাহেব একথা দুশমনের। গোলা ঠিক মোর্চার উপর বিস্ফোরিত হয়েছে। আপনারা সঠিক নিশানায় আঘাত হানায় সন্ত্রস্ত হয়ে তারা আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে।'

কমাণ্ডার সাহেব সেই অপরিচিত শব্দকে সম্বোধন করে পশতু ভাষায় ইতমিনানের সঙ্গে বললেন—'ঘাবড়িও না' সমস্ত লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে আমাদের জানা আছে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ফায়ারও সেখানেই পতিত হবে, যেখানে আমরা চাব।'

উত্তরে দুশমন উন্মাদের ন্যায় গালি বকতে আরম্ভ করে। তখন কমাণ্ডার সাহেব ওয়ারলেসের সংযোগ ছিন্ন করে দেন।

এবার দুশমন ট্যাংক, মর্টার তোপ, এ্যান্টি এয়ারক্রাফট, জেকুয়্যাক (একপ্রকারের এন্টি এয়ার ক্রাফট গান) দ্বারা যেভাবে এলোপাতাড়ি গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে, তাতেও বুঝা যায় যে, তারা অস্থির হয়ে উঠেছে।

فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کار زار

'রণাঙ্গনের উত্তপ্ততা পূর্ণ বিজয়ের সুসংবাদ বহন করে।'

স্বল্পবয়সী এক মুজাহিদের আত্মবিশ্বাস

স্বল্পবয়সী একজন পাকিস্তানী মুজাহিদ। তার বয়স সর্বোচ্চ পনের বছর হবে। 'খানীকেল্লায়' সে প্রশিক্ষণ রত ছিল। আজকের লড়াইয়ে সেও অংশগ্রহণ করেছে। সে টিলা থেকে বেশ দূরে খোলা ময়দানে বসেছিল।

সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দুশমনের জামাখোলা চৌকি দেখা যায়। আমাদের পক্ষ হতে ফায়ার হলে সে পায়ের পাঞ্জার উপর দাঁড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গোলা পতিত হওয়া ও বিস্ফোরিত হওয়ার চাক্ষুস অবস্থা পরম আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সাথে শোনাচ্ছিল। তারপর দুশমনের পক্ষ হতে ফায়ার হলে সে তখন ঘোষণা করত—'ঐ দেখ গোলা আসছে। এটাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।' আমরা তাকে এরূপ করতে বারবার নিষেধ করি। কিন্তু সে শুনেও শুনছিল না।

এবার যখন দুশমনের গোলা বর্ষণ তীব্রতর হচ্ছিল এবং গোলার ভগ্নাংশ অধিক হারে নিকটে এসে পড়ছিল, তখন আমরা তাকে পুনরায় বুঝিয়ে বলি যে, 'বেটা! এভাবে উন্মুক্ত ময়দানে থাকা বিপদজনক। এখানে এসে টিলার সাথে মিশে বস।' সে নিশ্চিন্তে উত্তর দেয়—'হযরত! আপনারা চিন্তা করবেন না, আমি গত দশ দিনে এ রকম কয়েকটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছি। বিশ্বাস করুন, দুশমনের এসব গোলা আমাদের জন্য তৈরীই হয়নি। এগুলো তো শুধু ধ্বংস হওয়ার জন্যই তৈরী হয়েছে।'

এই 'ঈগলছানা'র উত্তর সমরনীতি এবং নিয়ম শৃংখলার যতই পরিপন্থী হোক না কেন, কিন্তু আমাদের স্বচক্ষে দেখা সেই বিরল–বিস্ময়কর 'হাকীকতের' ভাষ্যকার ছিল যে, আল্লাহ তাআলা দুশমনকে হয় অন্ধ করে দিয়েছিলেন, যে কারণে তারা এ পর্যন্ত আমরা কোত্থেকে গোলা বর্ষণ করছি, তাই বুঝে উঠতে পারছিল না। অথবা তাদেরকে এমন অসহায় করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকটি গোলা হয় অন্য কোন টিলাতে আছড়িয়ে পড়ছিল, অথবা দূরে মাঠে পতিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

پھر افضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہیں دار
شکار زندہ کی لذت سے محروم رہا

'শকুন ঈগলের সঙ্গে আকাশে বিচরণ করলেও, যে জীবন্ত শিকারের স্বাদ থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়।'

বিরল–বিস্ময়কর ও অপূর্ব প্রশান্তি

এখন আরো অধিক সংখ্যক গোলা আমাদের মাথার উপর দিয়ে শোঁ

শোঁ করে উড়ে যাচ্ছিল। এমন ধারাবাহিক ও অবিশ্রান্তভাবে সেগুলো বিস্ফোরিত হচ্ছিল, যেন চুলায় ছোলা ভাজা হচ্ছে। কিন্তু তার তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আমাদের অন্তরে 'সাকীনা'ও (প্রশান্তি) ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রায় সকল সাথীর মুখেই এসব কথা লেগে ছিল যে, 'এ জগতটাই তো অপূর্ব।' 'বিস্ময়কর প্রশান্তি বিরাজ করছে।' 'পরিবেশে অপার্থিব ভাব ও অপূর্ব পুলক বিরাজ করছে।' 'আজ বুঝতে পারলাম 'সাকীনা' (প্রশান্তি) কাকে বলে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার মত প্রেমশূন্য পাপীও একথা না বলে পারছি না যে, সেখানে তাআল্লুক মাআল্লাহ (খোদাপ্রেম)এর যেই স্বাদ নসীব হয়, তা ভাষা ও কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গোলার এই ছায়াতলে অবস্থানকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুসংবাদ স্মরণ হয়ে হৃদয়ে ভাব ও পুলকের অপূর্ব প্লাবন শুরু হয়ে যায়।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

অর্থ ঃ মনে রেখ ! তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত। (মুসলিম শরীফ)

এটি মোটেও অতিশয়োক্তি নয় যে, আমাদের উপলব্ধি হচ্ছিল যে, ধরার বুকে শান্তি ও নিরাপত্তা, আনন্দ ও পরিতৃপ্তি কোথাও থেকে থাকলে তা এই রণাঙ্গণেই রয়েছে। ভাব ও পুলকের কোন জগত পৃথিবীর বুকে থেকে থাকলে তা কেবল গোলার ছায়াতলেই রয়েছে। দুষ্প্রাপ্য এই হাকীকতের—যাকে অনেকে নিরেট কবির কল্পনা মনে করবে—বাস্তবতা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখানে দেখিয়েছেন।

ہر طرح پر امن ہے ' آغوش گرداب فنا

اور ہر اندیشہ جاں ' دامن ساحل میں ہے

'পানির বিক্ষুব্ধ আবর্ত—ক্রোড়ের সর্বত্রই শান্তি ও নিরাপত্তা। প্রাণের যত আশংকা সবই পাড়ের বুকে।' (হযরত আরেফী (রহঃ)

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের চারটি স্থানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর সকীনা (প্রশান্তি) অবতীর্ণ করার কথা বিশেষ আঙ্গিকে উল্লেখ করেছেন। এক. ঐ সময়—যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হিজরতের পথে গারে সাওরে অবস্থান করছিলেন।

অপর দিকে কুরাইশের কাফেররা তাঁদেরকে সন্ধান করতে করতে গুহার নিকটে চলে আসে। দ্বিতীয়, বাইআতে রেজওয়ানের সময়। তৃতীয়, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়। চতুর্থ, হুনাইনের যুদ্ধকালে। আমরাও আজ আছর নামায পর আল্লাহ তাআলার নিকট মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষাতেই সকীনা (প্রশান্তি) নাযেল করার জন্য দুআ করেছিলাম।—এ পর্যন্ত বই–পুস্তকে সকীনার অর্থ প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি, সান্ত্বনা এবং সহনশীলতা পাঠ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের নিজেদেরও জানা ছিল না, আমরা আল্লাহর নিকট 'সকীনা' নাযিলের দুআ করে কেমন বিরল ও বিস্ময়কর দৌলতের প্রার্থনাই না করেছি।

যেই সকীনা ইমামুল মুজাহিদীন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তার কল্পনা করাও তো আমাদের জন্য সম্ভবপর নয়। কিন্তু তার যে ঝলক এখানের গোলা বর্ষণের মধ্যে আমাদের নসীব হয়, এতে কিছুটা অনুমান হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়তম রাসূল এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের উপর এ অনুকম্পার উল্লেখ চারবার কেন করেছেন। হযরত মুরশিদ আরেফীর ভাষায় এতটুকুই শুধু বলতে পারি—

اپنے دل کی جلوہ گاہ حسن تھی پیش نظر
کیا بتاؤں بے خودی میں کیا نظر آیا مجھے

'আমার চোখের সম্মুখে হৃদয়ের সৌন্দর্যের লীলাভূমি বিরাজ করছিল, কি বলব—আত্মহারা অবস্থায় আমি কি দেখতে পেয়েছি।'

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)এর বাণী

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) (মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান) বলতেন—জনৈক ব্যক্তি শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করে যে, সুফী দরবেশরা অনেক বৎসর পর্যন্ত তাদের মুরীদদেরকে যে ধরনের মুজাহাদা এবং সাধনা করান, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাঁর সাহাবীদের দ্বারা এমন মুজাহাদা করাতেন না। তাহলে সুফিয়ায়ে কেরাম তা কেন করান?

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) উত্তরে বলেন,—হুবহু শব্দ তো মনে

নেই, তার ভাবার্থ তুলে ধরছি। (রফী উসমানী—লেখক)

"আসল কথা এই যে, তরীকতের মধ্যে মুজাহাদা এবং সাধনা মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য—আত্মার সংশোধন। যার উদ্দেশ্য হল—আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক সঠিক ও সুদৃঢ় করা এবং নফসকে শরী'অতের আনুগত্য করতে অভ্যস্ত করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নফসের চিকিৎসারূপে এ সমস্ত মুজাহাদা করানো হয়, যেন নফস কষ্ট করতে এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরূপ অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার জন্য শরী'অতের অনুশীলন সহজ হয়ে যায়। তখন শরী'অতের উপর আমল করতে শুধুমাত্র পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন পড়ে। আর মুরশিদ এ কাজটিই সম্পাদন করে থাকেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে শুধুমাত্র জিহাদ দ্বারাই সাহাবায়ে কেরামের এ উদ্দেশ্য এত অধিক পরিমাণ হাসিল হত যে, তাঁদের অন্য কোন মুজাহাদা বা সাধনার প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা একটি মাত্র জিহাদ দ্বারাই আধ্যাত্মিকতার এমন উচ্চমার্গসমূহ অতিক্রম করতেন, যা অন্যদের বছর বছর মুজাহাদা করার দ্বারাও অর্জিত হয় না। এখনো যেসব লোক কামিল মুরশিদের তত্ত্বাবধানে থেকে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থাকে, তাদের অধিক মুজাহাদার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, জিহাদ নিজেই একটি মুজাহাদা, যা আধ্যাত্মিক ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি লাভ এবং তাআল্লুক মাআল্লাহর জন্য অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র।'

আমার গোলাবর্ষণের পর তরুণ সাথী জনাব মুহাম্মাদ বিন্নুরীর পালা ছিল। করাচীতে একটি ট্রাফিক দুর্ঘটনায় তার পায়ের হাড্ডি ভেঙ্গে যাওয়ায় তাতে লোহার রড লাগানো রয়েছে। তার জন্য উঠাবসা করা এবং পাহাড়ী পথে চলাফেরা করা সহজ ছিল না। কিন্তু জিহাদের স্পৃহা তাঁকে এখানে টেনে এনেছে। তখন তিনি ব্যাকুলভাবে তার পালার অপেক্ষা করছিলেন। দুশমনের গোলা বর্ষণ বন্ধ হতেই তিনি ফায়ার করেন। এবং তাকবীর ধ্বনির মধ্য দিয়ে সুসংবাদ লাভ করি যে, এ গোলাটিও সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে।

ব্যর্থচালের কার্যকরী জবাব

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব এই গোলা সম্পর্কে জানার জন্য ওয়াকিটকির মাধ্যমে পাহাড়ে অবস্থানকারী মুজাহিদ দলের সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপন করে বুঝতে পারেন যে, দুশমনও ওয়ারলেসে কান লাগিয়ে রেখেছে। তিনি এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। গোলা সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে পতিত হওয়ার বিষয়টি সত্যায়িত হওয়ার পর সাথে সাথে তিনি দুশমনকে নতুন দুঃশ্চিন্তায় আক্রান্ত করার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে অবস্থানকারী দলকে কৃত্রিমভাবে এমন সব হিদায়াত দান করেন, যৎদ্বারা দুশমন বুঝতে পারে যে, আজ রাতে তাদের উপর চতুর্দিক থেকে চূড়ান্ত ও সুশৃংখল আক্রমণ হতে যাচ্ছে। এবং মুজাহিদদের চারটি দলই রাতের অন্ধকারে চতুর্দিক থেকে অতি সম্প্রতি ভূমি মাইন পরিস্কারকৃত পথসমূহ ধরে একযোগে জামাখোলা পোষ্টের দিকে অগ্রসর হবে এবং গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী মুজাহিদদের কোন দল জামাখোলা এবং তার সহযোগী চৌকিসমূহ পরিপূর্ণরূপে বিজয় হওয়ার পূর্বে প্রত্যাবর্তন করবে না।" এটি ছিল একটু পূর্বে দুশমনের পক্ষ হতে মুজাহিদদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওয়ারলেস যোগে প্রেরিত ব্যর্থ চালের জবাব। এই জবাব কার্যকর প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত জানা যাবে।

সূর্যাস্তের দশ মিনিট পূর্বে আমাদের পক্ষ থেকে ফায়ার বন্ধ করে দেওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। কারণ, দিনের আলো হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে কামানের মুখ থেকে ফায়ারের সঙ্গে বিচ্ছুরিত অগ্নিশিখা স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এতে করে দুশমন সহজে তাদের লক্ষ্যবস্তু দেখতে পায়।

আমাদের প্রত্যেক সাথীর একবার করে ফায়ার করার কথা ছিল। সময়ের স্বল্পতার কারণে এখন যার পালা আসত সে দুশমনের গোলা বর্ষণ চলাকালেই কামানের নিকট গিয়ে দাঁড়াত এবং তাদের গোলা বর্ষণ বন্ধ হতেই গোলা ছুড়ে মারত। দুশমনের গোলা বর্ষণ পুনরায় পূর্বাধিক তীব্রতর হতে থাকে। প্রত্যেক ফায়ারের পর কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব যখনই পাহাড়ে অবস্থানকারী মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ করতেন তখনই দুশমনকে শোনানোর জন্য রাতের কৃত্রিম প্রোগ্রামের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু নতুন নতুন দিক নির্দেশনাও দান করতেন। এভাবে দুশমন আক্রমণ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে যায়—(যেমন পরবর্তীতে জানা যাবে)

چھپاکر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے
عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں

'আকাশ তার আস্তিনের মধ্যে বিদ্যুৎ লুকিয়ে রেখেছে।
বুলবুলি যেন গাফেল হয়ে তার নীড়ে বসে না থাকে।'

বিশটি ফায়ার যার প্রত্যেকটি যথাস্থানে আঘাত হানে

আল্লাহ তাআলা সময়ের মধ্যে এত বরকত দান করেন যে, প্রত্যেক মেহমান সাথী একটি করে ফায়ার করার সুযোগ লাভ করেন। তবে লড়াইয়ের শুরুতে করাচীর এক তরুণ সাথীর কাঁপুনি দিয়ে তীব্র জ্বর আরম্ভ হয় ; সে ফায়ার করতে পারেনি। সূর্যাস্তের দশ মিনিট পূর্বে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বশেষ ফায়ারটি করা হয়। তারপর দুশমনের গোলাবর্ষণ তো অব্যাহত থাকে, কিন্তু মুজাহিদরা মাগরিব নামাযের এবং প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতির কাজে লিপ্ত হয়। আমাদের শুধুমাত্র বিশটি গোলা ব্যয় হয়েছিল। যার প্রত্যেকটি সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। দুশমনের শত শত গোলা নষ্ট হয়েছে এবং এখনো অবিরাম নষ্ট হয়ে চলছে।

সূর্য অস্ত যেতেই একজন মুজাহিদ আযান দিতে আরম্ভ করেন। গোলার এই ছায়াতলে 'মুজাহিদের আযান' এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করে। তাঁর আযানের প্রত্যেক উত্থান পতন বলছিল—

شوق میری لے میں ہے ' شوق میری نے میں ہے
نغمہ ''اللہ ھو'' میرے رگ و پے میں ہے

'আমার সূর প্রেমপূর্ণ, আমার বাঁশরী প্রেমপূর্ণ। আল্লাহু সঙ্গীত আমার
শিরায় শিরায় পরিপূর্ণ।'

মাগরিবের নামাযের ইমামতি করেন হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেব। আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার আবেগ অশ্রুপ্লাবন রূপে নয়ন যুগল থেকে গড়িয়ে পড়ছিল। ইমামের আওয়াজও গলায় আটকে যাচ্ছিল। তিনি অতি কষ্টে কেরাত পাঠ করছিলেন। পিছনে আমরা মুক্তাদিদের কান্নাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উপরে উঠে আসছিল। অতিকষ্টে আমরা কান্নার শব্দ নিয়ন্ত্রণ করছিলাম। দেহের প্রতিটি লোমকূপ আপাদমস্তক কৃতজ্ঞতার রূপ ধরে ব্যাকুল ছিল। মাথার উপর দিয়ে এবং ডান ও বাম দিয়ে অতিক্রমকারী গোলার গর্জন ও তার বিস্ফোরণের বিকট শব্দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে রুকূ ও সিজদার মধ্যে যে খুশুখুযু এবং অপার্থিব ও অপূর্ব ভাব ও পুলক

অনুভব হচ্ছিল তা আমার জীবনের স্মরণীয় সঞ্চয়।

মুজাহিদদের যে জামা'আত আমাদের ডান দিকের ময়দানে ছিল, তারা মাগরিব নামাযের পর আমাদের নিকট চলে আসে। তাদের নিকট শুধুমাত্র রকেট লাঞ্চার এবং ক্লাশিনকোভ ছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সে দিক থেকে দুশমনের কোন বাহিনী এগিয়ে আসার দুঃসাহস করলে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া।

এন্টি এয়ার ক্রাফ্‌টও গর্জন করতে থাকে

বামদিকের পাহাড়ে অবস্থানকারী দলের নিকট এন্টি এয়ার ক্রাফট গানও ছিল। এ দলটি আমাদের জন্য বেশীর ভাগ 'ও—পি'এর দায়িত্ব সম্পাদন করছিল। তারা দুশমনের গোলা আমাদের নিকট পড়তে আরম্ভ করলে তার দিক পরিবর্তন করে নিজেদের দিকে ফেরানোর জন্য একটি দুটি ফায়ার করত। আমরা মাগরিব নামায পড়তে আরম্ভ করলে তারাই দুশমনের উপর ফায়ার করতে থাকে।

নামাযের পর আমরা আমাদের মর্টার তোপের অংশসমূহ পৃথক করে যখন প্রত্যাবর্তন করি, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। দুশমনের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সবাই রঙ্গিন কাপড় পরে এসেছিলাম। আনুমানিক এক কিলোমিটার পাহাড়ী পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার পর একটি পাহাড়ের পাদদেশে আমরা থেমে যাই। অল্পক্ষণের মধ্যে জীপ দুটি এবং হিনো ট্রাকটি সেখানেই এসে পৌছে আমাদেরকে তুলে নিয়ে সোজা খানিকেল্লার দিকে রওনা হয়। দুশমনের গোলাবর্ষণ তখনো অব্যাহত ছিল। পাহাড়ের উপর কিছুক্ষণ পরপর আমাদের এন্টি এয়ার ক্রাফট গানও গর্জে উঠছিল। পাহাড়ে অবস্থানকারী দল শুধুমাত্র মড়যগাহর ক্যাম্পের মুজাহিদদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। কিছু সময় দুশমনের সঙ্গে লড়াই করে তাদেরকেও নিজেদের ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

গোলার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের গাড়ী তিনটি লাইট না জ্বালিয়েই পথ চলছিল। শা'বান মাসের অষ্টাদশ তারিখ হওয়া সত্ত্বেও মেঘের কারণে যথেষ্ট অন্ধকার ছিল। এমতাবস্থায় কাঁচা গিরিপথের তীক্ষ্ণ চোখা পাথরসমূহ এবং পথের আঁকাবাঁকা ও উত্থান–পতনও কম বিপদজনক ছিল না। প্রতি মুহূর্তে গাড়ি গর্তে পতিত হওয়ার কিংবা কোন

টিলার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমাদের শিরায় শিরায় বিরাজমান আনন্দ ও পুলক এসব চিন্তা করার অবকাশ দিচ্ছিল না, তাই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ড্রাইভারদের উপর ছেড়ে দেই। মোটকথা আমার ভাইজান (হযরত জাকী কাইফী)এর ভাষায়—

ہر پست ہر بلند سے ' گذرا مرا جنون

سود و زیاں پسند خرد ' سوچتی رہی

'আমার উন্মাদনা সমস্ত উত্থান–পতনও গিরি প্রান্তর অতিক্রম করে যায়।
আর লাভ লোকসানের হিসাবকারী যুক্তি–বুদ্ধি তখনো ভাবতেই থাকে।'

যখন এ আক্ষেপ মনে জাগ্রত হত যে, অতি অল্প সময়ের জন্য অতি ছোট একটি জিহাদে অংশগ্রহণ করা হল, বড় কোন লড়াইতে অংশগ্রহণ থেকে এখনো বঞ্চিতই রয়ে গেলাম। তখন রহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই এরশাদ আমার মত কম বুদ্ধির লোকদের জন্য আশা ও আকাংখার এক নতুন জগত উন্মোচন করত।

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَغَدْوَةٌ اَوْرَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا، وَلَمَقَامُ اَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِهٖ سِتِّيْنَ سَنَةً–

ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ। আল্লাহর পথে (জিহাদে) একটি সকাল বা একটি বিকাল বের হওয়া সমগ্র পৃথিবী এবং এর সমস্ত নেয়ামত থেকে উত্তম। তোমাদের কারো জিহাদের সারিতে দাঁড়ানো (বাড়ীতে অবস্থান করে) তার ষাট বছরের নামাযের চেয়ে উত্তম। (মুসনাদে আহমাদ)

বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুসংবাদ তো আশার প্রদীপকে আরো দীপ্তিমান করে দেয়।

قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ

অর্থ ঃ জিহাদ থেকে ফেরার পথেও তেমনই সওয়াব লাভ হয়, যেমন সওয়াব লাভ হয় জিহাদে যাওয়ার পথে। (আবু দাউদ শরীফ)

শত্রুর অস্থিরতা

ওদিকে কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব ওয়ারলেস যোগে পরোক্ষভাবে দুশমনকে যে সবক দান করেছিলেন, তা তাদের মস্তিষ্কে এমন গভীরভাবে বদ্ধমূল হয় যে, রাতের অন্ধকার যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাদের সন্ত্রস্ততাও সেই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আজ রাতের অন্ধকারে আমাদের কয়েকটি সশস্ত্র বাহিনী চতুর্দিক থেকে তাদের দিকে অগ্রাভিযান চালাবে এবং নিকটে পৌঁছে অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। তাই তারা তাদের চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ করে চলছিল। তার মধ্যে আমাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য 'আলোর গোলাও' নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু তাদের সকল তৎপরতা আমাদেরকে নিকটে মনে করে তাদের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিধায় ফেরার পথে তাদের কোন গোলা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেনি।

আমাদের জীপ ছিল সবার আগে। প্রায় আধা ঘন্টা বাতিছাড়া পথ চলার পর মন্থর গতির প্রতি আমাদের বিরক্তি এসে যায়। তখন আমি ড্রাইভারকে পরামর্শ দেই যে, এখন তো আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি এবং দুশমন দিশাহারা অবস্থায় রয়েছে, এখন আমাদের জীপের ছোট লাইট জ্বালানোতে কোন সমস্যা নেই। ঐ লাইটই পিছনের গাড়ীগুলোর জন্যও যথেষ্ট হবে।

আমার এ প্রস্তাব মত মাত্র কয়েক মিনিট চলতেই আমাদের ডান বাম এবং উপর দিয়ে শোঁ শোঁ করতে করতে গোলা অতিক্রম করতে থাকে। সাথে সাথে লাইট নিভিয়ে দেওয়া হয়। সবাই ক্লাশিনোকভ হাতে নিয়ে এবং বিক্ষিপ্ত আকারে পায়ে হেঁটে চলতে থাকি। গাড়ী পিছনে পিছনে ধীরগতিতে আসতে থাকে। দুশমন আলোর গোলাও নিক্ষেপ করেছিল—তা সম্মুখে অনেক দূরে পতিত হচ্ছিল, বিধায় তারা আমাদেরকে দেখতে পায়নি।

আমীরের আনুগত্য

এই ভ্রান্ত প্রস্তাবদানের জন্য আমার মধ্যে ভীষণ অনুশোচনা জাগ্রত হয়। আর তার একটি কারণ এও ছিল যে, বাহ্যত কমাণ্ডার সাহেবের ইঙ্গিতেই ড্রাইভার লাইট বন্ধ রেখেছিল। আমি আমার আমীরকে (কমাণ্ডার সাহেব) পরামর্শ না দিয়ে সরাসরি ড্রাইভারকে পরামর্শ দিয়ে নিয়ম

শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে শরী'অতের মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। কমাণ্ডার সাহেব তার কোন আচরণে আমার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি তা ঠিক, কিন্তু আমীরের আনুগত্য একটি সামরিক মূলনীতি তো বটেই, তা ছাড়া এটি শরী'অতের দৃষ্টিতেও ফরয। পবিত্র কুরআনের সূরায়ে নিসায় (আয়াত ৫৯) আমীরের আনুগত্যের নির্দেশ দান করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো হাদীসে এর প্রতি অত্যন্ত তাকীদ প্রদান করেছেন। তিনি এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন—

إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا -

অর্থ ঃ তোমাদের উপর যদি (মনে কর) কোন নাক কাটা, কান কাটা, লেংড়া, খঞ্জ, ক্রীতদাসকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়—যে কুরআনের বিধান মুতাবেক তোমাদের নেতৃত্ব দান করছে—তাহলে তারও আনুগত্য করবে। (মুসলিম শরীফ)

বিভিন্ন হাদীসে আমীরকে হেয় করা এবং তার অবাধ্য হওয়ার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَ مَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ فَقَدْ عَصَانِي -

অর্থ ঃ যে আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল, আর যে আমীরের অবাধ্য হল সে আমার অবাধ্য হল। (মুসলিম শরীফ)

অপর একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

عَلَي الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَاطَاعَةَ -

অর্থ ঃ মুসলমান পুরুষের জন্য (আমীরের) সর্ব বিষয়ে আনুগত্য ফরয। তার পছন্দ হোক চাই অপছন্দ হোক। তবে যদি তাকে (আমীরের পক্ষ হতে) পাপ কাজের হুকুম দেওয়া হয় তাহলে সে কাজে কারো আনুগত্য জায়েয নেই।

তথাকথিত গণতন্ত্রের এ যুগে শরী'অতের এ হুকুমের ব্যাপারে এতই গাফলতি করা হয় যে, একে শরী'অত নির্ধারিত ফরয বলেই মনে করা হয় না। উচ্ছৃংখলতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বাধীনতা'। আমাদের অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কাজে বিশৃংখলা, অশান্তি ও ব্যর্থতার বড় একটি কারণ এও যে, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের (জায়েয কাজ সমূহে) আনুগত্য করা হয় না। যার মনে যা চায় সে তাই করতে চায়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এই বিশৃংখলা থেকে নিস্কৃতি দান করুন।

আমীরের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করার কিছু না কিছু শাস্তি নগদই পেতে হয় এবং কাজে বেবরকতি দেখা দেয়। আমাদেরকেও এ পাপের সামান্য ভোগান্তি তাৎক্ষণিকভাবে এই ভোগ করতে হয় যে, দুশমন ইতিপূর্বে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে অনবহিত ছিল। এখন তারা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে ফেলে। আমার কারণে সাথীদেরকে গাড়ী ছেড়ে পায়ে হাঁটতে হয়।

কিছুক্ষণ পর আমরা পুনরায় গাড়ীতে সওয়ার হই। বাতি জ্বালানো ছাড়াই পথ চলতে থাকি। দুশমনের যত বেশী ফায়ারের শব্দ হচ্ছিল সেই তুলনায় গোলা আমাদের দিকে আসছিল কম। এতে অনুমান করা হয় যে, তারা সাবধানতাবশত কাছে এবং দূরে তথা সর্বত্র গোলা বর্ষণ করছে। কারণ, তাদের তো শোচনীয় অবস্থা শুরু হয়েছে। রাত নয়টার কাছাকাছি আমরা যখন সেই পর্বত ভূমিতে প্রবেশ করছিলাম—যার মধ্যে খানিকেল্লা অবস্থিত, তখনো গোলা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল। মুজাহিদদের ধারণা ছিল যে, আজ সারারাতই তারা এই মুসীবতে আক্রান্ত থাকবে। তাদের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়। ভোরবেলা বিভিন্ন মাধ্যমে তা সত্যায়িতও হয়—

اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ
دریا سے اٹھی لیکن، ساحل سے نہ ٹکرائی

'এই তরঙ্গের শোকে আবর্ত নয়নাশ্রু বিসর্জন করে সাগর থেকে উত্থিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কূলে আছড়ে পড়েনি।'

জিহাদের অপর একটি কারামত

দীর্ঘ আঠার বছর ধরে আমার কোমরে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে সময় থেকে উঁচুনিচু পথে চলা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। রেল এবং সড়ক পথের সফরও অতি কষ্টে সহ্য হয়। তাছাড়া দ্বিপ্রহরের আহার শেষে আধা ঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা বিশ্রাম করতে না পারলে একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে পড়ি। অথচ এই পুরো সফরে সেই বিশ্রাম নেওয়ার একদিনের জন্যও হয়নি। আর আজ সারাদিন তো ক্লেশপূর্ণ কাজেই অতিবাহিত হল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এ গায়েবী রহমতও—যাকে আমি জিহাদের কারামত মনে করি—দেখতে পাই যে, আজকের সারাদিনের দৌড়ঝাপের মধ্যে কোমরে সামান্য কষ্টও অনুভব হয়নি। শুধু তাই নয়, বরং দীর্ঘ আঠার বছর পর আজ প্রথম বার মনে এমন পুলক অনুভব করছিলাম, যেমন কিনা এ ব্যথা কোনদিনই আমার ছিল না। ব্যথা কোমরের কোথায় এবং কেমন ছিল তা দেখার জন্য আমি নানাভাবে কোমর ঘুরাতে থাকি এবং বিভিন্ন জায়গায় চাপ দিয়ে দেখতে থাকি কিন্তু ব্যথার কোন নামগন্ধও পাইনি। ওয়ালিল্লাহিল হামদ—আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। খানিকেল্লায় ফিরে আসার পর পুনরায় আমার ব্যথা অনুভব হয়।

ক্যাম্পে নিরাপত্তার জন্য যে সকল মুজাহিদ থেকে গিয়েছিলেন, তারা এবং আমাদের মুহতারাম বুযুর্গ সাথী জনাব ছফদর আলী হাসেমী সাহেব অস্থিরভাবে আমাদের পথ পানে চেয়েছিলেন। আমাদেরকে সহি–সালামতে দেখতে পেয়ে তাদের মধ্যে ঈদের আনন্দ শুরু হয়ে যায়। হাসেমী সাহেব হাঁটুর ব্যথার কারণে আজকের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ পুরো সময়টিতে এই বিরাট কাজটি তিনি করেছেন যে, জায়নামাযে বসে আমাদের জন্য দুআ করেছেন। রণাঙ্গনে তাকে দু' মাস অবস্থান করতে হবে। তাই রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য তার তেমন কোন তাড়াও ছিল না। যা হোক জীবনের সত্তরতম সোপানে এসে তার এই যৌবনদীপ্ত ঈমানী দৃঢ়তা আমাদের সবার জন্য ঈর্ষাযোগ্য ছিল।

খানীকেল্লায় পৌঁছতেই আরেকটি নতুন আনন্দ এই লাভ হয় যে, আমাদের মেজবান সংগঠন হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর তরুণ আমীর মাওলানা ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতারের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। মূলতঃ তাঁর দাওয়াতেই আমরা এখানে এসেছিলাম। কিন্তু করাচী থেকে

আমাদের যাত্রাকালে তিনি বাংলাদেশ গিয়েছিলেন। কাল সকালে করাচী পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে, আমরা রণাঙ্গনে চলে এসেছি। তখনই তিনি বিমানযোগে মুলতান আসেন এবং সেখান থেকে সড়ক পথে কোথাও বিরতি না দিয়ে আজ সকালে 'বাগাড়' এসে পৌঁছেন। সেখান থেকে মিসাইল ভর্তি একটি ট্রাক নিয়ে আজ মাগরিবের সময় এখানে এসে পৌঁছেন। দীর্ঘ, বিরামহীন, প্রাণান্তকর এই সফর সত্ত্বেও তাঁর মুখমণ্ডলে বিরাজমান গোলাপের ন্যায় সজীবতা ছিল ঈর্ষণীয়। ক্লান্তির কোন চিহ্নই তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল না। মাশাআল্লাহ। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

মাওলানা ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব বিগত নয় বছর ধরে জিহাদে দেহ, মন ও ধনের বাজী লাগিয়ে চলেছেন। এই জিহাদে শুধুমাত্র তাঁর ঈমানদীপ্ত কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাই এত অধিক যে, তা স্বতন্ত্র কোন পুস্তকেই সংকুলান হতে পারে। আমার ভাইজান জনাব মুহাম্মাদ যাকী কাইফী মরহুমের এই কবিতা তাঁর উপর পুরোপুরি প্রযোজ্য হয়—

طوفان سے کھیلے ہیں تو موجوں میں پلے ہیں
تب گوہر شہوار کے سانچے میں ڈھلے ہیں

'তুফানের মধ্যে খেলা করে, তরঙ্গের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে
এ খামিরা শাহী ছাঁচে গড়ে উঠেছে।'

মিসাইলের ট্রাক

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব আজকের আক্রমণে দুশমনের উপর মিসাইল বর্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। 'বাগাড়' ক্যাম্প হতে আজ তৃতীয় প্রহরে মিসাইল মড়জগাহের ক্যাম্পে পৌঁছানোর কথা ছিল। দ্বিপ্রহরে ওয়ারলেস যোগে জানা যায় যে, সংগঠনের আমীর জনাব মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান হয়ে মড়জগাহতে আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবেন এবং লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু পাঠকদের হয়ত স্মরণ আছে যে, আজ দিনের তৃতীয় প্রহরে আমরা যখন আক্রমণের উদ্দেশ্যে খানিকেল্লা হতে যাত্রা করি, তখন আমরা উরগুন উপত্যকায় দুশমনের গোলা পতিত ও বিস্ফোরিত হতে দেখেছি। সেগুলো জামাখোলা পোস্টে থেকে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল।

তাদের লক্ষ্য ছিল মিসাইল ভর্তি ট্রাক। 'রিবাত' পৌছে আমীর সাহেব এদের গোলা বর্ষণ সম্পর্কে অবগত হন। মুজাহিদগণ নিজের প্রাণের চেয়ে অস্ত্রের অধিক হেফাযত করে থাকেন। তিনি আসর পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করেন। দুশমনের তোপ আমাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তিনি উপত্যকা অতিক্রম করে খানিকেল্লায় এসে পৌছেন। কিন্তু মাগরিবের সময় হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি মিসাইল নিয়ে আজকের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এজন্য আমরাও ব্যথিত হই।

আজকের লড়াইয়ে দুশমনের ক্ষয়ক্ষতি

ইতিপূর্বে কোথাও উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের আক্রমণে দুশমনের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অনুমান তো করা যায় কিন্তু সাথে সাথে বিস্তারিত রিপোর্ট নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। বিস্তারিত বিবরণ নিজেদের গুপ্তচর বা ঐ সমস্ত মুসলমান সৈনিকদের থেকে জানা যায়, যারা দুশমনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। আজকের লড়াই চলাকালে দুশমনের জামাখোলা চৌকিতে বারবার এম্বুলেন্স যাতায়াত করতে দেখা গেছে, তাতে অনুমান করা হয় যে, দুশমনের অনেক লোক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু মুজাহিদরা শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে কোন মতামত গ্রহণ করেন না। কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব ওয়াদা করেন যে, সঠিক তথ্য অবগত হওয়ার সাথে সাথেই পত্রযোগে তা আমাদেরকে অবহিত করবেন। সুতরাং করাচী পৌছার পর পবিত্র রমযান মাসে আমি তাঁর পত্র পাই। যথাস্থানে পত্রটি তুলে ধরব (ইনশাআল্লাহ)।

রাতের খাবার ও এশার নামায শেষ করার পর আমাদের কিছু সাথী—যার মধ্যে মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেব, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব এবং আমার ছেলে মৌলভী মুহাম্মাদ যুবায়ের সাল্লামাহুও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—রাতে পাহারা দেওয়ার কাজে চলে যান। আমি শ্রদ্ধেয় আমীর মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার সাহেবের সাথে তাঁর বহির্দেশের সফরের রিপোর্ট এবং আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করতে থাকি।

বারটার কাছাকাছি সময় যখন স্লিপিং ব্যাগে প্রবেশ করি, তখন আজ ভোর থেকে এ পর্যন্তের যাবতীয় দৃশ্য একেক করে দৃষ্টির সম্মুখে ভাসতে আরম্ভ করে। আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম অনুগ্রহ লাভ করায় হৃদয় ও

রসনা পুলক ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ছিল। বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে—

ایں کہ می بینم بہ بیدار یست یارب یا بخواب ؟

'হে আল্লাহ! এ সব কি বাস্তবে দেখছি, না স্বপ্ন?'

১৮ই শা'বান ১৪০৮ হিজরী
৬ই এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী, বুধবার

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হলে তুষারাচ্ছাদিত পরিবেশে মুজাহিদের আযান মধুর উত্তাপ সৃষ্টি করে। ফজর নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও মুনাজাত শেষে রাতের বেঁচে যাওয়া রুটি ও তরকারী দ্বারা নাস্তা করি। বাল্যকাল থেকে এ নাস্তাতেই আমি অভ্যস্ত। 'আঙ্গুর আড্ডা' থেকে কিছু ডিম সঙ্গে এনেছিলাম। মুজাহিদরা সেগুলো সিদ্ধ করে নাস্তার সঙ্গে দেন। শীত ছিল মধুময়, কিন্তু অন্তর ছিল নিষ্প্রভ। কারণ, অল্পক্ষণ পরই আমাদের ফিরতি সফর আরম্ভ হবে। দেশে ফেরার আগ্রহ তো স্বভাবতই হয়ে থাকে, যার ভাসাভাসা ভাব আমার অন্তরেও পাক খেতে থাকে। কিন্তু পবিত্র জিহাদের এই ভূখণ্ডের পাহাড়, উপত্যকা, বন এবং সবচেয়ে বেশী মুজাহিদরা এমনিভাবে মন কেড়ে নিয়েছিল যে, সহায় সম্বলহীনতার প্রকট প্রতিচ্ছবি এই খানিকেল্লাকেও 'আপন ঘর' বলে মনে হচ্ছিল। বিচ্ছেদের ক্ষণ যতই ঘনিয়ে আসছিল, হৃদয় ততই কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

بیابان محبت ' دشت غربت بھی ' وطن بھی ہے
یہ ویرانہ قفس بھی ' آشیانہ بھی ' چمن بھی ہے

'ভালবাসার বিয়াবান, সে তো অচেনা উপত্যকাও আবার আপন গৃহও।
এই বিরান ভূমি পিঞ্জিরা, আবাস, আবার কাননও।'

জিহাদ ও পান

আমার পান-জর্দার এক বদঅভ্যাস রয়েছে, যা যুদ্ধের মুহূর্তেও স্বাদ যোগাচ্ছিল। কিন্তু অন্যান্য কারণ ছাড়া এ কারণেও আমি একে বদঅভ্যাস বলছি যে, জিহাদ আর এটি দীর্ঘসময় একসাথে চলতে পারে না। সফরে এর সমস্ত বোচকা বহন করতে হয়। এর সম্পর্কও জোড়হীন আবশ্যকীয় উপকরণসমূহের মধ্য থেকে একটিও কম হয়ে গেলে অবস্থা দেখার মত

এবং অনেক সময় অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই খানিকেল্লাতেই করাচীর এক শিক্ষিত তরুণের সঙ্গে—যিনি মায়মান পরিবারের' লোক এবং কয়েক মাস ধরে জিহাদে লিপ্ত রয়েছেন—এভাবে পরিচয় হয় যে, প্রথম দিন আমি যখন পান বানাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমার নিকটে এসে বসেন। আমি তাকে পান দিলে হেসে বলেন—

'এরই অপেক্ষায় ছিলাম। পান খেতে অভ্যস্ত। কয়েক মাস পর আজ দেখতে পেয়ে আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না।'

তিনি জিহাদের জন্য তার এই অভ্যাসকে কুরবান করেছিলেন। আমার এ বদঅভ্যাসের এই দিকটি গনীমত মনে হল যে, পান ও তৎসংশ্লিষ্ট যেসব সাজসরঞ্জাম সাথে এনেছিলাম—তা এর মত আরো কয়েকজন মুজাহিদের কাজে আসে। ফিরতি পথের প্রয়োজনের অধিক যেটুকু ছিল তা তাদেরকে দিয়ে আসি। যা হোক এ সম্পূর্ণ সফরে এ বিষয়টি তীব্রভাবে উপলব্ধি করি যে, আমরা যেসব বদঅভ্যাসের দাসে পরিণত হয়েছি, সেগুলো জয় করা ছাড়া আমরা দুশমনের হাত থেকেও আযাদী লাভ করতে পারব না।

প্রত্যাবর্তন

নয়টার দিকে আমরা কমাণ্ডার যুবায়ের আহমাদ খালেদের সঙ্গে বিদায়ী মুসাফাহা করছিলাম। তখন আমি তাঁর হাত ধরে রেখে বললাম—

'আমি আয়াতুল কুরসী পাঠ করে আপনাকে ফুঁ দেব। আপনিও পাঠ করে আমাকে ফুঁ দিন। এটি ওয়ালিদ সাহেবের বাতানো পরীক্ষিত একটি আমল। বিদায়ী মুসাফাহা করার সময় এ আমলটি করলে আল্লাহর মেহেরবানীতে পুনরায় পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়।'

তিনি প্রস্তাবটি সানন্দে গ্রহণ করলেন। কিন্তু ফুঁ দেওয়ার সময় তাঁর ঈগলের ন্যায় চোখে অশ্রু ঝলমলিয়ে ওঠে। তা দমিয়ে রাখার জন্য তিনি পরিপূর্ণ শক্তি ব্যয় করছিলেন। অবশিষ্ট মুজাহিদদের চোখের সিক্ত পাতা যা বলছিল তাও আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে অপারগ। গাড়ী রওনা হলে আমরা ঘাড় ফিরিয়ে তাঁদের দেখছিলাম। কিন্তু অশ্রুর পর্দা পাহাড়ের পূর্বেই তাদেরকে আড়াল করে দেয়।

হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেব, দ্বীনী ভাই জনাব মুহাম্মাদ বিন্নুরী এবং আমি টয়োটা পিকআপে ছিলাম। তাতে ড্রাইভারের সিটের

পিছনেও দুই তিন জন বসার জন্য কারের মত সিট থাকে। আমাদের মত অক্ষমদের জন্য তা ছিল অধিক আরামদায়ক। পিছনের খোলা অংশে আমাদের সামানাপত্র রাখা ছিল। নিমন্ত্রণকারী সংগঠন হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব পিকআপটি ড্রাইভ করছিলেন। অবশিষ্ট সুস্থ সবল তরুণ সাথীরা অপর একটি জীপে আরোহণ করেছিলেন। উরগুন উপত্যকা অতিক্রম করার কালে এবং পরবর্তী আরো কয়েকটি জায়গা থেকে দুশমনের জামাখোলা পোষ্ট সম্মুখে পড়ে। মনে হচ্ছিল যে, সারা রাতের হতবুদ্ধিতা ও গোলাবর্ষণের পর ক্লান্ত হয়ে এখন তারা খরগোশের ঘুম ঘুমিয়েছে। তাদের কামানের নীরবতা যেন বলছিল—

ذرا اے رہروان تازہ دم '"راہ محبت" میں
جہاں میں تھک کے بیٹھا ہوں وہ منزل دیکھتے جاؤ

'প্রেমপথের তেজোদ্দীপ্ত পথিকরা আমার ক্লান্ত হয়ে বসে পড়া মঞ্জিলটিও একটু দেখে যাও।'

এখন আমরা যে পথ ধরে পাকিস্তান সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলাম, তা আসার সময়ের পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। দূরত্বও কম। কাঁচা, উচুনিচু এবং আঁকাবাঁকা হওয়া সত্ত্বেও তেমন কষ্টকরও নয়। পাকিস্তানের সীমান্ত শহর 'বাগাড়' থেকে এ পথটি উরগুন হয়ে গজনী চলে গেছে। প্রায় দেড় ঘন্টা পর রিবাতের নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে রাস্তায় একটি পাহাড়ী নদী দেখা দেয়। পিপাসা লেগেছিল। আমাদের আবেদনে আমীর সাহেব গাড়ী দাঁড় করালেন। নদীটির প্রবাহিত পানি এমন স্ফটিক স্বচ্ছ ছিল যে, তার তলদেশের বালুকণাও চমকাচ্ছিল।

'আমি এর চেয়েও ভাল পানি দেখাচ্ছি' একথা বলে আমীর সাহেব আমাদেরকে বাম দিকে দশ বার ধাপ উপরে নিয়ে যান এবং নালার মধ্যে পাথরের আড়াল থেকে উৎসারিত একটি ঝর্ণার পানি পান করান। ঝর্ণাটির ব্যাস অতি কষ্টে তিন ইঞ্চি পরিমাণ হবে। পানি তো নয়, এ যেন সঞ্জীবনী সুধা। কোন কাফেরও এ পানি পান করে 'আলহামদুলিল্লাহ' না বলে পারবে না।

হরকতের আমীর ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার

মাওলানা কারী সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব আমাকে এই বিরান ভূমিতে লুকিয়ে থাকা ঝর্ণার নিকট যেভাবে নিয়ে যান তাতেও অনুমান হচ্ছিল এবং আঁকাবাঁকা গিরিপথে গাড়ী চালানোর ধরনও বলছিল যে, তিনি এ পাহাড়, উপত্যকা, বন এবং সম্পূর্ণ এলাকার প্রত্যেক শিরা–উপশিরা সম্পর্কে এত অধিক অবগত, যেন তিনি নিজের মহল্লার অলিগলিতে ঘোরাফেরা করছেন।

বিগত সোয়া আট বছর ধরে খোস্ত, গার্দেজ এবং কাটওয়াজের রণাঙ্গন তো তাঁর আয়ত্বে রয়েছেই, গজনী, কাবুল এবং জালালাবাদের রণাঙ্গনও তাঁর অপরিচিত নয়, কিন্তু তাঁর তৎপরতার মূল কেন্দ্র এই পাকতিকা প্রদেশ এবং উরগুন অঞ্চল।

১৯৭৯ এর ২৭শে ডিসেম্বরে রাশিয়ার সেনাবাহিনী যখন আফগানিস্তানে প্রবেশ করে, তখন থেকে এবং 'তারাকায়ী' এর শাসনকাল থেকে কমিউনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে এখানকার আত্মমর্যাদাশালী মুসলমানদের যে জিহাদ চলছিল, তা অগ্নিশিখার রূপ থেকে যখন অগ্নিকুণ্ডের রূপ ধারণ করে, তখন হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর প্রথম আমীর শহীদ মাওলানা ইরশাদ আহমাদ (রহঃ)এর আলোচনায় লিখেছি যে, তাঁর সঙ্গে (ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার) ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ঈসায়ীতে লেখাপড়া মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় জিহাদের পথে বের হন। তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর। তিনি দুই তিন মাস জিহাদে কাটিয়ে ফিরে যান এবং সাহিওয়াল এর জামেয়া রশিদিয়ায় অধ্যয়ন করতে থাকেন। এ সময়ের ছুটির দিনগুলোও তিনি জিহাদে অতিবাহিত করেন।

দরসে নিযামীর শেষ বর্ষ দাওরায়ে হাদীস অবশিষ্ট থাকতে মনের তাকীদে বাধ্য হয়ে ১৯৮২ তে তিনি পরিপূর্ণভাবে জিহাদে লিপ্ত হন।

এবার তিনি পরিপূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে রণাঙ্গনে এসেছিলেন। এখানে তিনি স্বীয় আমীর ও বন্ধু মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেবের সঙ্গে আফগান ভাইদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদের চরম ধৈর্যসংকুল ধাপসমূহ অতিক্রম করেন। সর্বদা তিনি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ লড়াইসমূহের সম্মুখ ভাগে থাকেন। যে রণক্ষেত্রেই গিয়েছেন—বীরত্ব, নির্ভীকতা, প্রতিভা ও দক্ষতার চিত্র অংকন করে এসেছেন। ফলে সত্বরই তাঁকে

হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর নায়েব আমীর এবং কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। তাঁর নাম মূলত মুহাম্মাদ আখতার ছিল, জিহাদের সাথীরা তাঁর সাইফুল্লাহ আখতার নামকরণ করেন।

তিনটি বিমান ভূপাতিত করেন

১৯৮৩ ঈসায়ীতে খোস্ত এর একটি রক্তাক্ত লড়াইয়ে—যা প্রায় আড়াই মাস পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকে—তাঁর অবিচলতা এবং লক্ষবস্তুতে আঘাত হানার নিপুণতা এভাবে ফুটে ওঠে যে, কাবুল থেকে সেনাবাহিনীর বড় একটি কাফেলা খোস্ত ছাউনীতে রসদ পৌঁছাতে আসে। তখন মুজাহিদরা চতুর্দিক থেকে কাফেলাটিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানায়। পূর্বে কোথাও উল্লেখ করেছি যে, এসব সেনা কাফেলা শত সহস্র সামরিক যান ও ট্যাংকের সমন্বয়ে গঠন করা হয়। কাফেলার উপর দিয়ে গানশিপ হেলিকপ্টার এবং জঙ্গি বিমান টহল দিতে থাকে। এই লড়াইয়েও মুজাহিদদের জন্য এ সমস্ত হেলিকপ্টার এবং বিমান কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। সে সময় মুজাহিদদের নিকট বিমান বিধ্বংসী কামান কদাচিৎই থাকত। আর সেগুলোর ব্যবহারকারী ছিল আরো কম। ওদিকে ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার বিমান বিধ্বংসী কামান চালনায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। এই লড়াইয়ে আকাশপথের আক্রমণকে প্রতিহত করার জটিল দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়।

তিনি সেখানেই 'খানা ডবগাই' এর একটি পাহাড়ের উপর দুটি বিমান বিধ্বংসী কামান সাথে নিয়ে একটি মোর্চা গেড়ে বসেন। একটি কামান ছিল ছোট, অপরটি ছিল বড়। সেগুলোর গোলাও ছিল বড় এবং তা অনেক দূরে গিয়ে আঘাত হানত। এমন অসহায় অবস্থা ছিল যে, তোপ ছিল দুটি, কিন্তু চালক হলো একজন। ওদিকে রণক্ষেত্র মাইল কে মাইল বিস্তৃত। বিধায় সমস্ত সাথী ছিল বিক্ষিপ্ত।

তিনি এই মোর্চা থেকে পুরা একটি মাস আক্রমণকারী বিমান ও হেলিকপ্টারের সাথে অবিরাম মোকাবেলা করতে থাকেন। কখনো একটি তোপ চালাতেন কখনো অপরটি। এ অবস্থাতেই তিনি দুশমনের একটি জঙ্গি বিমান এবং দুটি গানশিপ হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেন। এ ঘটনার পর থেকে তিনি আফগান মুজাহিদ এবং তাদের নেতাদের নিকট আরো প্রিয়পাত্র হয়ে যান। পাকিস্তানী মুজাহিদরাও তাঁর জন্য জান বিলাতে

আরম্ভ করেন। তিনি নিজে তো বলেন না এবং তাঁর ধারণাতেও হয়ত আসে না, কিন্তু কমপক্ষে জিহাদের প্রাথমিক এই যুগের উদ্ধৃতিতে একথা বলার তাঁর অধিকার রয়েছে যে—

که میں نے فاش کرڈالا طریقہ شاہ بازی کا

'আমি বীরত্বের পথ উন্মোচিত করেছি।'

দুশমনের চৌকি অবরোধ

১৯৮৩ সালেরই শেষ দিকে আরেকটি ঘটনা এই ঘটে যে, মাওলানা আরসালান খান রহমানীর পরিচালনায় কয়েকটি আফগান সংগঠন এবং হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর মুজাহিদগণ সম্মিলিতভাবে উরগুনের নিরাপত্তা চৌকি 'নেক মুহাম্মাদ কেল্লা' অবরোধ করে। তাতে ষাটজন পাকিস্তানী মুজাহিদও অংশগ্রহণ করেন। সে সময় উরগুনের নিরাপত্তা চৌকি 'জামাখোলা' নির্মিত হয়নি। উরগুন বিজয়ে শুধুমাত্র এই নেক মুহাম্মাদ কেল্লাই বাধা ছিল। দুইমাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে। এতে মুজাহিদদের আটটি বিমান বিধ্বংসী কামান অংশ নেয়। সব কয়টি কামান পরিচালনার দায়িত্ব ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতারের উপর ন্যস্ত করা হয়।

কিল্লার বড় গেটকে সম্মুখের পাহাড়ে নিয়োজিত মুজাহিদদের একটি দল তাদের তোপের আওতায় এবং ছোট গেটকে ক্বারী সাহেব তার তোপের আওতায় নিয়ে কেল্লায় যাতায়াতকারী প্রত্যেকটি গাড়ীর উপর ফায়ারিং আরম্ভ করেন। এঁরা ছোট গেটের সম্মুখবর্তী পাহাড়ের উপর গেট থেকে মাত্র দু' শ গজ দূরে অবস্থান করছিলেন। এভাবে কেল্লায় রসদ পৌঁছানোর সমস্ত স্থলপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত মুজাহিদদের আরও কয়েকটি দল গঠন করা হয়। তারা পালাক্রমে দুশমনের উপর রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ করত এবং সফল আঘাত হেনে ফিরে আসত। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে অবরুদ্ধ করে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করা। এতে করে মুজাহিদদের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হয়ে উরগুন ছাউনীর উপর আক্রমণ করা সম্ভব হবে, কিন্তু দুশমনের নিকট পানাহার সামগ্রী, অস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব ছিল না। তাছাড়া তাদের উপর আকাশপথের পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। ফলে

তারা অবিচল থেকে মুকাবেলা করতে থাকে। তাদের হেলিকপ্টার, ট্যাংক ও কামানসমূহ গোলা ও গুলি বর্ষণ করতে থাকে।

ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব পুরো সময়টাতে দিন–রাত বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়ে কেল্লার গেটের উপর চড়াও হয়ে থাকেন। রাতের অতর্কিত আক্রমণের পালা আসলে সে সুযোগও তিনি হাতছাড়া করতেন না। কোন সাথীকে তোপের দায়িত্বে রেখে রাতের আক্রমণেও সম্মুখভাগে থাকতেন। দুশমনের তীব্র ফায়ারিং সত্ত্বেও কেল্লার একেবারে নিকটে গিয়ে রকেট লাঞ্চার ও হাতবোমা দ্বারা আঘাত হানতেন এবং ফিরে এসে পুনরায় কামানের দায়িত্বে জমে বসতেন। এই ধারাবাহিকতা প্রায় দু' মাস অব্যাহত থাকে এবং এই অবরোধ ভাঙ্গার যাবতীয় চেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ করতে থাকেন।

মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা

দুশমনও ওৎ পেতে ছিলো। তারা তার অবস্থান জেনে ফেলেছিল। দুশমন মুজাহিদদের অবস্থানের উপর অবিরাম গোলা বর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু এরা বিশালাকারের একটি পাথরের আড়ালে মোর্চা গেড়ে বসে ইটের জবাব পাথর দ্বারা দিচ্ছিলেন।

লক্ষণ দেখে বুঝা যাচ্ছিল যে, দুশমন আর দু' চার দিন ভাগ্য পরীক্ষা করে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হবে—এমন সময় এক রাতে দুশমনের মর্টার তোপের একটি গোলা ক্বারী সাহেবের নিকট থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে এসে বিস্ফোরিত হয়। এতে দু'জন আফগান মুজাহিদ শহীদ হন। তাদের উভয়েরই নাম ছিল নাসরুল্লাহ। গোলার একটি জ্বলন্ত ধারাল টুকরা ক্বারী সাইফুল্লাহর পাঁজর ভেদ করে ফুসফুসের মধ্যে আটকে যায়। একুশ বছর বয়সী অপর একজন হাফেজে কুরআন মুজাহিদও মারাত্মকভাবে আহত হন। তার নামও ছিল 'আখতার'। এ এক অপূর্ব সমন্বয় যে, দুইজন আফগান শহীদ হন। যাঁদের দুজনের নামই নাসরুল্লাহ। আর দুইজন পাকিস্তানী মারাত্মক আহত হন, তাদের উভয়ের নাম আখতার। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে আমীরে হরকত মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব আহতদ্বয়কে মারাত্মক নাজুক অবস্থায় মাওলানা আরসালান খান রহমানীর জীপেও পেশোওয়ার অভিমুখে রওনা করেন। এখান থেকে জীপে পেশোওয়ার অব্যাহত গতিতে সফর

করলেও কমপক্ষে চৌদ্দ পনের ঘন্টা সময় লাগবে। তরুণ যুবকের তাজা খুন সারা পথে প্রবাহিত হতে থাকে।

لہو پانی کیا ہے مدتوں ' غم کی کشاکش نے
کوئی آسان ہے کیا ' خوگر آزار ہو جانا

'বেদনার টানা হেঁচড়া বহুদিন রক্তকে পানি করেছে। বেদনায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া সেকি সহজ ব্যাপার?' (হযরত আরেফী (রহঃ)

নেক মুহাম্মাদ কেল্লা বিজয়

মুজাহিদগণ প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে তাদের আহত ও শহীদ হওয়া সাথীদের ব্যাপারটি দুশমনের নিকট গোপন রাখেন এবং আক্রমণ ও অবরোধ অব্যাহত রাখেন। এক/দু' দিন পর অসহ্য হয়ে দুশমনের তিনটি ট্যাংক গোলা বর্ষণ করতে করতে কেল্লার বাইরে এসে চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। কিন্তু এটি ছিল তাদের শেষ ভাগ্য পরীক্ষা। মুজাহিদরা জীবন বাজী রেখে একটি ট্যাংক ধ্বংস করে ফেলে। দ্বিতীয়টির চেইন ছিন্ন হয়ে যায়। আর তৃতীয়টির মধ্য হতে—যেটি অক্ষত ছিল—কমিউনিষ্ট সৈন্য বের হয়ে পালিয়ে যায়।

মুজাহিদগণ চতুর্দিক থেকে একযোগে আক্রমণ করে কেল্লায় ঢুকে পড়েন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তা জয় করে ফেলেন। বহু রাশিয়ান ও আফগান কমিউনিষ্ট জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। বহু সংখ্যক আহত ও বন্দী হয়। প্রচুর পরিমাণে ছোট বড় অস্ত্র—যার মধ্যে তোপ ও ট্যাংকও ছিল—মুজাহিদদের হাতে আসে। পানাহার সামগ্রী ও গোলা বারুদের যে ভাণ্ডার গনীমত রূপে লাভ হয়, তা তো গুণেই শেষ করা যাবে না। এ সমস্ত অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম উরগুনের ঘাটির উপর আক্রমণ করতে মুজাহিদদের কাজে আসে। উরগুনের উপর সুশৃংখল ও চূড়ান্ত এই আক্রমণের ঘটনা কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেবের ভাষায় 'জামাখোলা পোষ্ট' শিরোনামের অধীনে ইতিপূর্বে লিখেছি।

ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব ও তাঁর গুজরাটের অধিবাসী সঙ্গীকে পেশোওয়ারের হাসপাতালে ভর্তি করতে করতে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়ে গিয়েছিল। ক্বারী সাহেবের পাঁজরের ভাঙ্গা হাড্ডি দেহ থেকে বের করে ফেলা হয়। ফুসফুসের যে অংশের মধ্যে গোলার লোহার টুকরা

ঢুকেছিল তা প্রায় অকেজো হয়ে যায়। কয়েকদিন পর্যন্ত জীবন মরণের টানা হেঁচড়া চলতে থাকে। তাঁর সঙ্গী আখতার জীবন মরণের টানা হেঁচড়ায় মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রাণ সমর্পণ করে অমর জীবন লাভ করেন এবং চিকিৎসার যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন।

پھرا کرتے نہیں مجروح الفت ' فکر درمان میں
یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا ' اپنے مرہم کو

'প্রেমে ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তি চিকিৎসার পিছনে দৌড়ঝাঁপ করে না। এ সমস্ত আহতরা নিজেরাই উপশমের পথ করে নেয়।' (হযরত আরেফী (রহঃ)

শিক্ষা সমাপনের কুদরতী ব্যবস্থা

তিনি দু' মাস পর হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেলেন। তাঁর ফুসফুস তখনও পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হয়নি। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, যা এখনো তাঁর জীবন সঙ্গী হয়ে আছে। ভাহ্‌ওয়াল নগর জেলার চিশতিয়া গ্রামে তাঁর বাড়ী। তিনি বাড়ী না গিয়ে রণাঙ্গনে ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বীয় আমীর মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেবের নির্দেশে জামেয়া রশিদিয়া সাহেওয়ালে ভর্তি হন। শিক্ষা সমাপনের জন্য দাওরা হাদীসের যে এক বছর বাকী ছিল তা পূর্ণ করতে থাকেন। শিক্ষা সমাপন করে পুনরায় আফগানিস্তান চলে আসেন এবং জিহাদের জন্যই নিজেকে পরিপূর্ণরূপে বিলিয়ে দেন।

১৯৮৫ ঈসায়ীতে মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেবের শাহাদাতের পর তাঁকে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর আমীর এবং জনাব যুবায়ের আহমাদ খালিদকে কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। দুই আড়াই বছর পূর্বে তিনি বিবাহ করেছেন। মাশাআল্লাহ, এখন তিনি দু' সন্তানের পিতা। জিহাদী তৎপরতার মাঝে অবকাশ পেলে অল্প সময়ের জন্য বাড়ীও ঘুরে আসেন। কিন্তু আফগানিস্তান আযাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর ধর্ম হলো—

شرع محبت میں ہے ' عشرت منزل حرام
شورش طوفان حلال ' لذت ساحل حرام

'প্রেমের বিধানে গন্তব্যে বিশ্রাম হারাম। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের আস্ফালন হালাল, কূলের নিরাপত্তা হারাম।'

আমার সঙ্গে তাঁর কয়েক বছর ধরে যোগাযোগ রয়েছে। করাচী ও ইসলামাবাদে জিহাদ প্রসঙ্গে দীর্ঘ সময়ের সাক্ষাতও আমাদের মধ্যে হতে থাকে। আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের এই সফরে তো পুরা তিনদিন তিনরাত তাঁর সাহচর্য লাভ হয়, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তিনি নিজের কোন ঘটনাও শুনাননি কিংবা কোন কৃতিত্বের কথা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করেননি। এ সমস্ত ঘটনাও আমি তাঁর সহযোদ্ধা মাওলানা আবদুস সামাদ সাইয়াল, কমাণ্ডার যুবায়ের আহমাদ খালিদ, মাওলানা সাআদতুল্লাহ এবং জনাব শাহেদ মাহমুদের নিকট থেকে বারবার চেষ্টা করে অবগত হই।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা এ সকল নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদদেরকে ইখলাস, লিল্লাহিয়াত, বিনয় ও নম্রতার দৌলত দ্বারা এমনভাবে ভূষিত করেছেন যে, তাঁরা নিজেদের কৃতিত্বের কথা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করেন না। জিজ্ঞাসা করলেও প্রত্যেকে নিজের কোন সাথীর কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা কিছুটা শুনালেও নিজের নাম কোনভাবেই তুলে ধরেন না। এটি হলো জিহাদের বরকত। অন্যথায় ঢোল পিটানোর এবং নিজেকে বড় করে জাহির করার এই যুগে—যখন কিনা প্রদর্শন প্রবৃত্তি, যশ–লিপ্সা ও খ্যাতিলাভের মোহে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও জাতীয় লক্ষ্যসমূহও বলি দেওয়া হয়—এমন দৃষ্টান্ত দিন দিন দুষ্প্রাপ্য হতে চলেছে।

مسلماں کو مسلماں کردیا طوفان مغرب نے
تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی

'পাশ্চাত্যের তুফান মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমান করে দিয়েছে। সাগরের
তরঙ্গ সংঘাতের মধ্যেই তো মুক্তার পরিতৃপ্তি।'

আমরা দুপুর সাড়ে বারটার দিকে 'আঙ্গুর আড্ডা' পৌঁছি। এখানে কিছু আফগান শিশুকে বই–শ্লেট হাতে দেখতে পাই। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল—তারা কোন মাদরাসা থেকে আসছে। মুজাহিদ সংগঠনসমূহ আফগান মুহাজিরদের বস্তি ও ক্যাম্পসমূহে জায়গায় জায়গায় মাদরাসাও কায়েম করেছে।

এখানের একটি আফগান হোটেলে খাবার খাই। হোটেলটিতে চেয়ার টেবিলের পরিবর্তে বড় একটি কক্ষের দেয়াল সংলগ্ন প্রায় আড়াই ফুট উঁচা অতি প্রশস্ত চত্বর বানানো রয়েছে। চত্বরের উপর প্লাষ্টিকের বিছানা

বিছানো রয়েছে। এবং দেয়ালের সঙ্গে হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রচণ্ড ক্ষুধা অবস্থায় আফগানী সালুন ও ডালরুটি খুব সুস্বাদু মনে হচ্ছিল।

দুটার দিকে পাকিস্তান সীমান্তের 'বাগাড়ে'র মুজাহিদ ক্যাম্পে পৌঁছি। গরম পানি দ্বারা উযু করে জামাআতের সাথে যোহর নামায আদায় করি। কফি পান করে তিনটার সময় সেখান থেকে উযিরিস্তানের 'ওয়ানা' শহরের দিকে রওনা হই।

পথিমধ্যে সেই আকাশচুম্বি পাহাড় অতিক্রম করি, যার চূড়া তখনো বরফাচ্ছাদিত ছিল। সেই চূড়ায় আরোহণ এবং সেখান থেকে অবতরণ কালে আমীর সাহেব (ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার)কে শ্বাস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ঔষধ ব্যবহার করতে হয়। যা সবসময় তাঁর পকেটেই থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করলে শুধু এতটুকু বললেন যে, একটি লড়াইয়ে আমার ফুসফুসটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন থেকে শ্বাসকষ্ট রয়েছে। তিনি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা পাঁজরের হাড়, নেক মুহাম্মাদ কেল্লা অবরোধের বিবরণ এবং হাসপাতালে দুই মাস ব্যাপী মুমূর্ষু অবস্থায় অতিবাহিত করার প্রতি কোন ইঙ্গিতই করলেন না।

আমি বললাম, আপনার তো এসব কাঁচা বন্ধুর গিরিপথে গাড়ী চালাতে খুবই কষ্ট হয়? সাধারণত প্রথম গিয়ারেই গাড়ী চালাতে হয়?

মুচকি হেসে বাইরের দৃশ্যাবলীর দিকে আনমনে দৃষ্টি ফিরাতে ফিরাতে তিনি বললেন, কি আর বলব! আমার এসব পাহাড়, উপত্যকা, বনভূমি ও বিরান ভূমির সাথে কেমন হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক! বড় বড় আলো ঝলমলে শহরে গিয়েও এগুলোর কথাই স্মরণ হয়। অন্য কোন জায়গার পানিও স্বাদ লাগে না। এসব বন্ধুর পথে এবং পাথরে পরিপূর্ণ ময়দানে গাড়ী চালাতে যে স্বাদ পাই, তা আধুনিক পিচ ঢালা রাজপথে পাই না। আলহামদুলিল্লাহ, জিহাদ আমাদেরকে এই জীবনে অভ্যস্ত করে দিয়েছে।

আমার তখন মরহুম ভাইজান হযরত কাইফীর এই কবিতা স্মরণ হয়—

سنگ گراں ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا

منزل چھپی ہوئی تو مرے حوصلوں میں ہے

'রাস্তায় যদি লক্ষ-কোটি প্রতিবন্ধক থাকে তাতে কি? আমার সাহসের মধ্যেই তো গন্তব্য লুকিয়ে রয়েছে।'

প্রায় দু' ঘন্টা পাহাড়ী পথে সফর করার পর দক্ষিণ উজিরিস্তানের

আজমভারসাক শহর থেকে পাকা সড়ক আরম্ভ হয়। আফগানিস্তান যাওয়ার পথে যখন এই শহর অতিক্রম করি, তখন এর কদর বুঝিনি। তিন চার দিনের প্রাণান্তকর কঠিন বন্ধুর পথে সফর করার পর এখন এই সরু সড়কই মহানিয়ামত মনে হচ্ছিল। সড়কটি জিহাদ চলাকালেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শহীদ জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হকের শাসনামলে নির্মিত হয়।[১]

এই সড়কের কারণে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের যেমন কষ্ট হ্রাস পেয়েছে এবং জীবন ধারায় বিপ্লব হয়েছে, তেমনি মুজাহিদদের জন্যও যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে।

ছয়টার দিকে যখন মসজিদে মসজিদে আসর নামায শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন ওয়ানার জাঁকজমকপূর্ণ জামে মসজিদের ফটকে এসে গাড়ী দাঁড়ায়। মাওলানা নূর মুহাম্মাদ সাহেব এবং তাঁর সাথীরা আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিন দিন পূর্বে এখান দিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য যে সময় নির্ধারিত হয়েছিল মুজাহিদদের সুব্যবস্থার ফলে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় সে সময়ই আমরা এখানে এসে পৌঁছি। মাদরাসার অফিসে জামাআতের সাথে আসর নামায আদায় করি। আমি উপস্থিত লোকদের থেকে এজাযত নিয়ে অফিসের এক কোণায় শুয়ে পড়ি। মাগরিব নামাযের পরও খাবার আসার আগ পর্যন্ত আমি প্রায় শুয়েই কাটাই।

জিহাদ তিন প্রকার

মাওলানা নূর মুহাম্মাদ সাহেব পূর্ব গৃহীত প্রোগ্রাম মোতাবেক ইশার নামাযের পর জিহাদ বিষয়ক সাধারণ সমাবেশের ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বেলা তৃতীয় প্রহর থেকে আমার মাথা ব্যথা শুরু হয় এবং তা ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকে। বাধ্য হয়ে আমি অপারগতা প্রকাশ করি। আমাদের সবার পক্ষ থেকে এই ফরযে কিফায়া হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেব আদায় করেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আমার

১. আমাদের এই সফর চলাকালে মরহুম প্রেসিডেন্ট জীবিত ছিলেন। তাঁর সুচিন্তিত দিকনির্দেশনায় আফগান জিহাদ দ্রুত সফলতার পানে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু যখন এই প্রবন্ধ ছাপতে যাচ্ছে, তখন তাঁর নামের সঙ্গে শহীদ এবং মরহুম শব্দ লিখতে হচ্ছে। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)।

ভীষণ আক্ষেপ থেকে যায়। কারণ, জিহাদ তিনভাবে হয়ে থাকে—

এক. 'জিহাদ বিস সাইফ' (তরবারী দ্বারা জিহাদ)—অর্থাৎ ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই।

দুই. জিহাদ বিল মাল (সম্পদ দ্বারা জিহাদ)—অর্থাৎ জিহাদে সম্পদ ব্যয় করা এবং তা দ্বারা মুজাহিদদের প্রয়োজন পুরা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزٰي وَمَنْ خَلَفَهٗ فِيْ اَهْلِهٖ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزٰي -

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন গাজীকে জিহাদের সরঞ্জাম জুগিয়ে দেয়, সেও জিহাদ করল এবং যে ব্যক্তি কোন গাজীর অবর্তমানে তার পরিবারের খোঁজ খবর নেয় এবং তাদের সাথে সদাচরণ করে, সেও জিহাদ করল।' (সহীহ মুসলিম)

তিন. জিহাদ বিল লিসান (রসনার জিহাদ) অর্থাৎ, যবান ও কলম দ্বারা মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করা এবং ইসলামের দুশমনদের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডাসমূহকে খণ্ডন করা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জিহাদ ত্রয়ের প্রতি নির্দেশ দানকরতঃ ইরশাদ করেন—

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ -

অর্থ ঃ মুশরিকদের বিরুদ্ধে স্বীয় ধনসম্পদ, স্বীয় প্রাণ ও স্বীয় যবান দ্বারা জিহাদ কর। (নাসায়ী)

উজিরিস্তানে এই তৃতীয় প্রকার জিহাদের সর্বাধিক প্রয়োজন এইজন্য রয়েছে যে, এটি স্বাধীন গোত্র শাসিত এলাকা। এখান থেকে উল্লেখযোগ্য মুসলমান আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ, তারা মুজাহিদ এবং মুহাজিরদের সঙ্গে অনেক সহযোগিতাও করে থাকেন। কিন্তু এখানকার আত্মমর্যাদাশালী মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য, আফগানিস্তানের জিহাদ সম্পর্কে খারাপ ধারণায় লিপ্ত করানোর জন্য এবং জিহাদ থেকে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য রাশিয়ার গোলাম এজেন্টরাও এখানে তৎপর রয়েছে। তারা পাকিস্তানের কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের জোরালো পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করে থাকে। এরা রাশিয়ার বিরাট অংকের আর্থিক

সহযোগিতার উপর নির্ভর করে সবসময় ভাষা ও গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতাকে হাওয়া দিয়ে থাকে। মুজাহিদ ও মুহাজিরদের কুৎসা রটনা করা এবং এ সমস্ত নির্যাতিত, নিপীড়িত ও হতদরিদ্র মুহাজিরদেরকে পাকিস্তানের যাবতীয় সমস্যার কারণ সাব্যস্ত করা তাদের সর্ববৃহৎ হাতিয়ার।

হযরত মাওলানা সলীমুল্লাহ খান সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুম জিহাদের ফযীলত এবং তার ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দান করেন। তিনি আফগান জিহাদের পট ও প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন—

'আফগানিস্তানের মুজাহিদগণ যদিও সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে লড়াই করছেন কিন্তু পাকিস্তানের জন্য এ জিহাদের গুরুত্ব এ জন্য অধিক যে, রাশিয়ার দৃষ্টি মূলত পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের উপর। তারা আফগানিস্তানকে পথের একটি মনজিল বলে বিশ্বাস করে থাকে। তারা তেলের খনি দখল করার আকাংখায় বেলুচিস্তান দখল করে তার সামুদ্রিক উপকূল (গোয়াদার ইত্যাদি) পর্যন্ত পৌছতে চায়। বিধায় আফগানিস্তানের জিহাদ প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের নিজস্ব একটি সমস্যাও বটে। তাতে পাকিস্তানী মুসলমানদের সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করা ঈমানী চেতনার দাবী। বিশেষত উজিরিস্তানের গোত্রসমূহ আফগানিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ার কারণে তাদের উপর শরীয়তের পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব সর্বাধিক বর্তায়।'

আমাদের জন্য মাদরাসার কয়েকটি কামরা খালি করে তার মেঝের উপর বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয়। আমি ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়লে মাদরাসার কয়েকজন তালিবে ইলম আমার মাথায় তেল মালিশ করার জন্য এবং শরীর টিপে দেওয়ার জন্য আসে। এখানকার অতিথি সেবা অতি প্রসিদ্ধ। বিশেষত মাদরাসার তালিবে ইলমগণ উস্তাদ এবং আলেমদের খেদমত করার সুযোগ পেলে তাকে বিরাট নেয়ামত মনে করে থাকে। তাদের পীড়াপীড়ির ফলে অল্পক্ষণের জন্য খেদমত করার অনুমতি দেই। অন্যথায় শরীর টিপানোর অভ্যাস আমার নেই। মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব বাজার থেকে মাথা ব্যথার বড়ি নিয়ে আসেন। তা সেবন করে কিছুটা আরাম বোধ করি। আলহামদুলিল্লাহ, বারটার পর চোখ লেগে যায়।

১৯শে শাবান ১৪০৮ হিজরী
৭ই এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী, বৃহস্পতিবার

সকালে নাস্তা ইত্যাদি সেরে নয়টার দিকে ডেরা ইসমাঈল খানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমরা চারজন এখান থেকে সুজুকী গাড়ীতে সফর করি। অবশিষ্ট সাথীরা আফগানিস্তান থেকে সাথে আনা সেই গাড়ীতেই সফর করছিলেন।

যেই সহায় সম্বলহীন অবস্থায় এবং প্রাণঘাতি কষ্টের মধ্যে মুজাহিদদেরকে আফগানিস্তানে রেখে আসি এবং জেনেভা চুক্তির কারণে তাদের উপর যেই কঠিন সময় ঘনিয়ে আসছে, তা স্মরণ করে আমার মন অস্থির ছিল।

আমি ভাবছিলাম, নিবেদিতপ্রাণ এই মুজাহিদগণ কি পরিমাণ মূল্যবান প্রাণের নজরানা পেশ করে এবং দীর্ঘ নয় বছর পর্যন্ত কি পরিমাণ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে পাকতিকা প্রদেশটি আযাদ করেছেন। সম্পূর্ণ প্রদেশের এখন মাত্র উরগুন ও শারানা এ দুটি শহর আযাদ করা বাকি রয়েছে। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধে জয়পরাজয়ের সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি করা যায় না। তারা যেই সহায় সম্বলহীন অবস্থার সম্মুখীন, তাতে শুধুমাত্র গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করাই সম্ভব। কিন্তু এ যুদ্ধ হয়ে থাকে অত্যন্ত ধৈর্য সংকুল। দুশমনের এক একটি চৌকিকে জয় করতে কয়েক মাস বরং অনেক সময় বছরও লেগে যায়। মুজাহিদদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, উরগুন তো বটেই ইনশাআল্লাহ সমগ্র আফগানিস্তানও আযাদ হবে। তারা এজন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে কয়েক দিন, কয়েক মাস বা কয়েক বছর নয়, বরং সমগ্র জীবনকে কাজে লাগিয়েছেন। অনেক কিছু কুরবানী করেছেন এবং সবকিছু কুরবানী করার জন্য ব্যাকুল রয়েছেন। তাদের ঈমানদীপ্ত অবস্থা এবং আল্লাহ তাআলার গায়েবী নুসরাত প্রত্যক্ষ করে দীন লেখক সাক্ষী দেয় যে, আফগানিস্তানের মুজাহিদদের মধ্যে এই ঐক্য অটুট থাকলে—

آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمت رات کی سیماب پا ہوجائے گی

دیکھ لوگے سطوت رفتار دریا کا مال
موج مضطرہی اسے زنجیر پا ہوجائے گی

نالہ صیاد سے ہونگے نواساماں طیور
خون گلچیں سے کلی رنگیں قبا ہو جائے گی
شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے

'প্রভাতের আলোয় গগন উদ্ভাসিত হবে। রাতের অন্ধকার পারদের ন্যায় উবে যাবে। সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের পরিণতি দেখতে পাবে। অসহায় তরঙ্গই তার শৃঙ্খল হবে। শিকারীর আর্তনাদেই বিহঙ্গ সিক্ত হবে। মালির রক্তে পুষ্পকলি রক্তিম হবে। প্রভাকরের আলোকচ্ছটায় অবশেষে নিশি পলায়ন করবে। একত্ববাদের সুর মূর্ছনায় এ কানন সমৃদ্ধ হবে।'

কিন্তু সেই প্রভাত উদ্ভাসিত হতে এখনো অনেক কুরবানী দিতে হবে। ইসলাম নামক প্রদীপের জন্য প্রাণদানকারী পতঙ্গের অভাব নেই। তারা লাফিয়ে লাফিয়ে এই প্রদীপের উপর নিজেদের জান কুরবান করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। পরিশেষে ইনশাআল্লাহ বিজয় ও সফলতা তাঁদের পদচুম্বন করবে। কিন্তু সেই কুরবানীতে আমার অংশ কতটুকু?

আমার অন্তর বার বার আমাকে এই প্রশ্নই করছিল। আমি চোরের মত নিরব হয়ে থাকি। সে আমাকে ধমকিয়ে বলছিল ঃ 'কথা বলছ না কেন? উত্তর দাও।' নয়ন যুগল থেকে অনুতাপের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

আমি চমকে উঠে মুহাম্মাদ বিন্নুরী সাহেবের দিকে তাকাই। তিনি আমার পাশে বসে আমাকেই দেখছিলেন। তাঁর নয়ন যুগলেও অশ্রু ভাসতে দেখি। তিনিও বেদনাবিধুর এই মানসিক ভাবাবেগে বিপর্যস্ত ছিলেন। আমরা উভয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নিজেদের অকর্মন্যতার সঙ্গে মুজাহিদদের অপূর্ব কীর্তি এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী কুরবানীসমূহকে তুলনা করে নিজেদেরকে তিরস্কার করতে থাকি। পবিত্র জিহাদের ভূখণ্ড থেকে কিছু না করে প্রত্যাবর্তনের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের নিকট গোনাহ বলে অনুভূত হচ্ছিল।

ক্বারী সাইফুল্লাহ আখতার সাহেব—যিনি গাড়ী চালাতে চালাতে নিরবে আমাদের এসব কথা শুনছিলেন—হঠাৎ কথা বলে ওঠেন। তিনি বলেন, 'হযরত! আপনারা তো কিছু না করেই প্রত্যাবর্তন করছেন না। আল্লাহর মেহেরবানীতে আপনারা একটি লড়াইয়ে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন। এতে করে আমাদের সবার সাহস ও উদ্দীপনায় যে নতুন মাত্রা

—১৪

যোগ হয়েছে, ইনশাআল্লাহ এর উত্তম ফলাফল রণাঙ্গনে প্রকাশ পাবে। আমরা আপনাদের ন্যায় উস্তাদদের নিকটেই তিরমিযী শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি পাঠ করেছি—

مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَ جَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে শুধুমাত্র এতটুকু সময়ের জন্যও লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে, যতটুকু সময়ে উটের বাচ্চা দুধ পান করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।'

হাদীসটি আমার একেবারেই স্মরণ ছিল না। রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী আহত অন্তরে যেন প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। দুর্বল ও স্বল্প সাহসীদের জন্যও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কেমন দয়ার আচরণ। তখন অনুতাপের অশ্রুর সঙ্গে আনন্দের অশ্রুও শামিল হয়ে যায়। করাচী এসে কিতাবের মধ্যে হাদীসটি তালাশ করে ঠিক এই শব্দেই পেয়ে যাই। ওয়ালিল্লাহিল হামদ—আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা—

کیا کہوں کیا کر رہی ہے ' کام میرے دل کے ساتھ
وہ جو اک امید سی ہے ' سعی لا حاصل کے ساتھ

'অর্থহীন প্রচেষ্টাসহ ক্ষীণ রশ্মিতুল্য আশার কিরণ আমার হৃদয়ের সঙ্গে কি যে করছে, তার আর কি বলব।' (হযরত আরেফী (রহঃ)

গাড়ী ডেরা ইসমাঈল খানের দিকে এগিয়ে চলছিল। পথিমধ্যে আফগান মুহাজিরদের কয়েকটি ক্যাম্পও দেখতে পাই। তাদেরকে দেখে আফগানিস্তানের সেই বিরান জনপথসমূহ দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে ওঠে, যেগুলোকে আমরা তাদের অধিবাসীদের স্মরণে আপাদমস্তক শোকাতুর দেখে এসেছিলাম।

সাপ-বিচ্ছু ঃ জিহাদের আরেকটি কারামত

অনেক মুজাহিদের নিকট থেকে শুনেছিলাম যে, যখন থেকে জিহাদ শুরু হয়েছে, তখন থেকে আফগানিস্তানের বিষাক্ত ও হিংস্র প্রাণীসমূহ যেমন—সাপ, বিচ্ছু, বাঘ ইত্যাদি মুজাহিদদেরকে আক্রমণ করে না, কষ্ট দেয় না। অথচ মুজাহিদরা রাতদিন পাহাড়ে ও জঙ্গলে অবস্থান করতে

বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে দুশমনের অনেক সৈন্য এদের দংশন ও ছোবলে মৃত্যুবরণ করেছে। আমি মাওলানা সাইফুল্লাহ আখতারকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন—

'একথা সম্পূর্ণ সত্য এবং অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। খোদ আমার সঙ্গেই ১৯৮৩ ঈসায়ীতে খোস্ত রণাঙ্গনে এই ঘটনা ঘটে যে, আমি একটি পাহাড়ের উপর বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়ে মোর্চায় অবস্থান করছিলাম। দুশমনের আকাশ পথের আক্রমণের কারণে ঘুমানোর সুযোগ খুব কম হত। এক রাতে শুয়ে আছি এমন সময় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে সুড়সুড়ি অনুভূত হয় এবং সাথে সাথে একটি কাঁটার মতও বিঁধে। আমি টর্চ জ্বালিয়ে দেখি যে, বড় একটি বিষাক্ত বিচ্ছু আমার পা থেকে নেমে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি সেটি মেরে ফেলি। বিচ্ছুটি যেখানে দংশন করেছিল সেখানে হাত লাগিয়ে খুবই সামান্য ব্যথা অনুভব করি। একথা চিন্তা করে আমি বিচলিত হই যে, এর বিষ এখন উপর দিকে উঠে আসবে এবং তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হবে। ফলে আর ঘুমাতেও পারব না। একাকীত্বের কারণে অধিক অসহায় বোধ করি। দুআ করে আল্লাহর উপর ভরসা করে শুয়ে পড়ি। শুয়ে পড়তেই এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হই যে, একেবারে ভোর রাতে ঘুম ভাঙ্গে। দংশনের স্থানে একটি দানার মত হয়েছিল, কিন্তু কোন প্রকার ব্যথা ছিল না।'

এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা তার অতি পুরাতন বন্ধু মাওলানা আবদুস সামাদ সাইয়া শুনিয়েছিলেন। এই সফরের পর তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে। তিনি বলেন—

'১৯৮৬ ঈসায়ীতে উরগুনের পার্শ্ববর্তী 'খরগোশ' নামক এলাকায় তখন আমাদের ক্যাম্প ছিল। আমি এক রাতে সামরিক তৎপরতার পর ক্যাম্পে ফিরে আসি। আমার তাঁবুর মধ্যে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকে শুয়ে পড়ি। সারারাত দেহের বিভিন্ন অংশে চুলকানি ও সুড়সুড়ি অনুভূত হতে থাকে। ক্লান্তি ও ঘুমের চাপে আমি সেদিকে খুব একটা মনোযোগ না দিয়ে শুয়ে শুয়েই শরীর চুলকাতে থাকি এবং পাশ পরিবর্তন করতে থাকি। ভোরবেলায় উঠে কি জিনিস তা দেখার জন্য যখন স্লিপিং ব্যাগ খুলি, তখন স্লিপিং ব্যাগের ভিতর থেকে বড় একটি বিষাক্ত বিচ্ছু বের হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। সে বেচারা তো আমার সঙ্গে সারারাত স্লিপিং ব্যাগে বন্দী থাকা সত্ত্বেও আমাকে দংশন করেনি কিন্তু আমি তাকে ঠিকই

মেরে ফেলি—এ ঘটনায় আমি খুব বেশী বিস্মিত হইনি। কারণ, এখানে এ জাতীয় ঘটনা আগে থেকেই অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। এবং আল্লাহ তাআলার গায়েবী নুসরাতের এর চেয়েও অধিক বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রতিদিনই দেখা যেত।'

মাওলানা আবদুস সামাদ সাইয়াল সাহেবই এ ব্যাপারে আরেকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনিয়েছিলেন—

'গারদেজ এলাকায় দুশমনের ছাউনির পাশে মুজাহিদদের একটি ক্যাম্প ছিল। সেই ক্যাম্পের হেফাযতের জন্য মুজাহিদরা নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় মোর্চা বানিয়েছিল। সেখানে চারজন মুজাহিদ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তারা সর্বদা দুশমনের উপর নজর রাখত এবং মুজাহিদদের ক্যাম্পের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের প্রত্যেক তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দিত। দুশমন তাদের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য মোর্চাটি দখল করার ফিকিরে ছিল। এক রাতে মোর্চায় নিয়োজিত মুজাহিদরা নিচে পাহাড়ের পাদদেশে সৈন্যদের বুটের আওয়াজ শুনতে পায়। কিসের আওয়াজ তা দেখার জন্য পাহাড় থেকে অবতরণ করতে গিয়ে তারা কিছু লোকের পালানোর শব্দ এবং চিৎকার শুনতে পায়। দৌড়ে সেখানে গিয়ে টর্চের আলোতে তারা এই বিস্ময়কর দৃশ্যটি দেখতে পায় যে, প্রায় পনের জন কমিউনিষ্ট সৈন্য সেখানে পড়ে রয়েছে। তাদের অধিকাংশই মারা গেছে আর কয়েকজন তখনো শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তারা ক্যাম্প থেকে অন্যান্য মুজাহিদকে ডেকে আনে এবং সবিস্তারে ঘটনাস্থলের পর্যবেক্ষণ করে। তারা মৃত সৈনিকদের পাশে অনেকগুলো বিষাক্ত বিচ্ছু দেখতে পায়। মুজাহিদদেরকে দেখে বিচ্ছুগুলো পাথরের মধ্যে আত্মগোপন করতে থাকে। তখন বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা এই চারজন মুজাহিদ এবং তাদের মোর্চাটিকে কিভাবে হেফাজত করলেন। তাদেরকে ঘিরে ধরার জন্য রাতের অন্ধকারে যে দুশমন সৈন্যরা এসেছিল, তাদের মধ্যে থেকে প্রায় পনের জনকে বিচ্ছু বাহিনী মৃত্যুর কোলে শায়িত করে, আর অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়।'

মাওলানা আবদুস সামাদ সাইয়াল বলেন, ঘটনাটি আমাকে সেই ক্যাম্পের আফগান মুজাহিদগণ নিজেরাই শুনিয়েছেন—

مرد سپاہی ہے وہ ' اس کی زرہ "لاالہ"

سایہ شمشیر میں ' اس کی پنہ "لاالہ"

'তারা আল্লাহর সৈনিক, 'লা ইলাহা' তাদের বর্ম। তরবারীর ছায়াতলে 'লা ইলাহা' তাদের আশ্রয়স্থল।'

আমরা আড়াইটার দিকে ডেরা ইসমাঈল খানে পৌঁছি। যেসব সাথীর জন্য কাল সকালের মুলতানগামী বিমানে সিট রিজার্ভ করা সম্ভব হয়নি, তাদেরকে আজ সন্ধ্যাতেই ওয়াগন যোগে মুলতান যেতে হবে। আমি, মুহতারাম মুহাম্মাদ বিন্নুরী সাহেব এবং স্নেহের মৌলভী মুহাম্মাদ যুবায়ের উসমানী (সাল্লামাহু)এর জন্য পূর্বেই সিট রিজার্ভ করা ছিল। আমাদের তিনজনকে পি.আই.এ. এর অফিসের পাশে একটি হোটেলে থাকতে দেওয়া হয়।

২০শে শা'বান ১৪০৮ হিজরী
৮ই এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী, শুক্রবার

ইসলামাবাদ থেকে আগত পি.আই.এ. এর ফুকার বিমানটি সকাল নয়টার দিকে মুলতানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মাঝে অল্পক্ষণের জন্য 'জুব' (বেলুচিস্তান)–এ বিরতি দিয়ে এগারটার দিকে মুলতান পৌঁছে। বিমান বন্দরে একজন আত্মীয় এবং কিছু বন্ধু আমাদেরকে নেওয়ার জন্য আসে। আমাদেরকে আজ সন্ধ্যায়ই এখান থেকে বিমানযোগে করাচী যেতে হবে। আগে থেকেই সিট বুক করা ছিল। এখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, যে কোন উপায়ে করাচীতে ফোন করে সর্বপ্রথম আমার বড় বোনের অবস্থা অবগত হওয়া। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। কিন্তু এখানকার বন্ধুরা আমাদের বিরতির এই ছয় ঘন্টা সময়কে অবিরাম প্রোগ্রাম দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছিলেন। আমাকে জানানো হয় যে, জামেআ খাইরুল মাদারিসে জুমুআর সমাবেশে আফগানিস্তানের জিহাদ বিষয়েই আমাকে বক্তব্য দান করতে হবে। চারটার সময় মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নুবুওয়্যাতের দফতরে এ বিষয়েই সাংবাদিক সম্মেলন ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হোটেল থেকে জামেআ খাইরুল মাদারিসে যাওয়ার সময় আমাদের মেজবান ভাই আনোয়ার এলাহী সাহেব বলেন যে, 'এইমাত্র করাচীতে ফোনে কথা হয়েছে। আপনার বোনের অবস্থা ভাল নয়। তবে আপনি পেরেশান হবেন না। নামাযের পর আপনি নিজে ফোনে কথা বলুন।' সংবাদ শুনে আমার মন আঁতকে ওঠে। তার হাবভাবে সন্দেহ হচ্ছিল যে,

তিনি আমার নিকট কিছু একটা গোপন করছেন।

মানসিক এই চাপের মধ্যেই 'আফগান জিহাদ' বিষয়ে বক্তব্য দান করি। এ বিষয়টি অবগত হয়ে আমি বিস্মিত ও অনুতপ্ত হই যে, কতিপয় দ্বীনদার শ্রেণীর বিশেষ লোকও পূর্বে এই জিহাদের ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কেউ কেউ আমাকে বলেন যে, কতক রাজনৈতিক নেতার বিবৃতির ফলে এটি শরীয়তসম্মত জিহাদ হওয়ার ব্যাপারেই তাদের সন্দেহ ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, এখন সে সন্দেহ দূর হয়েছে। বক্তব্যদানের পর জনগণের মধ্যে অত্যন্ত আবেগ ও উদ্দীপনা দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকেই জিহাদে যাওয়ার সংকল্পও ব্যক্ত করেন। ওয়ালিল্লাহিল হামদ—সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই।

نومید نہ ہو ان سے ' اے رہبر فرزانہ
کم کوش تو ہیں لیکن ' بے ذوق نہیں راہی

'হে বুদ্ধিমান দিশারী ! এদের ব্যাপারে নিরাশ হইও না। চেষ্টায় ত্রুটি থাকলেও এরা রুচিহীন নয়।'

বড় বোনের ইন্তিকাল

নামাযের পর হোটেলে পৌছে করাচী ফোন করার ইচ্ছা করলে আমার মুহতারাম মেজবান থেমে থেমে বলবেন কি বলবেন না, এমন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সেই বেদনাবিধুর সংবাদটি আমাকে শোনায়, যার আশংকায় দুপুর থেকেই আমার দেহে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল—আমার বড় বোন ! অত্যন্ত স্নেহশীল বোন ! যিনি শৈশবে আমাকে কোলে নিয়ে খাওয়াতেন। আমার প্রতিপালনের কাজে পদে পদে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আজই সকাল আটটায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

পরে মেজবানগণ বলেন যে, আমি মুলতান পৌছার পূর্বেই তারা এ সংবাদ পেয়েছিলেন এবং এ পর্যন্ত তারা বার বার করাচী যোগাযোগও করেছেন। কিন্তু আজ মাগরিবের পূর্বে করাচীগামী কোন বিমান না থাকায় তারা আমার নিকট সংবাদটি গোপন রাখেন। কারণ, এমতাবস্থায় সংবাদটি জানানোর পরিণতি এই হত যে, এ পুরো সময়টি আমার অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে অতিবাহিত হতো এবং জুমুআর ভাষণ দানও

বাধাগ্রস্ত হতো। করাচী থেকেও তাদেরকে এ হেদায়াতই দেওয়া হয়েছিল যে, আমাকে সংবাদ জানানোর ব্যাপারে যেন তাড়াহুড়া করা না হয়।

ফোন করে জানতে পারি যে, জুমুআর নামাযের পর সাথে সাথে দারুল উলূম করাচীতে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং এখন দারুল উলূমেরই কবরস্থানে আব্বা ও আম্মার কবরের পাশে এইমাত্র দাফনের কাজ চলছে। জানাযা নামাযে অংশগ্রহণ এবং শেষ সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হওয়ার চরম দুঃখ হলেও এ কথা মনে করে অন্তরে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করি যে, আমার জন্য অপেক্ষা করা হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রজ্ঞাপূর্ণ এ বাণীর উপর আমল করা সম্ভব হত না—

اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَاتَحْبِسُوْهُ وَاَسْرِعُوْابِهٖ اِلٰي قَبْرِهٖ –

অর্থ ঃ 'তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে আটকিয়ে রেখ না। তাকে তাড়াতাড়ি তার কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।' (ফাতহুল মুলহিম)

অধমের সবচেয়ে বড় বোন আজ থেকে তেত্রিশ বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। তার ছোট তিন বোনের মধ্যে ইনি ছিলেন বয়সের দিক থেকে দ্বিতীয়। হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)এর নিকট বাইআত হওয়ায় এবং আমার আব্বাজানের প্রজ্ঞাপূর্ণ তা'লীম ও তারবিয়তের বরকতে তাঁর রুচি ও প্রকৃতি এবং কর্ম ও চেতনা ধর্মের ছাঁচে গড়া ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইবাদতের বিশেষ আগ্রহ ও স্বাদ দান করেছিলেন। এটিও তাঁর একটি সৌভাগ্য যে, পবিত্র জুমুআর দিনে তাঁর ওফাত হয়েছে। শুধুমাত্র পারিবারিক শিক্ষার বদৌলতে তিনি জ্ঞান ও সাহিত্যের এত উঁচুমানে পৌঁছেছিলেন যে, ডিগ্রীধারী অনেক মহিলার মধ্যেও এমনটি কম পাওয়া যায়। তিনি কাব্য ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ রুচির অধিকারিণী ছিলেন। তিনি নিজেও কবিতা রচনা করতেন। তাঁর এই কবিতা তো মনে হয় যেন বাড়ী থেকে হাসপাতাল যাওয়ার পথেই রচনা করেছেন—

چمن سے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ پھر نکہت
گذر بھی ہوگا سوئے آشیاں ' نہیں معلوم !

'হে পুষ্প সৌরভ ! কানন থেকে একথা চিন্তা করতে করতে পথ চলছি যে,
জানিনা বাসস্থান পর্যন্ত পুনরায় ফিরে যেতে পারব কি পারব না। !'

এ বিষয়টি এমন বেদনা বিধুর এবং আবেগপ্রবণ যে, মন চায় এ সম্পর্কে পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা লিখতে থাকি। কিন্তু তখন জিহাদের বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে যাব। বিধায় সুধী পাঠকের খেদমতে এই দরখাস্ত পেশ করে এ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করছি যে, আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক তাঁর জন্য পরিপূর্ণ ক্ষমা এবং উচ্চ মর্যাদার এবং পশ্চাতে রয়ে যাওয়া তাঁর আপনজনদের জন্য সবর, শান্তি ও ইহ–পরকালীন সফলতার দুআ করবেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهَا وَارْحَمْهَا

হে আল্লাহ, তাঁকে ক্ষমা কর এবং তাঁর প্রতি করুণা কর।

কমাণ্ডার যুবায়েরের পত্র

প্রায় তিন সপ্তাহ পর ১৪০৮ হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রণাঙ্গন থেকে কমাণ্ডার যুবায়েরের পত্র আসে। তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো—

তারিখ ঃ ২৫–৪–১৯৮৮ ঈসায়ী

মুহতারামুল মাকাম, ওয়াজিবুল ইহতিরাম হযরত মাওলানা যীদা মাজদুকুম

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

আশা করি ভাল আছেন। তাই কাম্য। আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত লড়াইয়ের ফলাফল সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করাই আজকের পত্রের মূল উদ্দেশ্য। গতকাল ২৪শে এপ্রিল (১৯৮৮ ঈসায়ী) উরগুন ছাউনী থেকে দু'জন আফগান সৈনিক পালিয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে। সৈনিক দু'জন অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই লড়াইয়ের ফলাফল সম্পর্কেও তথ্য প্রদান করে। তাদের বর্ণনা অনুপাতে আপনাদের পবিত্র হাতে নিক্ষিপ্ত মর্টার তোপের গোলাসমূহ 'জামাখোলা' পোষ্টে তোলপাড় সৃষ্টি করে। কারণ, গোলার আঘাতে এক দুইজন নয়, বরং একসঙ্গে তিনজন বড় সেনা অফিসার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাছাড়া আরও একজন সৈনিক মারা যায় এবং ছয়জন গুরুতর আহত হয়। প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও বড় অংকের অর্থ ও সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! সেই আক্রমণের পর থেকে দুশমন মারাত্মক রকম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আমরাও আক্রমণ তীব্রতর করেছি। কয়েকদিন পূর্বে আমরা দুটি মিসাইল নিক্ষেপ করি। তা অকস্মাৎ পতিত হওয়ায় দুশমনের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। পালিয়ে আসা সৈনিকদের বর্ণনা মতে তিনটি এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী ভরে মৃত ও আহতদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়।

আপনারা শুনে অবশ্যই আনন্দিত হবেন যে, পাকতিকা প্রদেশের আমীর, মহান কমাণ্ডার হযরত মাওলানা আরসালান খান রহমানী আফগানিস্তান এসে পৌছেছেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম তৈরী করেছেন। সেগুলো বাস্তবায়নে আমরা আপনাদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। আমাদের অন্যান্য প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে তো আপনারা অবগত আছেন। এখন আমাদের তীব্র প্রয়োজন লোকের। আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি যে, আপনারা লোক তৈরীর জন্য মেহনত করে তাদেরকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিবেন।'

দুআ করবেন আল্লাহ তাআলা যেন সমগ্র বিশ্বে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

আপনাদের দুআর মুহতাজ—মুজাহিদীনে ইসলাম।

ওয়াস সালাম।

—যুবায়ের আহমাদ খালেদ।

পত্র আসার কয়েক দিন পর পবিত্র রমযান মাসেরই একদিন রাত বারটার সময় ফোনে এই সুসংবাদ পাই যে, কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব কোয়েটা হয়ে এই মাত্র করাচী এসে পৌছেছেন। সকাল আটটায় বিমান যোগে মুলতান চলে যাবেন। সাথে সাথে এ পয়গামও পাই যে, আপনার কষ্ট না হলে তিনি এখনই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। এত ছিল আমার মনের কথা। তিনি রাত একটায় গরীব খানায় তাশরীফ আনেন। আমরা ফিরে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত লড়াই সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর ঈমানদীপ্ত বিস্তারিত ঘটনা শুনতে শুনতে এমন বিভোর হয়ে যাই যে, রাত সাড়ে তিনটা বেজে যায়। আমাদের দরখাস্তে তিনি ঐ সমস্ত সরঞ্জামের একটি তালিকা লিখে দেন; রণাঙ্গনে যেগুলোর তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন ছিল।

শহীদের জান্নাতে ইফতার

তিনি একটি তাজা লড়াইয়ের এই ঘটনাও শুনান—

'রমাযানের নয় তারিখ সকাল আটটায় দুশমনের 'জামাখোলা' চৌকির নিকটে গিয়ে তার উপর আমাদের আক্রমণ করার প্রোগ্রাম ছিল। আমরা সময়ের একটু পূর্বেই সেহেরী খেয়ে ক্যাম্প থেকে রওনা হই। ফয়সালাবাদের ঊনিশ বছর বয়সী হাফিযে কুরআন মুজাহিদ হাবিবুর রহমানকে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে আমি নিষেধ করি। কারণ, সে আমাদের ক্যাম্পে তারাবীহ্র নামায পড়াত। লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করাতে সে অত্যন্ত দুঃখিত হয় এবং অনুমতির জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকে। তার অধিক পীড়াপীড়িতে পরিশেষে আমি অনুমতি দান করি। তখন সে অপরিসীম আনন্দিত হয়।

চৌকির উপর আমরা মিসাইল দ্বারা আক্রমণ করি। হাবীবুর রহমানও এন্টি এয়ারক্রাফট গান দ্বারা উপর্যুপরি আক্রমণ করতে থাকে। ইফতারের আনুমানিক দশ মিনিট পূর্বে যখন দুশমনের পক্ষ থেকে গোলার বর্ষণ হচ্ছিল তখন সে তাদের মোর্চার মধ্যে দু'জন সাথীর মধ্যখানে বসা ছিল। তার চতুর্থ সাথী মোর্চার মধ্যে জায়গা না হওয়ায় বাইরে বসেছিল।

হাবীবুর রহমান তার সাথীদেরকে বলছিল, 'এখন আমরা জান্নাতে বসে আছি। কারণ, হাদীস শরীফের মধ্যে এসেছে যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার তলে। আর এখন আমরা গোলার ছায়ার তলে বসে আছি।'

তারপর বলে—'আজ পিপাসাও লেগেছে খুব তীব্র। কতই না ভাল হত যদি আজ জান্নাতে ইফতার করতে পারতাম!' —সে একথা বলে নীরব হতেই দুশমনের মর্টার তোপের একটি গোলা তাদের নিকটে পতিত হয়ে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে সাথী মোর্চার বাইরে বসেছিল তার তো আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। মোর্চার ভিতরের একজন সাথীও অক্ষত থাকে। অপর সাথী সামান্য আহত হয়। কিন্তু হাফেয হাবীবুর রহমানকে—যে জান্নাতে ইফতার করার বাসনা করেছিল—গোলার বড় একটি টুকরা এসে আঘাত করে এবং সে তখনই শহীদ হয়ে যায়।'

এ ঘটনা শুনাতে গিয়ে কমাণ্ডার সাহেবের নয়ন যুগলে অশ্রু ঝলমল করতে থাকে। তারপর তিনি মাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কিছু একটা ভাবতে ভাবতে স্বগোক্তির ন্যায় বলেন, 'শহীদও আশ্চর্য রকম হয়ে

থাকে।'

তিনি যখনই কোন শহীদের কথা আলোচনা করতেন তখনই অনুভূত হয়েছে যে, তিনি নিজেও শাহাদাতের জন্য ব্যাকুল। তাঁর মতাদর্শ সবসময় এই দেখতে পেয়েছি—

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے
مسلماں کو ہے ننگ وہ بادشاہی

'যে রাজত্ব রক্তের বিনিময়ে আমরা ক্রয় করিনি, তা মুসলমানদের জন্য লজ্জাজনক।'

রাত সাড়ে তিনটার সময় যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি মুলতান হয়ে রণাঙ্গনে যাচ্ছেন। মুলতানের অদূরেই আপনার বাড়ী, আপনি বাড়ী যাবেন না?

তিনি শীতল নিঃশ্বাস ছেড়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আমার দেড় বছরের একমাত্র মেয়ে এখন আমাকে চিনতে আরম্ভ করেছে, আল্লাহ পাক চাইলে তাকে এবং বাড়ীর অন্যান্যদেরকে অবশ্যই দেখতে যাবো। কিন্তু কয়েক ঘন্টার বেশী অবস্থান করতে পারব না। কারণ, পরবর্তী তৎপরতার জন্য অনতিবিলম্বে রণাঙ্গনে যাওয়া জরুরী। এখন আমরা উরগুনের চতুর্পার্শ্বে আমাদের অবরোধ অনেকটা সংকীর্ণ করে এনেছি। আমরা অতি দ্রুত তার পরিপূর্ণ অবরোধ করতে চাই। আমাদের এতদিনের অভিজ্ঞতা এই যে, অবরোধ পরিপূর্ণ হওয়ার পর দুশমন সর্বোচ্চ চার মাসের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণ করে।'

বিদায়ী মুসাফাহা কালে আমি আয়াতুল কুরসীর আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেই। আমল শেষ হতেই তিনি দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে জীপে আরোহণ করেন।

রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসার পর আমাদের কাফেলার অন্য কয়েকজন বন্ধুর ন্যায় অধম লেখকও আফগানিস্তানের জিহাদ বিষয়ে ভাষণ ও বক্তব্যের ধারা অব্যাহত রাখি। দারুল উলূম করাচীর জামে মসজিদে কয়েক মাস পর্যন্ত অধম এই বিষয়ের উপরই বক্তব্য দান করি। আলহামদুলিল্লাহ, কয়েকজন তরুণ রমাযানের মধ্যেই রণাঙ্গনে চলে যায়। অধমের আপনজন—আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং দারুল উলূমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হিতাকাংখী ও সহযোগীগণ জিহাদের জন্য প্রায়

পাঁচ লক্ষ টাকা কালেকশন করেন। সে টাকা দ্বারা আমরা প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, এক ডজন স্ট্রেচার এবং একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জাম সম্বলিত এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করে কমাণ্ডার সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেই। মুজাহিদদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সামানও লোকেরা সংগ্রহ করে। সেগুলো রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ, পরবর্তীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকে।

خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم
عشق ہو جس کا جسورٗ فقر ہو جس کا غیور

'পৃথিবীর বুকে ঐ জাতি লাঞ্ছিত হতে পারে না, প্রেম যাদের বীরত্ব এবং দারিদ্র্য যাদের আত্মমর্যাদা।'

আমাদের আফগানিস্তানের সফর সংক্রান্ত আলোচনা তো এখানে এসে শেষ হয়ে গেলো। [১]

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই নয়, বরং যেই পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের জিহাদ হচ্ছে, তাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নুসরাত ও সাহায্যের মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধিকে হতবিহবলকারী যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার যে সমস্ত তথ্য নির্ভরযোগ্য মুজাহিদদের নিকট থেকে সরাসরি আমি অবগত হয়েছি সেগুলোর সারাংশ লিপিবদ্ধ করাও আমার বিশেষ উদ্দেশ্য। বিধায় সম্মুখে শুধুমাত্র এমন সব ঘটনা উল্লেখ করব, যেগুলো এই সফরের পরবর্তীতে ঘটেছে, অথবা যেগুলো সম্পর্কে আমি পরবর্তীতে জানতে পেরেছি। কারণ সেগুলোর আলোচনা ছাড়া এ গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশেষত উরগুন রণাঙ্গনের পরবর্তী অবস্থা জানার জন্য সম্ভবত সুধী পাঠকও প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

জেনেভা চুক্তি এবং পাকিস্তান

এই চুক্তির প্রেক্ষাপট এবং সারকথা 'মুজাহিদীন এবং জেনেভা চুক্তি' শিরোনামে অনেক পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ চুক্তি পাকিস্তানের উপর

---

১. পাকতিকা প্রদেশের গারদেজ রণাঙ্গনের ছোট একটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আমাদের দ্বিতীয় সফর হয় ১৯৯১ ঈসায়ীর আগষ্ট মাসে। সুযোগ হলে শেষ দিকে তার কিছু বিবরণ তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ। —রফী উসমানী

জবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যথায় রাশিয়া এবং আফগান মুজাহিদগণ ছিল এর দুই পক্ষ। যদি চুক্তি বা আলোচনা হতেই হয় তাহলে এই দুই পক্ষের মধ্যে হওয়া উচিত ছিল। পাকিস্তান তো এ ব্যাপারে কোন পক্ষই ছিল না। কিন্তু আমেরিকা ও রাশিয়ার গোপন আঁতাত ও চক্রান্ত দেখুন যে, তারা এই চুক্তি পাকিস্তান সরকার এবং কাবুলের ব্যবস্থাপকদের মাঝে সম্পন্ন করতে বাধ্য করে। যে রাষ্ট্র বা সরকার অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন ধারণ করতে চায়, তাদেরকে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড়সমূহেও জাতির বিবেকের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। পাকিস্তানের নির্বাচিত মুসলিম লীগের দোদুল্যমান সরকারও এমন জাতীয় অপরাধের শিকার হয়েছে। নাজানি পাকিস্তানের দার্শনিক কবি ইকবাল মরহুমের একথা আমাদের সরকারের কখন বুঝে আসবে—

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک
اور پہچانے تو ہیں ' تیرے گدا دارا وجم

'নিজের রিযিকদাতা আল্লাহকে না চিনলে সে দেশ হবে পরের দুয়ারে হস্ত সম্প্রসারণকারী। আর তাঁকে যে চিনবে তার নিকট পারস্যের সম্রাট জমসেদ ও দারাও ভিক্ষার পাত্র নিয়ে আসবে।'

যা হোক ১৯৮৮ ঈসায়ীর এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে জেনেভায় সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায় এই চুক্তিপত্রের উপর পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জায়েন নূরানী এবং কাবুলের কমিউনিষ্ট সরকারের পক্ষ থেকে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মূল প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বাক্ষর করে। রাশিয়া এবং আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা নিজ নিজ দেশের পক্ষ থেকে জামিন হিসেবে স্বাক্ষর করে।

চুক্তির দলিলপত্রে বলা হয় যে, এই চুক্তি স্বাক্ষর করার ষাট দিন পর (১৫ই জুন ১৯৮৮ ঈসায়ী থেকে) কার্যকর হবে। (আফগানিস্তান থেকে) বহির্দেশীয় (রাশিয়ান) সৈন্য প্রত্যাহার ঐ তারিখ (১৫ই জুন) থেকে আরম্ভ হবে। ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৮ ঈসায়ীর মধ্যে অর্ধেক সৈন্য ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং নয় মাসের মধ্যে সকল সৈন্য প্রত্যাহারের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।

চুক্তিপত্রে পাকিস্তানের উপর আরোপকৃত কড়া বিধিনিষেধসমূহ

এই চুক্তির দলিলপত্রসমূহে কূটনীতির চমৎকার শব্দের মোড়কে পেঁচিয়ে পাকিস্তানের উপর যে সমস্ত কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় সাদামাটা ভাষায় তা এই—

১. রাশিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাবুলের কমিউনিষ্ট সরকারকে—পাকিস্তান আজ পর্যন্ত যাকে স্বীকৃতি দেয়নি—পাকিস্তান স্বীকৃতি দান করবে।

২. পাকিস্তান আফগানিস্তানের সেই আশি শতাংশ এলাকাতেও কাবুলের পুতুল সরকারের ক্ষমতা স্বীকার করে নেবে, যেগুলোকে মুজাহিদরা আযাদ করেছে এবং তার উপর মুজাহিদদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

৩. অবৈধ কাবুল সরকার—যাকে আমেরিকাও অবৈধ সরকারই বলে থাকে—যে রাশিয়ার সাথে মিলে এবং তারই শক্তির উপর নির্ভর করে মুজাহিদদের সঙ্গে লড়ে চলছে এবং যার ঘাড়ে আফগানিস্তানের পনের লক্ষ মুসলমানের খুনের দায় দায়িত্ব রয়েছে—পাকিস্তান তার শীর্ষ ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং জাতীয় ঐক্য ও শান্তির এমনই 'মর্যাদা' দিবে এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে এমনই নিরাপত্তা দান করবে, যেমন পাকিস্তান তার নিজের জন্য কামনা করে থাকে। (তার অধীনে এই ধমকিও রয়েছে যে, পাকিস্তান এরূপ না করলে কাবুলের গোপন সংগঠন 'খাদ' এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমাণ্ডো বাহিনী পাকিস্তানে সেই সমস্ত ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এবং সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডসমূহকে অব্যাহত রাখবে, যা কয়েক বছর ধরে এখানকার শহরগুলোতে সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে)

৪. পাকিস্তান তার প্রচার মাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে, যেন তার দ্বারা কমিউনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার প্রোপাগাণ্ডা না হয়।

তথাকথিত এই চুক্তি রাশিয়ার প্রতিষ্ঠিত কাবুলের পুতুল সরকারকে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম জোগান দিতে রাশিয়াকে বাধা দেয় না এবং ভারতের উপরেও এ ব্যাপারে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না—আমেরিকাও ইচ্ছা করলে মুজাহিদদেরকে অস্ত্র দিতে পারবে কিন্তু

পাকিস্তানের উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যে—

৫. সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুজাহিদদেরকে কোনপ্রকার সহযোগিতা বা উৎসাহ দিবে না।

৬. মুজাহিদদেরকে অবিলম্বে পাকিস্তান থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করবে। পাকিস্তানের মাটিতে এক মুহূর্তের জন্যও কোন মুজাহিদের অস্তিত্বকে বরদাস্ত করবে না।

৭. পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে মুজাহিদদের যাতায়াতের কিংবা অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবে না।

৮. মুজাহিদদেরকে সাধারণ প্রচার মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করার অনুমতিও দিবে না।

মোটকথা, পাকিস্তানকে আফগানিস্তানের জিহাদ এবং মুজাহিদদেরকে পরিপূর্ণরূপে বয়কট করতে হবে। অন্য কোন দেশ থেকে আসা কোন সাহায্যও মুজাহিদদের নিকট পৌছতে দিবে না। এবং কাবুলের অবৈধ সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক 'শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার' নীতি অবলম্বন করে তার পরিপূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। মোটকথা পাকিস্তানকে তার নয় বছরের আফগান নীতির বিপরীত ইসলামের নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদদের সঙ্গে দুশমনি এবং তাদের দুশমন কমিউনিষ্টের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে। আফগানিস্তানের জনসাধারণ, পাকিস্তান এবং মুসলিম উম্মাহ এই ধৈর্য সংকুল জিহাদের যেই সুদূরপ্রসারী ফল সত্বরই লাভ করতে যাচ্ছে তার সবই আমেরিকা, রাশিয়া এবং রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পুতুল সরকারের থলেতে ঢেলে দিতে হবে এবং এই সরকারের মাধ্যমে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত খেলা পুনরায় খেলার সুযোগ লাভ করবে, যা সে জিহাদ শুরু হওয়ার কাল থেকে খেলে আসছে।

রুশবাহিনীর পশ্চাদাপসরণ

বাহ্যত এই চুক্তিতে বহির্দেশীয় (রাশিয়ান) সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ঘোষণাটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমসমূহ চুক্তির এই অংশটিকেই অধিক ফলাও করে প্রচার করে একে 'মহাসাফল্য' সাব্যস্ত করেছে। পাকিস্তানের উপর যে সমস্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সেগুলো থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা বারবার এই

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চেষ্টা করছে যে, মূলত রাশিয়ান সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকে নিশ্চিত করার জন্য এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কিন্তু যার আফগান জিহাদ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও আছে, সেও জানে যে, রুশবাহিনীর প্রত্যাহারের বিষয়টি এতে শুধুমাত্র 'রং' দেওয়ার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় এটি এই চুক্তির সবচেয়ে অর্থহীন অংশ। কারণ, রাশিয়া তো পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে চুক্তি ছাড়াই তার সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে, যা এই চুক্তির আঠাশদিন পূর্বে ১৮ই মার্চ ১৯৮৮ ঈসায়ীর পত্রপত্রিকার প্রধান শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, রাশিয়া প্রথম দিকে এই ঘোষণা দিয়েছিল যে, যদি ১৯৮৮ ঈসায়ীর ১৫ই মার্চের মধ্যে জেনেভা চুক্তির উপর স্বাক্ষর করা হয় তাহলে ১৫ই মার্চ ১৯৮৮ ঈসায়ী থেকে সে তার সৈন্য প্রত্যাহার আরম্ভ করবে। সাথে সাথে পাকিস্তানকে সে এই বলে ধমকি দিয়েছিল যে, 'এটাই শেষ সুযোগ, ১৬ই মার্চের মধ্যে স্বাক্ষর করা না হলে এ প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাবে।' কিন্তু পাকিস্তান সরকার প্রথম দিকে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে এবং স্বাক্ষর করার ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ দেখায়নি। এমনকি মার্চের ১৫ তারিখও অতিবাহিত হয়ে যায়।

তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, রাশিয়া সৈন্য প্রত্যাহার করতে কি অস্বীকৃতি জানাবে?—এই প্রশ্নের উত্তর সে বড় অসহায়ভাবে এই দেয়—

'চুক্তি না হলেও আমরা আমাদের সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং তার কর্মপন্থা সম্পর্কে আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।'

যা ১৮ই মার্চের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

একটি কৌতুক

এ প্রসঙ্গে একটি কৌতুক স্মরণ হলো, এক দোকানের কর্মচারী মালিকের নিকট বেতন বাড়ানোর জন্য বারবার আবেদন করে। মালিক একবারও তার প্রতি কর্ণপাত করে না। অবশেষে একদিন সে ক্রোধান্বিত হয়ে ধমকের সুরে মালিককে বলে, এই মাস থেকে বেতন বাড়িয়ে দাও, তা না হলে'... —মালিক ক্রোধান্বিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'তা না হলে কি?' কর্মচারী তখন কুঁকড়ে যায় এবং দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলে, 'তা নাহলে—হুযূর এ বেতনেই কাজ করব।'

যা হোক রাশিয়া তার বাহিনী প্রত্যাহারকে জেনেভা চুক্তির সঙ্গে বেঁধে রাখেনি। নয় বছরের শিক্ষণীয় লাঞ্ছনা এবং মুজাহিদদের চরম প্রতিরোধে অসহ্য হয়ে সে এই ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য ছিল। কারণ, একদিকে তার সেনাবাহিনী মারাত্মকভাবে মার খাওয়ার ফলে যে কোন মূল্যে এখান থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরে যেতে অস্থির ছিল। অপরদিকে এই নয় বছরের ভাগ্য পরীক্ষায় চূড়ান্ত ব্যর্থতার কারণে অনেকগুলো আভ্যন্তরীণ সমস্যা রাশিয়াকে অক্টোপাসের ন্যায় মারাত্মকভাবে জড়িয়ে ধরে। অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। তার অধিকৃত ইসলামী রাজ্যসমূহ—উজবেকিস্তান (বোখারা, সমরকন্দ, তাসখন্দ) তাজিকিস্তান প্রভৃতি দেশের মুসলমানদের মধ্যে আযাদীর চেতনা প্রবল হয়ে জেগে ওঠে।

বিধায়, এ কথা নিশ্চিত ছিল যে, রুশ বাহিনী—যারা এখানে চোখে শর্ষেফুল দেখছিল—অতি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবে। সুতরাং জেনেভা চুক্তি হোক চাই না হোক, সর্বাবস্থায় রাশিয়া 'ঐ বেতনেই কাজ করার' ঘোষণা দিয়েছিল। রাশিয়া তার সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কি পরিমাণ অস্থির ছিল তা বিশ্ববাসী এ থেকেও কিছুটা অনুমান করে যে, যখন ১৪ই এপ্রিল এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়, তখন চুক্তির ভিত্তিতে ১৫ই জুন থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা থাকলেও সে 'সতর্কতামূলক' ১৫ই মে অর্থাৎ এক মাস পূর্বেই সেনা প্রত্যাহার আরম্ভ করে।

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জেনেভা চুক্তিতে রুশ বাহিনী প্রত্যাহারের বিষয়টি কোন মূল্যই রাখে না। চুক্তির মূল বিষয় ছিল পাকিস্তানের উপর আরোপকৃত বিধিনিষেধসমূহ।

সমগ্র কুফরী বিশ্ব এক জাতি

রাশিয়া এবং আমেরিকা নিজেদের আদর্শিক ও অর্থনৈতিক চরম বিরোধ সত্ত্বেও অতীতের ন্যায় এবারেও ইসলামের শত্রুতায় সম্মিলিত পলিসির অনুসরণ করেছে। তারা উভয়ে এই বিন্দুতে ঐক্য স্থাপন করেছে যে, রুশ বাহিনীর প্রত্যাহারের পর এখানে মুজাহিদদের ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে। এখানে

কোনভাবেই এমন কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া যাবে না, যে পাকিস্তানের জন্য সামান্যতম শক্তি ও স্বস্তির কারণ হতে পারে। এ বিষয়ে আমেরিকা ও রাশিয়াই শুধু নয়, বরং সমস্ত পশ্চিমা শক্তি এক মন ও এক রা। যেই ভারত পুরা নয় বছর আফগান বিষয়ে জড়ায়নি এই বিন্দুতে এসে এখন সেও তার বেনিয়া মনোভাব নিয়ে তৎপর রয়েছে।

এই চুক্তির মাধ্যমে একদিকে তো পাকিস্তান ও অন্যান্য ইসলামী দেশ থেকে সাহায্য ও স্বেচ্ছাসেবক পৌছার যাবতীয় পথ বন্ধ করে মুজাহিদদেরকে নিঃসঙ্গ করার এবং তাঁদের জন্য জীবন ধারণকে সংকীর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরদিকে যেমনিভাবে রাশিয়া বারবার ঘোষণা করছে যে, সেনা প্রত্যাহারের পরেও সে তার প্রতিষ্ঠিত কাবুলের পুতুল সরকারকে অস্ত্র যোগান দিতে থাকবে, তেমনিভাবে আমেরিকাও এই কপটতাপূর্ণ ঘোষণা করেছে যে, বর্তমানের কাবুল সরকার বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত সে মুজাহিদদেরকে সহযোগিতা করে যাবে। (কিন্তু কোন্ পথে করবে তা প্রকাশ করা হয়নি)

আমেরিকার বিপরীতমুখী এই 'কর্মকৌশলের' লক্ষ্য এই যে, যেভাবে কাবুল সরকার পরিপূর্ণরূপে রাশিয়ার দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে মুজাহিদরাও আমেরিকার করুণার উপর নির্ভরশীল হোক। পাকিস্তান ও সমগ্র বিশ্ব থেকে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে শুধুমাত্র আমেরিকার সাথে বহাল থাক। যাতে করে আমেরিকা সাহায্য দানের জন্য যথেচ্ছা তাদের উপর শর্তারোপ করতে পারে। তথাকথিত এই সাহায্যকে মুজাহিদদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য প্রভাবশালী অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারে। কাবুল স্বাধীন হলে মুজাহিদদের পরিবর্তে এখানে এমন লোকদের সমন্বয়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যারা সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার তাবেদার এবং ওয়াফাদার হবে। অথবা জহির শাহের মত এমন শাসক চাপিয়ে দেওয়া যায়, যে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও স্বার্থের পথ বন্ধ করে রাশিয়া, আমেরিকা এবং ভারত তিনজনকেই খুশী রাখতে পারে।

বাহ্যত এখন আমেরিকাও কাবুলের বিজয় বিলম্বিত করার চেষ্টা করবে, যেন এই সময়ে মুজাহিদদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এখানে 'কাংখিত' লোকদেরকে মাঠে আনা সম্ভব হয়।

এই কর্মকৌশলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—যার মধ্যে ভারত ও রাশিয়া

অগ্রসর—এই যে, ঠিক যে সময় বিজয়ী মুজাহিদরা কাবুলের দুয়ারে আঘাত করছে, এমন সময় আফগানিস্তানে শক্তিশালী ইসলামী হুকুমাতের স্থলে নতুন সেকুলার সরকার প্রতিষ্ঠা করে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের জন্য এমন বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যেমনটি জিহাদের পূর্বে ছিল। তথাকথিত 'পাখতুনিস্তান' সমস্যার—আফগান জিহাদ যাকে মাটি চাপা দিয়েছে—প্রথিত লাশকে তুলে এনে যেন পুনরায় খাড়া করা সম্ভব হয় এবং প্রয়োজনের সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাকেও ব্যবহার করা যায়। জেনেভা চুক্তি ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহের ঐক্যস্থাপনের প্রথম ধাপ।

আমি তথাকথিত চুক্তির ভাষ্যগুলো গভীরভাবে বারবার অধ্যয়ন করার পরও এছাড়া অন্য কোন ফলাফলে উপনীত হতে পারিনি যে, এই চুক্তি—অত্যন্ত পরিশ্রম করে যার সুদীর্ঘ দস্তাবেজসমূহকে কূটনীতির আদব কায়দা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে—একটি সুদৃশ্য ফাঁদ, যার সুতাগুলোকে শুধুমাত্র মুজাহিদ, আফগান জনসাধারণ এবং পাকিস্তানকে ফাঁসানোর জন্য বুনন করা হয়েছে—

ہیں کواکب کچھ ' نظر آتے ہیں کچھ
دیتے ہیں دھوکا یہ بازی گر کھلا

'যা দেখা যাচ্ছে তা প্রকৃত নক্ষত্রপুঞ্জ নয়,
এসব বাজিকরের সুস্পষ্ট ধোকামাত্র।'

মুসলিম উম্মাহর অবস্থান

নির্ভরযোগ্য বহুবিধ সূত্রে অবগত হওয়া গেছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শহীদ জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক সাহেবের—আফগান জিহাদ সূচনা থেকেই যাঁর মোমিনসুলভ সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা এবং পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছে—এহেন চুক্তির ব্যাপারে তীব্র মতবিরোধ ছিল। তিনি পাকিস্তানের সেবাদাস সরকারকে এই চুক্তি থেকে বিরত রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত পূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর অবস্থানও সমগ্র মুসলিম উম্মাহের অবস্থানের মত এই ছিল যে, রুশ বাহিনী এমন অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে যে, আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যেতে তাদের কোনপ্রকার চুক্তি বা বাহানার জন্য প্রতীক্ষা করার সময় নেই।

মুজাহিদদের বিজয় নিশ্চিত। এমতাবস্থায় কাবুলের কমিউনিষ্ট সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে তাকে আফগানিস্তানের জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসতে সহযোগিতা করা—যখন কিনা কয়েকটি শহর এবং ছাউনী ছাড়া সারা দেশের কোথাও তার অস্তিত্ব নেই—'নিজের পায়ে কুড়াল মারা' ছাড়া আর কিছু নয়। আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের চুক্তি যদি কারো সাথে করতেই হয়, তাহলে সে চুক্তি এ বিষয়ে হওয়া উচিত যে, রুশ বাহিনীর প্রত্যাহারের সাথে সাথে কাবুলের বর্তমান সরকারের স্থলে মুজাহিদদের অস্থায়ী সরকারকে প্রতিষ্ঠা করা হোক, যা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই সেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক পূর্ণাঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার এই একটি মাত্র পথই অবশিষ্ট রয়েছে। অন্যথায় একদিকে মুজাহিদরা পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করা পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখার ঘোষণা করেছে। অপরদিকে রাশিয়া কাবুল সরকারকে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রসমূহও যোগান দিতে থাকবে। যার সারকথা এছাড়া আর কি হতে পারে যে, যুদ্ধ অব্যাহত গতিতে চলতেই থাকবে। চুক্তি করা হয় শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, এরকম কোন পথই এই চুক্তিতে গ্রহণ করা হয়নি।

আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের চাপ প্রয়োগ

এ কথা ঠিক যে, এই চুক্তি করার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের প্রচণ্ড চাপ ছিল। আমেরিকার চাপের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। চুক্তির উপর স্বাক্ষর করার মাত্র চারদিন পূর্বে ১০ই এপ্রিল ১৯৮৮ ঈসায়ী 'রাওয়ালপিণ্ডি উজড়ি ক্যাম্প অর্ডিন্যান্স ডিপো'তে সংঘটিত মারাত্মক বিস্ফোরণ এবং সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা, রকেট ও মিসাইল রাওয়ালপিণ্ডি এবং ইসলামাবাদের মত ঘনবসতিপূর্ণ শহরসমূহে প্রলয় ঘটায়। এ ব্যাপারে জনসাধারণের ধারণা এই যে, এটি রাশিয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী অথবা আমেরিকার সি.আই.এ. এর কাজ। কিন্তু এ জাতীয় জটিল পরিস্থিতি বিভিন্ন জাতির জীবনে এসেই থাকে। এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতেই জাতীয় নেতৃত্বের সাহস, সংকল্প, জ্ঞান, বুদ্ধি, দ্বীনদারী, ইখলাস ও বিচারশক্তির পরীক্ষাও হয়ে থাকে। আফসোস! তখনকার নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার জাতীয়

জীবনের এই নাজুক মুহূর্তে পৌঁছেই পদস্খলিত হয়। শহীদ প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউল হক দ্বারা— যার উপর স্বেচ্ছাচারিতার অপবাদ দেওয়া হয়—ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহ জাতির বিবেক বিরোধী যেই চুক্তি নয় বছরে করাতে সক্ষম হয়নি, এই নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা এক ধাক্কায় তা করিয়ে নেয়।

یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو
مجھکو تو گلہ تجھ سے ہے' یورپ سے نہیں ہے

'তুমি ইউরোপের দাসত্বকে মেনে নিয়েছো এজন্য তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, ইউরোপের বিরুদ্ধে নয়।'

সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া এই যে, চুক্তির দেড় মাস পর, ১৯৮৮ ঈসায়ীর মে মাসের ২৯ তারিখে—যখন চুক্তি বাস্তবায়নে মাত্র সতের দিন বাকী ছিল—মরহুম প্রেসিডেন্ট জাতীয় ও প্রাদেশিক এসেম্বলী ভেঙ্গে দিয়ে সেবাদাস মনোবৃত্তির সরকারকে পদচ্যুত করার যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করাও তার বড় একটি কারণ ছিল।

* * *

একদিকে আফগান জিহাদের সুফলকে হাইজ্যাক করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সমস্ত প্রস্তুতি চলছিল, অপরদিকে মুজাহিদগণ এ সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে বিজয় বা শাহাদতের কন্টকাকীর্ণ রাজপথ ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

১৫ই মে ১৯৮৮ ঈসায়ী থেকে রুশ বাহিনীর আফগানিস্তান থেকে পিছু হটা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই কমিউনিষ্ট কাবুল বাহিনীও তাদের মোর্চা, চৌকি এবং ছাউনীসমূহ ফেলে রেখে কাবুল ও অন্যান্য শহরের দিকে পালাতে থাকে। যে সমস্ত মুসলমান সৈনিক এ পর্যন্ত কমিউনিষ্টদের জুলুম ও চাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি, এ ধরনের অসংখ্য সৈনিক সুযোগ পেয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। তাদের এ সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি পত্রপত্রিকায় প্রতিদিনের সংবাদ হয়ে দাঁড়ায় যে, 'আজ অমুক অমুক চৌকি থেকে কমিউনিষ্ট সেনারা

রাতারাতি পালিয়ে গিয়েছে' এবং 'অমুক অমুক এলাকা মুজাহিদগণ জয় করেছে।' কাবুল এবং জালালাবাদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ শহরসমূহেও মুজাহিদদের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমার দেহ রণাঙ্গন থেকে ফিরে এলেও আমার মনমগজ সেখানেই পড়ে থাকে। বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে আগত মুজাহিদদের সাক্ষাতই তখনকার মত আমার শান্তি ও তৃপ্তির মাধ্যম হয়। এরূপ সাক্ষাৎ আলাপ তখন অনেক হচ্ছিল। এঁরা আল্লাহ তাআলার গায়েবী সাহায্য ও রহমতের যে সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করছিলেন, তা শুনে শুনে আমার ঈমান তাজা হচ্ছিল। ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

মুজাহিদদের রাডার

নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদগণ দুনিয়ার যে চরম নিষ্ঠুর জালিম পরাশক্তির মোকাবেলায় শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের নিকট এমন কোন যন্ত্র বা রাডার ইত্যাদি ছিল না, যার দ্বারা দুশমনের আকাশ পথের আক্রমণ সম্পর্কে আগাম সংবাদ পাওয়া যেতে পারে।

আমি অনেক মুজাহিদ থেকেই শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা তাদের হিফাযতের জন্য এই গায়েবী ব্যবস্থা করেন—যা বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, দুশমনের আকাশ পথের আক্রমণের পূর্বে এমন কিছু বিরল ও বিস্ময়কর শ্বেত পাখি—যেগুলো ইতিপূর্বে কখনো আফগানিস্তানে দেখা যায়নি—ঝাঁকে ঝাঁকে এসে মুজাহিদদের ক্যাম্পের উপর বসত এবং অবিশ্রান্তভাবে চিৎকার জুড়ে দিত। অথবা ক্যাম্পের উপর আকাশেই চিৎকার করতে করতে কয়েকটি চক্কর দিয়ে ফিরে যেত। তারা ফিরে যেতেই দুশমনের বিমান ও গানশিপ হেলিকপ্টারের আক্রমণ আরম্ভ হত। প্রথমদিকে মুজাহিদরা এ সমস্ত পাখি ও দুশমনের আকাশ পথের আক্রমণের মধ্যে কোন যোগসূত্র বুঝে উঠতে পারেনি।

পরে যখন অধিক হারে এই ঘটনা ঘটতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই সহায় সম্বলহীনদেরকে আকাশপথের আক্রমণ সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য এই বিরল ও বিস্ময়কর রাডারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এ সমস্ত পাখিকে রাডারের উৎকৃষ্ট বিকল্প বানিয়েছেন। যখন থেকে এ কথা

ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকে তারা এ সমস্ত পাখিকে কাছে এসে চিৎকার করতে দেখতেই পরিখা ও মোর্চার মধ্যে আত্মগোপন করতে থাকে। ফলে দুশমনের আকাশ পথের আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যেত। আমার মনে পড়ে যে, আফগানিস্তানের এই বিরল বিস্ময়কর কারামত সম্পর্কে আমাকে কমাণ্ডার যুবায়ের আহমাদ সাহেবও ১৪০৮ হিজরীর রমযান মাসের সাক্ষাৎকালে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সহ আরো যারা এই ঘটনা শুনিয়েছেন, আমি তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি যে, এ ঘটনা কি তাদের চোখে দেখা না শোনা। আমি স্বচোখে দেখা সাক্ষীর সন্ধান করতে থাকি। এমন সময় আবদুস সামাদ সাইয়াল সাহেবের সঙ্গে অধিক হারে মুলাকাত হতে থাকে। তিনি পাকিস্তানের সেই মুজাহিদত্রয়ের অন্যতম, যাঁরা প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের উপর রাশিয়ান সেনা আগ্রাসনের সংবাদ শুনে ১৯৮০ ঈসায়ীর ১৮ই ফেব্রুয়ারী করাচী থেকে চরম নিঃসম্বল অবস্থায় জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে পা বাড়ান। বর্তমানে তিনি 'হরকাতুল জিহাদিল ইসলামী' সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক আল ইরশাদ পত্রিকার সম্পাদক। আমি তাঁর নিকট শ্বেতপাখি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং নিজের সঙ্গে ঘটা একটি ঘটনা শুনান।

তিনি বলেন—

আমিও মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেব এবং অন্যান্য আফগান মুজাহিদদের নিকট থেকে এই পাখি সম্পর্কে শুনেছিলাম। তারপর ১৯৮৬ ঈসায়ীর রমযান মাসে যখন আমাদের ক্যাম্প পাকতিকা প্রদেশের উরগুনের পাশে খরগোশ নামের একটি পাহাড়ী অঞ্চলে ছিল, তখন একদিন সকালে আমি সম্মুখের পাহাড়ে আরোহণ করি। পাহাড়ের চূড়ায় বসে আমি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছিলাম—এগারটার দিকে অকস্মাৎ কবুতরের মত একদম শ্বেত রঙের পাখির একটি ঝাঁক—যাদের ঠোঁট ছিল লালচে—চিৎকার করতে করতে আমার মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে যায় এবং আমাদের ক্যাম্পের উপরে চক্কর দিতে আরম্ভ করে। পাখিগুলো অবিশ্রান্তভাবে চিৎকার করে চলছিল। হঠাৎ আমার আফগান মুজাহিদদের কথা স্মরণ হয়। আমি তাড়াতাড়ি নেমে পাহাড়ের পাদদেশে বড় একটি পাথরের আড়ালে শুয়ে পড়ি। ওদিকে ক্যাম্পের অন্যান্য মুজাহিদও তাঁবু এবং কামরা হতে বের হয়ে গর্ত,

পাথরের আড়াল, খননকৃত মোর্চা ও পরিখা ইত্যাদির মধ্যে আত্মগোপন করে। পাখিগুলো আমাদের ক্যাম্পের উপর দিয়ে যখন দ্বিতীয় চক্কর শেষ করছিল তখন দুশমনের বিমানের শব্দ আসতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে চারটি জেট বিমান আমাদের মাথার উপর চলে আসে। প্রায় বিশ মিনিট পর্যন্ত বোমা বর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু সমস্ত মুজাহিদ নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করেছিল। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে কারো কেশাগ্রও বাঁকা হয়নি। ক্যাম্পেরও কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ, ক্যাম্পের উপর কোন বোমা পতিত হয়নি। সমস্ত বোমা এদিক ওদিক পড়ে বিস্ফোরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

'বদরের পরিবেশ সৃষ্টি কর, তোমার সাহায্যে আকাশ থেকে আজও সারি সারি ফেরেশতা অবতরণ করবে।'

উরগুনের পরিস্থিতি

জেনেভা চুক্তির কারণে মুজাহিদদের পাকিস্তান গমনাগমনে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছিল। কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতও সহজসাধ্য মনে হচ্ছিল না। কারণ, তিনি ছিলেন রণাঙ্গনে। কিন্তু ১৯৮৮ ঈসায়ীর জুলাই মাসে সম্ভবত ঈদুল আযহার কয়েকদিন পূর্বে অকস্মাৎ আমি তাঁকে আমার অফিসে (দারুল উলূম) প্রবেশ করতে দেখে অবাক হয়ে যাই—তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন মুজাহিদ ছিলেন। মুখমণ্ডলে সেই মুচকি হাসি ও সজীবতা, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিতে সেই ভালবাসা ও বিনয় এবং সিপাহীসুলভ সেই গাম্ভীর্য বিরাজ করছিল। কয়েক ঘন্টার জন্য তিনি করাচী এসেছেন। কিছুক্ষণ পর রণাঙ্গনে ফিরে যাবেন—অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাতের অপূর্ব স্বাদ আজও আমার উপলব্ধি হয়। বিগত মাসগুলোতে যে সমস্ত সরঞ্জাম রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিলাম সে জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'সেগুলো দ্বারা আমাদের খুব উপকার হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'দুশমনের জামাখোলা চৌকির উপর আমাদের আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। এই চৌকি জয় করা ছাড়া উরগুন ছাউনীর উপর আক্রমণের কোন পথ নেই। বিধায়, বর্তমানে আমাদের সমস্ত আক্রমণ

এই চৌকির উপরই হচ্ছে। আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই চৌকি পুরোটাই ভূগর্ভস্থ। আমাদের গোলা, রকেট এবং মিসাইল দ্বারা তাদের জানমালের ক্ষতি তো অবশ্যই হচ্ছে এবং সেজন্য তারা সর্বদা সন্ত্রস্ত এবং তটস্ত থাকে কিন্তু এ রকম আক্রমণ দ্বারা আমরা চৌকি জয় করতে পারব না। চৌকি জয় করার জন্য ভিতরে প্রবেশ করে চূড়ান্ত আক্রমণ করতে হবে। জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানকার বিস্তৃত ভূমি মাইন, যা ঐ চৌকির চতুর্দিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিছানো রয়েছে। চৌকি পর্যন্ত পৌঁছার সম্ভাব্য সকল পথ এবং আশেপাশের সমস্ত নদীনালা, পাহাড়–টিলা এবং প্রান্তরকে দুশমন ভূমি মাইন দ্বারা ভরে রেখেছে। এর বিস্ফোরণে আমাদের বেশ কয়জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন এবং অনেকে মারাত্মক আহত হয়েছে পা ও অন্যান্য অঙ্গ হারিয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। বিশেষত চৌকি সংলগ্ন চারদিক তো মাইন পেঁচানো তারের পনের গজ চওড়া বেড়া রয়েছে। সেখানে পা ফেলার মত সুযোগও নেই। তবুও মাইনের এ স্তূপ ইনশাআল্লাহ বেশি দিন আমাদের পথ রোধ করতে পারবে না। সাথীদের অন্তহীন বাসনা—অনুমতি পেলে তারা এ অবস্থাতেই জান বাজি রেখে মাইনের সেই বেড়ার মধ্যে ঢুকে পড়বে। এভাবে কিছু সাথী তো অবশ্যই শহীদ হবে তবে এ বিশ্বাসও রয়েছে যে, তারপরও কিছু সাথী বেড়া অতিক্রম করে চৌকির ভিতর প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।'

তারপর কমাণ্ডার সাহেব কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলেন ঃ 'কিন্তু পাকতিকা প্রদেশের আফগান কমাণ্ডার মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেব তাঁর স্নেহাতিশয্যের কারণে এখনও আমাদেরকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দেননি। তবে দ্রুত প্রস্তুতির কাজ চলছে। উরগুন রণাঙ্গনে যতগুলো মুজাহিদ সংগঠনের ক্যাম্প রয়েছে, তাদের সবার সাথে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সমস্ত সংগঠন মিলে সম্মিলিত পরিকল্পনার অধীনে এই আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। জামাখোলা চৌকি জয় করার পর ইনশাআল্লাহ্‌ উরগুন ছাউনি জয় করা সহজ হয়ে যাবে।'

তিনি আরও বলেন, 'দুশমনও একথা জানে যে, তাদের উপর চূড়ান্ত আক্রমণ হবে, তাই তারা অতি সম্প্রতি একটি বিপজ্জনক চাল এই চেলেছে যে, তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে পাকিস্তানের সীমান্তের কতিপয়

স্বাধীন গোত্রের মধ্যে নগদ টাকা, ক্লাশিনকোভ এবং আরো অনেক অস্ত্র দিয়ে অনেক লোককে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দাড় করেছে। একদিন শত শত লোকের একটি বাহিনী দিনেদুপুরে সীমান্ত অতিক্রম করে উরগুনের দিকে যাত্রা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল উরগুন ছাউনীর সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করা। মাওলানা আরসালান খান রহমানী সাহেব বিষয়টি জানতে পারেন। তাঁর নির্দেশে মুজাহিদরা রাস্তায় মোর্চা তৈরী করে অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের সঙ্গে মুজাহিদদের লড়াই হয়। কমিউনিষ্টদের কয়েকজন এজেন্ট মারা যায় এবং দু' তিনজনেক আমরা বন্দী করি। আলহামদুলিল্লাহ, তাদের একজনও উরগুন পৌঁছতে পারেনি। এটি গোত্রীয় সমস্যা, যা মুজাহিদদের জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ। বর্তমানে আমরা তারও সমাধানের চেষ্টায় আছি।'

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব বললেন ঃ 'আমরা আরেকটি কাজ এই আরম্ভ করেছি যে, আমার সহকারী কমাণ্ডার মৌলবী আবদুর রহমান ফারুকীর নেতৃত্বে নির্বাচিত সাথীদেরকে জামাখোলা পোষ্টের একেবারে নিকটে গিয়ে পোষ্টের মানচিত্র তৈরী, মোর্চা খনন এবং মাইন পরিস্কারের কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্বে দুই একটি পথ মাইন মুক্ত করার সম্ভাব্য চেষ্টা চলছে। এ কাজ রাতের অন্ধকারে গোপনে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হয়। সাথীরা অত্যন্ত বিপজ্জনক এই কাজটি অত্যন্ত কষ্ট করে দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করে চলছে।

কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব আমার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ কালে সে সমস্ত সামান দেখে অত্যন্ত খুশী হন, যেগুলো আমরা রণাঙ্গনে পাঠানোর জন্য পরবর্তীতে সংগ্রহ করেছিলাম। তার মধ্যে সৈনিকদের বুট, হাতমোজা এবং জ্যাকেট ইত্যাদি ছিল। আমি তাকে বলি যে; ইনশাআল্লাহ দুই একদিনের মধ্যে আরো কিছু সামান সংগ্রহ হলে অতিসত্বর এগুলো আপনার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হবে।

জীপের নিকট পৌঁছে বিদায়ী মুসাফাহার সময় আমি তাঁর দুই হাত আঁকড়ে ধরে পুনরায় 'আয়াতুল কুরসীর আমলের' কথা স্মরণ করিয়ে দেই। তিনি আমল শেষ করে হাসিমুখে বলেন, 'আপনি আমাকে শহীদ হতে দিবেন না। শাহাদত তো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বাসনা।' তিনি নীরব রসনায় যেন একথা বলতে বলতে বিদায় গ্রহণ করেন—

جذبہ شوق شہادت ہے متاع زندگی
اس کا چرچا کارواں در کارواں کرتے چلو

'শাহাদাতের বাসনা এ জীবনের পুঁজি, তাই কাফেলার পর কাফেলায় এর গীত গেয়ে যাও।' (হযরত কায়ফী)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং আফগান জিহাদ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শহীদ জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক ১৯৭৭ ঈসায়ীর জুলাই মাসের পাঁচ তারিখে ক্ষমতায় আসেন। তার মাত্র এগার মাস পর ১৯৭৮ ঈসায়ীর এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে আফগানিস্তানে কমিউনিষ্ট নেতা নূর মুহাম্মাদ তারাকাই প্রেসিডেন্ট দাউদ খানকে হত্যা করে 'স্বাধীনতা বিপ্লব' নামে কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটায়। তার মাত্র দশ দিন পর আফগানিস্তানে জিহাদ আরম্ভ হয়। কমিউনিষ্ট বিপ্লবের রক্তাক্ত পাঞ্জা বসিয়ে দেওয়ার জন্য ১৯৭৯ ঈসায়ীর ডিসেম্বরের ২৭ তারিখে যখন রুশ বাহিনী আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে এবং বাবরাক কারমালকে প্রেসিডেন্টের গদিতে বসিয়ে দেয়, তখন এখানকার মুসলমানগণ 'বিজয় বা শাহাদাত' লাভের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই প্লাবনের মোকাবেলায় লিপ্ত হয়। আফগানিস্তানের প্রতিটি জনপদ এবং প্রতিটি গ্রাম আপাদমস্তক জিহাদের রূপ লাভ করে। মরহুম ভাইজানের ভাষায়—

وہی ہیں مرد جن پر یاس کے سائے نہیں پڑتے
وہ بڑھ کر تند طوفاں سے ٹکرایا ہی کرتے ہیں

'তারাই প্রকৃত বীরপুরুষ, যাদেরকে নৈরাশ্যের ছায়া স্পর্শ করতে পারে না। উপরন্তু তারা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়।'

আফগানিস্তানের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

'কাকের দখলে ঈগলের আবাস' এর ন্যায় এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ছিল সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। কারণ, আফগানিস্তান এমন একটি ভূখণ্ড, যেখানে পৌনে চৌদ্দশ' বছর ধরে মুসলমানদের শাসন ছায়া বিস্তার করে আসছিল। এখানে রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের এবং হযরত আবু রিফাআ আল আদাবী (রাযিঃ) নিজেদের পবিত্র জান বাজি রেখে ইসলামের প্রদীপ আলোকিত করেন। মহিমান্বিত তাবেঈ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এবং তাঁর গৌরবময় সহচরগণ ইসলামী বিধান প্রচার, প্রসার এবং প্রচলন করতে এবং ইসলামের ইনসাফপূর্ণ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

এখানেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট খাদেম হযরত সাফীনা (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

এই ভূখণ্ড মাকহুল, জাহহাক ইবনে মুযাহিম, আতা ইবনে আবিস সায়িব, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, আতা ইব্নে আবি মুসলিম খুরাসানী বালখী এবং সাঈদ ইবনে আবি সাঈদ আল মুকবিরী রহিমাহুমুল্লাহ এর ন্যায় মহিমান্বিত তাবেঈনদের জন্মভূমি হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেছে।

এখানেই ইমাম আবু দাঊদ সাজিস্তানী (সুনানে আবু দাঊদের সংকলক) আবু হাতেম ইবনে হিব্বান আল বাসতী, ইমাম বগভী এবং আল্লামা খাত্তাবী রহিমাহুমুল্লাহ এর ন্যায় হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

স্বর্ণ মানবপ্রসবা এই ভূখণ্ড হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম, হযরত হাতিম আসাম্ম এবং মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (মসনবী শরীফের গ্রন্থকার) এবং মাওলানা আবদুর রহমান জামী রহিমাহুমুল্লাহ এর মত মহান মুহাক্কিক সুফী এবং ওলীদেরকে জন্ম দিয়েছে।

এই ভূখণ্ডই আবু সুলাইমান আল জাউযুজানী এবং আবু জাফর আল হিন্দুওয়ানী রহিমাহুমুল্লাহ এর মত মুজতাহিদ ফকীহদের বাসস্থান।

এই ভূখণ্ড থেকেই হযরত মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের মত তাফসীরের ইমাম, আখফাশের মত সাহিত্য ও অভিধান বেত্তা, ফেরদৌসীর মত কবি, ইমাম রাযীর মত দার্শনিক ও কালাম শাস্ত্রের ইমাম এবং আবু রায়হান আল বিরুনীর মত বিজ্ঞানী আত্মপ্রকাশ করেন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন।

এই ভূখণ্ডের প্রত্যেকটি উঁচুনীচু ভূমিতে মাহমুদ গজনবী এবং আহমাদ শাহ আবদালীর বীরত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তির দাস্তান অংকিত

রয়েছে।[১]

প্রতিবেশী এই দেশের সমগ্র অধিবাসী (সাম্প্রতিক কালের উদ্ভূত কমিউনিষ্ট এবং ইসমাঈলী ফেরকা ছাড়া) ইসলাম কবুলের সূচনা থেকে বংশ পরম্পরায় মুসলমান। বর্তমানেও সেখানকার মুসলমানের সংখ্যা ৯৮% এর অধিক।

پاک اس اجڑے گلستاں کی نہ ہو کیونکر زمیں
خانقاہ عظمت اسلام ہے یہ سر زمیں

'ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের আবাস এ ভূখণ্ড। তার বিরান উদ্যানভূমি পাক না হয়ে কি পারে?'

কমিউনিজমের রক্তাক্ত আগ্রাসন

ইসলাম প্রদীপের পতঙ্গ ও নিবেদিতপ্রাণ মহান ব্যক্তিত্বদের গৌরবপূর্ণ এ ভূখণ্ডের উপর বর্তমানে বিশ্বের নিকৃষ্টতম কুফরী শক্তি কমিউনিজম তার রক্তাক্ত পাঞ্জা বসিয়ে দিচ্ছিল। সে তার অপাংতেয় শাসন ক্ষমতা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য জুলুম, নির্যাতন, হিংস্রতা, বর্বরতা, প্রতারণা ও ছলচাতুরীর যাবতীয় অস্ত্র ব্যবহার করছিল। সেই কমিউনিজম, যা আল্লাহরও দুশমন এবং মানবতারও দুশমন আফগানিস্তানে আগুন ও রক্তের বাজার উত্তপ্ত করছিল। নির্দয়ভাবে মুসলমানদের খুন প্রবাহিত করছিল। তাদের বাসস্থানসমূহকে রাশিয়ান ট্যাংক এবং বিমান ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছিল। সতী সাধ্বী নারীদের সম্ভ্রম লুট করা হচ্ছিল। পবিত্র কুরআনকে নাপাকীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এবং পদদলিত করা হচ্ছিল। মসজিদ, মাদরাসা এবং খানকাসমূহের উপর বুলডোজার চালানো হচ্ছিল।[২]

---

১. আফগানিস্তানের মহান ব্যক্তিত্বদের এ সমস্ত নাম শুধু নমুনা স্বরূপ এখানে তুলে ধরা হলো। অন্যথায় আফগানিস্তানের মহান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সংখ্যা এত বেশী যে, শুধুমাত্র তাদের নামের তালিকার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। বিস্তারিত জানার জন্য ড. মুহাম্মাদ আলী আল বার প্রণীত 'আফগানিস্তান মিনাল ফাতহিল ইসলামী ইলাল গাজবীর রুমী'—পৃষ্ঠা ৯০–১৩০ এবং পৃষ্ঠা ৩৪৫ থেকে শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা ৯৫৪।

২. কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর এ সমস্ত ঘটনা অধিক হারে ঘটছিল।

বৃদ্ধ নারী ও শিশুদের হৃদয় বিদারক আর্তনাদ এবং চিৎকারে প্রলয়ের অবস্থা বিরাজ করছিল। এমনতর বেদনা বিধুর পরিস্থিতিতে পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ মুসলিম উম্মাহকে আহবান করছিল—

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ، وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا -

অর্থ ঃ তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ রাহে লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান করো। এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।(সূরা আন-নিসা ৭৫ আয়াত)

পাকিস্তানের জন্য কঠিন পরীক্ষা

পবিত্র কুরআনের এই আহবান তো সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য ছিলই কিন্তু পাকিস্তান এবং ইরানের নাগরিক ছিল এর সর্বপ্রথম সম্বোধিত মুসলমান। কারণ, তাদের প্রতিবেশী আফগানিস্তানেরই মুসলমানদের উপর এই প্রলয় ঘটানো হচ্ছিল। পাকিস্তানের জন্য এটি আরো অধিক কঠিন পরীক্ষা এজন্য ছিল যে, এ অবস্থার প্রেক্ষিতে খোদ পাকিস্তানের নিরাপত্তা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়। কারণ, রুশ বাহিনী আফগানিস্তানকে পথের একটি মঞ্জিল মনে করে তাতে প্রবেশ করেছিল। রাশিয়ার আসল লক্ষ্য ছিল, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান এবং তার উন্মুক্ত সমুদ্র, যার মাধ্যমে সে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের খনি পর্যন্ত পৌঁছতে চাচ্ছিল।

এ অবস্থাতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক সাহেবের উপর যেই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা যেমনিভাবে তাঁর ঈমানের কঠিন পরীক্ষা ছিল, তেমনিভাবে তাঁর বীরত্ব, নির্ভীকতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টিরও কঠিন পরীক্ষা ছিল। তিনি এমন জটিল পরীক্ষার মুখোমুখী হন যে, রাশিয়ার মত পরাশক্তির

সঙ্গে তিনি সরাসরি লড়াইয়ের বিপদ ঘাড়ে নিলে পাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী দুশমন ভারতের মনোবাঞ্ছা পুরা হত। সে একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করে বসত। ফলে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান উভয়ই আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের রণক্ষেত্রে পরিণত হত। অপরদিকে নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকাও ঈমানী গায়রত, ইসলামী ফরীযা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিপন্থী কাজ হত। কারণ, আজ যদি মুসলিম আফগানিস্তানের উপর কুফরী শক্তি তথা রুশ বাহিনীর অবৈধ দখলদারিত্ব সহ্য করা হত তাহলে এর অর্থ এটিই দাঁড়াতো যে, আগামীকাল কমিউনিজমের এই তুফান পাকিস্তানে প্রবেশ করার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি থাকবে না।

বিধায়, অপবিত্রতার ভয়ংকর এই প্লাবনকে শুধুমাত্র ডুরাণ্ড লাইনে (পাক–আফগান সীমান্তে) বাধা প্রদান করাই যথেষ্ট ছিল না, বরং আফগানিস্তানের অপর প্রান্তেই তাকে প্রতিহত করে তার সম্মুখে শক্তিশালী বাঁধ সৃষ্টি করা ছিল জরুরী। এই শরয়ী ফরীযাকে এড়িয়ে যাওয়া ছিল জাতির আত্মহত্যারই নামান্তর—

فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

‘ব্যক্তির অপরাধ প্রকৃতি ক্ষমা করলেও
জাতির অপরাধকে সে কখনো ক্ষমা করে না।’

আফগান জিহাদে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভূমিকা

বিপজ্জনক এই দু’ পথের মুখে দাঁড়িয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ জিয়াউল হক সাহেব একটি মধ্যপথ উদ্ভাবন করেন। তিনি সেই মধ্যপথ ধরে অতি সাবধানে বীরবিক্রমে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এই পথ অবলম্বন করে তিনি বিশ্বকে বিশ্বযুদ্ধে আক্রান্ত না করেই মুজাহিদ এবং আফগান জিহাদের জন্য এমন বিশাল শক্তির যোগান দেন, যা লড়াইতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেও যোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না।

১. তিনি আফগান জিহাদের জন্য সমগ্র বিশ্বের বিশেষত মুসলিম বিশ্বের হৃদয়কে নাড়া দেন। তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে বুঝান যে, মুজাহিদগণ শুধুমাত্র

আফগানিস্তানেরই লড়াই করছে না, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের হয়ে তারা লড়াই করছে। এ পর্যায়ে তাদের প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকতা এবং পরিপূর্ণ সহযোগিতা না করা হলে কমিউনিজমের এই অপবিত্র প্লাবনকে মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছতে বাধা দেওয়া সম্ভবপর হবে না। এ উদ্দেশ্যে মরহুম প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ, ও.আই.সি এবং প্রত্যেক আন্তর্জাতিক সংগঠন ও ফোরামকে অত্যন্ত দক্ষতা ও আস্থার সাথে ব্যবহার করেন। তার কূটনৈতিক মাধ্যমসমূহকেও এ কাজে লাগিয়ে দেন। এভাবে তিনি মুজাহিদদের জন্য সমগ্র বিশ্বের সহমর্মিতা অর্জন করতে এবং রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে করতে সফল হন।

২. তিনি মুসলিম বিশ্ব ও অন্যান্য দেশের নিকট থেকে মুজাহিদদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করতে এবং তা মুজাহিদদের নিকট পৌঁছে দিতে অত্যন্ত তৎপর, সহমর্মী এবং ওজস্বী পন্থা অবলম্বন করেন। আমেরিকা শেষ পর্যন্তও তার তথাকথিত সাহায্যের বিনিময়ে প্রেসিডেন্ট জিয়ার দ্বারা এমন কোন ফয়সালা করাতে পারেনি, যা পবিত্র এ জিহাদের পরিপন্থী হতে পারে। এমনকি মরহুম প্রেসিডেন্ট এবং তার বিশিষ্ট বন্ধু আই.এস.আই. এর তৎকালীন প্রধান শহীদ জেনারেল আখতার আবদুর রহমান আমেরিকাকে তার পূর্ণ চেষ্টা সত্ত্বেও মুজাহিদদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখার অনুমতি প্রদান করেননি। যেন আমেরিকান সি.আই.এ তার এজেন্টদের আফগানিস্তানে প্রবেশ করাতে সফল না হয় এবং মুজাহিদদেরকে ব্লাকমেইল করতে সক্ষম না হয়।

৩. তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে আগমনকারী স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পাকিস্তানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। সুতরাং আফগান ভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চি জায়গাকে আযাদ করার জন্য মুজাহিদরা তাদের খুনের যেই নজরানা পেশ করেছেন, তার মধ্যে সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, জর্দান, ইরাক, তুরস্ক, ফিলিস্তিন, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, পাকিস্তান, ইরান, বাংলাদেশ, বার্মা, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন এবং অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্তের মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকদের খুন শামিল রয়েছে। বিশেষত আরবদের ঐতিহ্যবাহী বীরত্বের উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী উপাখ্যান তো আফগানিস্তানের প্রতিটি শিশুর মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে।

৪. আফগান মুজাহিদদের সংগঠনসমূহের মধ্যে প্রথম দিকে তীব্র

মতবিরোধ এবং বিশৃংখলা ছিল। ঠিক যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, এক সংগঠন বা এক গোত্র অন্য সংগঠন বা অন্য গোত্রের উপর আক্রমণ করে বসেছে। মুজাহিদদের এই গৃহযুদ্ধ এই জিহাদকে মাঠে মেরে ফেলতে পারত। জিয়াউল হক সাহেব, শহীদ জেনারেল আখতার আবদুর রহমান এবং তাদের নিষ্ঠাবান সঙ্গীদের কৃতিত্ব যে, তারা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে বিরোধপূর্ণ এ সমস্ত দল ও সংগঠনকে এক দেহ ও এক প্রাণ করতে সফল হয়েছেন। তাদের ছেষ্টায় ছোট ছোট সংগঠন বড় বড় দলের মধ্যে একীভূত হয়ে যায়। বড় বড় সাত দলের সমন্বয়ে সাত দলীয় ঐক্যজোট নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন অস্তিত্ব লাভ করে। তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে আফগানিস্তানের একটি প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। সর্বসম্মতিক্রমে ইঞ্জিনিয়ার আহমাদ শাহকে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং জেনারেল আখতার আবদুর রহমান শাহাদাত লাভ করা পর্যন্ত এ সমস্ত সংগঠনের মধ্যে আর কোনরূপ বিশৃংখলা দেখা যায়নি। অতীতের পারস্পরিক মনঃকষ্ট চাপা পড়ে যায়।

৫. তিনি এবং শহীদ জেনারেল আখতার আবদুর রহমান আফগান মুজাহিদদের ভাই এবং তাদের দুঃখকষ্টের সঙ্গী তো ছিলেনই উপরোক্ত এ জিহাদে তারা মুজাহিদদের নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা এবং পথপ্রদর্শকও ছিলেন। তারা সিপাহী, সিপাহী তৈরীকারী এবং সিপাহসালারও ছিলেন। তাদের পরামর্শ দ্বারা আফগান নেতারা অনেক উপকৃত হতে থাকেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের বড় ছেলে জনাব এজাযুল হক আমাকে বলেছেন যে, আফগান নেতারা তাকে বলেছেন—আমরা প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেবের নিকট অনেক সময় রাত চারটা পর্যন্ত বসে থাকতাম। আফগানিস্তানের মানচিত্র আমাদের সম্মুখে থাকতো। তিনি তার সাহায্যে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরামর্শ প্রদান করতেন।

৬. মুজাহিদদের জন্য অত্যাধিক জটিল সমস্যা ছিল তাদের সন্তান সন্ততির হেফাজত এবং পরিবার বিচ্ছিন্ন লক্ষ লক্ষ মুহাজিরদের আশ্রয়স্থলের, যারা কমিউনিষ্টদের বর্বরতার লক্ষ্যবস্তু হয়ে পাকিস্তান অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছিল। শহীদ জিয়াউল হক মুজাহিদদেরকে এ ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত করে দেন। তিনি আফগান মুহাজিরদের জন্য

পাকিস্তানের দরজা সদা উন্মুক্ত করে দেন। তিনি তাদেরকে শুধু আশ্রয়ই দেননি বরং এ কথা বুঝতেও দেননি যে, তারা ভিন্ন কোন দেশে এসেছে। তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় তাদের জন্য ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে সব ধরনের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের ব্যবস্থা করে দেন। ঐ সমস্ত ক্যাম্প দেখতে দেখতে বিশেষ শহর ও জনপদের রূপ পরিগ্রহ করে। পেশোওয়ারের অদূরে 'পাকী' রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে এমনি একটি শহর আমিও দেখেছি। আমাকে সেই শহরের একটি বৈশিষ্ট্য এই বলা হয় যে, এখানে বিনামূল্যে বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়েছে। মুহাজিরদের অন্যান্য বস্তিতেও সম্ভবত এমনিই করা হয়েছে। এটি এমন একটি সুবিধা, যা কোন পাকিস্তানীও লাভ করেনি। এ সমস্ত সুবিধা প্রদান করার পরও মুহাজিরদের উপর এরূপ কোন বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়নি যে, তাদেরকে ঐ ক্যাম্পের মধ্যেই থাকতে হবে। বরং তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, তারা পাকিস্তানীদের মত যে শহরে ইচ্ছা অবস্থান করবে। চাকুরী, মজদুরী এবং ব্যবসা বাণিজ্য করবে।[১]

৭. তিনি আফগানিস্তানের সীমান্তে গমনকারী অনেকগুলো দুর্গম কাঁচা পাহাড়ী পথ পাকা করেছেন। এতে করে একদিকে যেমন স্থানীয় অধিবাসীদের সমস্যা দূর হয়েছে, অপরদিকে মুহাজির ও মুজাহিদদের যাতায়াতও সুগম হয়েছে।

৮. তিনি আহত মুজাহিদ ও মুহাজিরদের মানসম্পন্ন চিকিৎসা এবং পঙ্গু ও অথর্বদেরকে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের জন্য কতক মুসলিম দেশের সহযোগিতায় পাকিস্তান সীমান্তের অদূরে কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেগুলো নিপীড়িত এই মুসলমানদের জন্য অপ্রত্যাশিত নেয়ামত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

---

১. তবে এই স্বাধীনতা প্রদান করায় একদিকে যেমন নিপীড়িত মুহাজিররা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে, অপরদিকে কমিউনিষ্ট কাবুল সরকারের গোপন সন্ত্রাসী সংগঠন 'খাদ' এর দ্বারা পরিপূর্ণ ফায়দা লুটেছে। রাশিয়া থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসীরা মুহাজিরদের বেশ ধরে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তারা সন্ত্রাস, মাদক ব্যবসা ও ধ্বংসাত্মক কোন কাজের কোন সুযোগই হাতছাড়া করেনি। ফলে পাকিস্তানের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে এ সমস্ত এজেন্টরা একদিকে তো পাকিস্তানের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছে, অপরদিকে নিপীড়িত আফগান মুহাজিরদেরও বদনাম করেছে। —রফী উসমানী

৯. তিনি প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আফগান ভাইদের পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাদের সাহস বৃদ্ধি করেছেন। তাদেরকে উপরে রেখেছেন। তাদেরকে উত্তমভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তারা এ জিহাদে নির্বান্ধব নয়। পাকিস্তান এবং এখানকার জনসাধারণ তাদের দুঃখ, দুর্দশার সর্বাধিক অংশীদার।

এতো ছিল আফগান জিহাদের ব্যাপারে শহীদ জিয়া ও তাঁর সঙ্গীদের সেই সব কীর্তির বিবরণ যেগুলো উপস্থিত মুহূর্তে আমার কলম থেকে বের হল এবং যেগুলোর ব্যাপারে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত রয়েছে, যে এ জিহাদের ব্যাপারে আন্তরিকতা রাখে এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত রয়েছে। এমন আরো অনেক কৃতিত্ব রয়েছে, যা আমার জানা নেই এবং রহস্যাবৃত অনেক কৃতিত্ব তো এমনও হয় তো রয়েছে, যা কোনদিনই ঐতিহাসিকদের নিকট পৌছবে না। মোটকথা, মরহুম ভাইজানের ভাষায়—

کاروان شوق ہر منزل سے آگے بڑھ گیا
میری ہر منزل غبار رہ گذر ہوتی گئی

'প্রেমের কাফেলা প্রত্যেক মঞ্জিল অতিক্রম করে গেছে।
আমার প্রত্যেক মঞ্জিল পথের ধূলিতে পরিণত হয়েছে।'

কারো চোখের তারা আর কারো চোখের কাঁটা

সুদৃঢ় ঈমান এবং সুচিন্তিত দূরদর্শিতাপূর্ণ এই অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার বদৌলতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও আফগান জিহাদের প্রতীকরূপে বিকশিত হন। তিনি খোদ পাকিস্তানের জন্যও মুসলিম উম্মাহের সহমর্মিতা ও আর্থিক সহযোগিতা অর্জনে সফল হন। ফলে মুসলিম বিশ্বে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং আফগান সীমান্ত সংলগ্ন পাকিস্তানী অঞ্চলসমূহ যথা ঃ সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে কয়েকটি দেশের বিত্তশালী মুসলমান ও সংগঠনসমূহ মন খুলে উন্নয়নমূলক ও সমাজসেবামূলক কাজে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সহযোগিতা দান করে। এভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর নির্ভীক দুঃসাহসিক ও মুজাহিদসুলভ কৃতিত্বের বদৌলতে মুসলিম বিশ্বের চোখের তারায় পরিণত হন।

جنہیں آتا ہے مرنا اپنی عزت اور اصولوں پر
وہ اپنی برتری دنیا سے منوایا ہی کرتے ہیں

'যারা স্বীয় মর্যাদা ও নীতির জন্য প্রাণ বিসর্জন করতে পারে, তারা বিশ্ববাসীর নিকট থেকে নিজেদের বড়ত্বের স্বীকৃতি আদায় করেই ছাড়ে।' (হযরত কাইফী)

আফগান জিহাদ সফলতার সোপান যতই অতিক্রম করছিল, রাশিয়া তার রাজনৈতিক ও সামরিক মৃত্যু ততই সন্নিকটে দেখতে পাচ্ছিল। ভারতের অস্থিরতাও সেই হারে বেড়ে চলছিল। আফসোস রাশিয়ার সহমর্মিতায় লিবিয়াও এগিয়ে ছিল। এসব শক্তি আফগান জিহাদকে কলঙ্কিত করতে যেই পরিমাণ শক্তি ব্যয় করেছে, ঠিক ঐ পরিমাণ শক্তি পাকিস্তান ও মরহুম প্রেসিডেন্টের দুর্নাম রটাতেও ব্যয় করেছে। পাকিস্তানকে নানা প্রকারের আভ্যন্তরিণ ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের লক্ষবস্তু বানানো হয়। পি.আই.এ. এর বিমান অপহরণ করানো হয়। পাকিস্তানের বড় বড় শহরে বোমা বিস্ফোরণ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং শহীদ জিয়াউল হকের বিমানের উপর কয়েকবার আক্রমণ করা হয়। রাশিয়ান ও ভারতীয় লবি মরহুম প্রেসিডেন্টকে তাদের অপপ্রচারের লক্ষ্য বানিয়ে দেশের নাগরিকদেরকে আফগান জিহাদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে এবং রাশিয়ার ক্রোধের ভীতি প্রদর্শন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু শহীদ জিয়ার দৃঢ়পদতায় কোনরূপ ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি। তিনি সর্বদা পাথরের মত অবিচল ও পুষ্পের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল থেকেছেন।

তিনি বড় বড় কাজ নিতান্ত নীরবভাবে করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তার ক্রেডিট লাভের উন্মত্ততা ছিল না। আফগান জিহাদের ব্যাপারে সাধারণ জনসমক্ষে খুব কম কথাই বলতেন। কিন্তু যখন দুশমনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কারণে জনসাধারণের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হতে থাকে, তখন তাঁর ভালবাসাপূর্ণ, আস্থাপূর্ণ এবং আবেগ ও উদ্দীপনাময় এই কণ্ঠস্বর শোনা যায়—

'এটি আমাদেরকে আফগান পলিসির মূল্য দিতে হচ্ছে। বিভিন্ন জাতিকে উচ্চ লক্ষ্য অর্জনে এর চেয়ে অধিক কুরবানী করতে হয়। এ জাতীয় অপতৎপরতার মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের মূলনীতি থেকে হটানো যাবে না।'

এই আহবানের গুঞ্জরণ পাকিস্তানের দৃঢ় বিশ্বাসী জনসাধারণের ঈমানপূর্ণ হৃদয়ের স্পন্দনে শ্রুতিগোচর হয় এবং দুশমন লবির বিছানো যাবতীয় জাল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। এতে জনসাধারণের এই সংকল্প পুনরায় জীবন্ত হয়ে ওঠে—

یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کا سامان لاکھ کریں
ہم بزم سجانے آئے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے

'অনিষ্ট ও অকল্যাণ দ্বারা প্রতিপালিত এই কাপালিকরা যতই ধ্বংস কার্যের উপকরণ, উপাদান প্রস্তুত করুক না কেন, আমরা আসর সাজাতে এসেছি। আমরা আসর সাজিয়েই নিরস্ত হব।' (হযরত কাইফী)

আমেরিকা রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বীয় রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে মুজাহিদদেরকে সাহায্য প্রদান করতে বাধ্য ছিল এবং এজন্য জিয়াউল হক সাহেবকে খুশী রাখতেও সে ছিল মজবুর। পরবর্তীতে আফগানিস্তানের চোরাবালু থেকে রাশিয়া তার বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই আমেরিকা একদিনও নষ্ট না করে তার দ্বারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চুক্তি করায়। যেন এই জিহাদের যাবতীয় ফল নিজেরা ভোগ করার জন্য মুজাহিদদের সরকার গঠনে বাধা দেওয়া যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বেঁচে থাকতে পাকিস্তানের পথে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা করানো সম্ভব ছিল না। ফলে এখন শহীদ জিয়ার অস্তিত্ব আমেরিকার চোখে মারাত্মকভাবে বিঁধতে থাকে।

জিহাদের আন্তর্জাতিক প্রভাব ও দুশমনের আশঙ্কা

ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহ তীব্রভাবে অনুভব করছিল যে, আফগান জিহাদ সফল হলে এবং সমগ্র আফগানিস্তানে মুজাহিদদের ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হলে—

১. পাকিস্তান ও আফগানিস্তান একপ্রাণ দুই দেহ হয়ে মুসলিম বিশ্বের এমন এক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, যার উপর দুশমন শক্তিসমূহ চাপ প্রয়োগ করতে সক্ষব হবে না, বরং ইরান ও তুরস্কও যদি তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায় তাহলে শক্তিশালী ইসলামী ব্লকের গোড়াপত্তনও হতে পারে।

২. যেই মুসলিম বিশ্ব জিহাদের শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে বড় বড়

শক্তিসমূহের সম্মুখে ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে জীবন যাপন করছে, সেই মুসলিম বিশ্ব বিস্মৃত সেই শিক্ষার বিস্ময়কর প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করায় তার মধ্যে আত্মনির্ভরতা জন্ম নেবে, সাহস উঁচু হবে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রকৃত আযাদীর তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হবে।

৩. আফগান জিহাদের ফলে রাশিয়ার অধিকৃত ইসলামী রাজ্যসমূহে আযাদীর যে লহর তরঙ্গায়িত হচ্ছে, তা দাসত্বের নিগড় খুলে ফেলবে। ফলে মুসলিম বিশ্ব অপরাজেয় হয়ে উঠবে।

৪. ফিলিস্তিনের যেই জিহাদ আরব জাতীয়তাবাদের পদতলে বলি হয়েছিল, এখন তা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিজয়ী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। বিশ্বের মুসলমানগণ তাদের প্রথম কেবলাকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে আফগান মুজাহিদদের পদচিহ্ন ধরে চলতে আরম্ভ করবে।

৫. এই জিহাদ পাকিস্তান বিরোধী পাখতুনিস্তানের যে সমস্যাকে চাপা দিয়ে রেখেছে, তা চিরতরে সমাহিত হবে।

৬. কাশ্মীরের মুসলমানরাও আফগান মুজাহিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবে এবং হিন্দুদের দাসত্বের নিকৃষ্ট বেড়িকে স্বীয় গ্রীবা থেকে খুলে নিক্ষেপ করার জন্য দেহ, মন ও ধনের বাজী লাগাবে।

৭. জিয়াউল হক এ যুগের সর্বাধিক গ্রহণীয় ও সফল মুসলিম শাসক প্রমাণিত হবে। মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিসমূহ ও মৌলিক উপাদানসমূহ তার চতুর্পার্শ্বে সমবেত হবে। তাকে এটম বোম তৈরী করতে বিশ্বের কোন শক্তি বাধ সাধতে পারবে না। এমনিভাবে ইসলামের ন্যায়নিষ্ঠাপূর্ণ সহজাত জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পথেও আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় কোন শক্তিই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না।

৮. পরাশক্তিসমূহের ভীতি, প্রভাব ও মর্যাদা নিঃশেষ হতে থাকবে। যে সমস্ত নিপীড়িত জাতি ও দেশ তাদের নির্যাতনের পাঞ্জায় কিংবা প্রতারণাপূর্ণ ফাঁদে বন্দী হয়ে আছে, তারাও দাসত্বের এ জোয়াল স্বীয় কাঁধ থেকে দূরে নিক্ষেপ করবে।

৯. জিহাদের একটি বৈশিষ্ট্য—যার সম্পর্কে ইতিহাসের মাধ্যমে দুশমন শক্তিসমূহ খুব ভাল করেই অবগত আছে—এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যখন মুক্তি ও জিহাদের স্পৃহা জন্ম নেয়, তখন তাদের পারস্পরিক মত

দ্বৈততা ও সকল অভিযোগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এসব পরাশক্তি সমগ্র বিশ্বে তাদের মোড়লীপনা টিকিয়ে রাখতে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যকে সর্ববৃহৎ বিপদ মনে করে থাকে। তারা এ বিপদের ব্যাপারে এত অনুভূতি পরায়ণ যে, এর ক্ষীণতম ছায়াও যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনে দৃষ্টিগোচর হতে আরম্ভ করে তাহলে তার পথ রোধের জন্য মারাত্মক থেকে মারাত্মক ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হতেও তারা সামান্যতম দ্বিধাবোধ করে না। আফগান জিহাদের আড়ালে 'সর্বাধিক এই বড় বিপদটি' তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল—

جہان نو ہو رہا ہے پیدا ' وہ عالم پیر مر رہا ہے
جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ

'নতুন জগত জন্ম নিচ্ছে, আর সেই বৃদ্ধ জগত বিলোপ হচ্ছে,
ফিরিঙ্গি জুয়ারুরা যাকে জুয়াখানায় পরিণত করেছে।'

'নতুন জগত' এর এই সম্ভাবনা—যারদিকে মজলুম মানবতা বিশেষত মুসলিম বিশ্বের আশাপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—আশার এমন এক প্রদীপ, আফগান জিহাদের পনের লাখ শহীদ স্বীয় খুন দ্বারা যেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। কিন্তু মানবতার দুশমন শক্তিসমূহ এই সম্ভাবনার মূল শিকড় আফগান জিহাদকে তার স্বাভাবিক ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দিতে ছিল বদ্ধপরিকর।

সম্মিলিত এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রথম ধাপরূপে তারা একটি সফলতা অর্জন করেছিল পাকিস্তানের উপর জেনেভা চুক্তি চাপিয়ে দিয়ে। কিন্তু তাদের অধিক অগ্রাভিযানের পথে একদিকে মুজাহিদদের লৌহ দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতা বাধা ছিল, অপরদিকে বড় একটি ওজনী পাথর ছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হকের দৃঢ় সংকল্পী ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব। যাকে না হটিয়ে পাকিস্তানের পথে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার তৎপরতা চালানো সম্ভব ছিল না। বরং মরহুম প্রেসিডেন্ট যখন ১৯৮৮ এর ২৯শে মে তাবেদার সরকারকে বরখাস্ত করেন, তখন পশ্চিমা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ ইঙ্গিতে এ আশংকাও প্রকাশ করেছিল যে, এখন প্রেসিডেন্ট জিয়া যে কোন সময় জেনেভা চুক্তি বাতিলের ঘোষণাও দিতে পারে।

রক্তাক্ত নাটকের প্রস্তুতি

আফগানিস্তানের জিহাদকে অপহরণ করতে এবং পাকিস্তানকে তার বুনিয়াদী মতাদর্শ 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' এবং 'ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা' থেকে হটানোর উদ্দেশ্যে ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহের এখন সর্বপ্রথম মরহুম প্রেসিডেন্টের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে পাকিস্তানে 'গণতন্ত্রের' চাতুরীপূর্ণ নামের উপর এমন দুর্বল ও রুগ্ন সরকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল, যা তাদের মদদপুষ্ট হয়ে তাদের দয়া ও অনুকম্পার উপর টিকে থাকবে এবং তাদের ইঙ্গিতে ওঠাবসা করবে। সুতরাং ভারতীয়, রাশিয়ান ও পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমসমূহ ১৯৮৮ ঈসায়ীর মে মাসের পর থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে বিষোদগারে অধিকতর তৎপর হয়ে ওঠে। পাকিস্তানে তাদের লবিসমূহও আরও অধিক তৎপর হয়।

একদিকে ইসলামের দুশমন শক্তিসমূহ এবং তাদের লবিসমূহ পরিপূর্ণ নীল নকশার সাথে এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, অপরদিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের সেই দল, যারা শুধুমাত্র নেতিবাচক এবং স্বার্থসর্বস্ব কিংবা নির্বোধমূলক রাজনীতির ব্যাধিতে আক্রান্ত, তারা বিশ্বপরিস্থিতি এবং ইসলামের আবেদন থেকে চোখ কান বন্ধ রেখে তাদের সুরে সুর মিলাচ্ছিল। যেই আগষ্টের (১৯৮৮ ঈসায়ী) ১৭ তারিখে মরহুম প্রেসিডেন্টের শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে, তার ১৬ তারিখ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ধমকি ও অপবাদের এই তৎপরতা শীর্ষে পৌঁছে যায়। ভেতর ও বাইরের প্রোপাগাণ্ডার সুসংহত পরিস্থিতি ইঙ্গিত করছিল যে, কোন ভয়ঙ্কর নাটকের মঞ্চ তৈরী করা হচ্ছে। এতে পাকিস্তানের কয়েকজন এমন অপরিণামদর্শী তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাও শামিল ছিল, যারা সম্ভবত নিজেরাও জানত না যে, তারা কেমন এক রক্তাক্ত নাটকের প্রস্তুতিতে অংশ নিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের শাহাদাত

অবশেষে মরহুম প্রেসিডেন্টকে তাঁর যোগ্যতর সঙ্গীদের সহ একটি রহস্যপূর্ণ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অকস্মাৎ এমনভাবে শহীদ করা হয় যে, সমগ্র বিশ্ব হতভম্ব এবং সমগ্র মুসলিম জগত বিমূঢ় হয়ে যায়। কোটি কোটি মুসলমানের অন্তর অস্থির, যবান মূক এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জমাট

বেঁধে যায়। মরহুম প্রেসিডেন্ট ১৪০৯ হিজরীর ৩রা মুহাররম মোতাবেক ১৯৮৮ ঈসায়ীর ১৭ই আগষ্ট বুধবার সকালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সি-১৩০ বিমানে ভাহ্ওয়ালপুর গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সেনা ইউনিটসমূহ পরিদর্শন এবং নতুন আমেরিকান ট্যাঙ্কের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেন। যোহর নামায জামা'আতের সাথে আদায় করেন। বেলা তৃতীয় প্রহরে ৩টা ৪৬ মিনিটে সেই বিমানটি যখন তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ভাহ্ওয়ালপুর বিমান বন্দর থেকে ইসলামাবাদ প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে আকাশে উড্ডয়ন করে, তার ৫ মিনিট পরেই বিমানবন্দর থেকে মাত্র ৮ মাইল দূরে ভূপাতিত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। বিমানের ত্রিশ জন আরোহীর একজনও বাঁচতে পারেনি।

বেদনাবিধুর এই দুর্ঘটনায় মরহুম প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার ডান হাত, জয়েন্ট চীফ অব ষ্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল আখতার আবদুর রহমান—যিনি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আই.এস.আই এর প্রধান হিসেবে আফগান জিহাদের প্রাণ ছিলেন—এবং চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহাম্মাদ আফজালও শহীদ হন। সাথে সাথে বিমানের কর্মচারীদের সকল সদস্যসহ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তিনজন মেজর জেনারেল, পাঁচজন ব্রিগেডিয়ার, একজন স্কোয়াডন লীডার এবং একজন সহকারী প্রাদেশিক গভর্নরও শহীদ হন। তাদের মধ্যে শহীদ প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারী ব্রিগেডিয়ার জনাব সিদ্দিক সালেক, মিলিটারী সেক্রেটারী ব্রিগেডিয়ার জনাব নজীব আহমাদ এবং প্রেসিডেন্টের এ.ডি.সি স্কোয়াডন লীডার জনাব রাহাত মাজীদ সিদ্দিকীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিমানের প্রায় প্রতিটি জিনিস জ্বলে যায়। কিন্তু পবিত্র কুরআনের যেই কপিটি মরহুম প্রেসিডেন্টের সফরকালে সঙ্গে থাকত এবং দু'একটি কিতাব—যা এই সফরে তার সঙ্গে ছিল, অক্ষত রয়ে যায়। [১]

মোটকথা জাতির খ্যাতিমান এই সন্তান এবং পাকিস্তানের বীর সেনাবাহিনীর গৌরবপূর্ণ এই সদস্য—যিনি তাঁর দূরদর্শী সিপাহসালার সহ সকলেই ইউনিফর্ম সজ্জিত ছিলেন—জিহাদেরই ধারাবাহিকতায় এই পুণ্যময় সফরে শাহাদাতের চিরজীবন লাভ করেন।

---

১. দৈনিক জং, করাচী ২৭শে আগষ্ট ১৯৮৮ ঈসায়ী, পৃঃ ১, কলাম ৩

دیوانے گذر جائیں گے ہر منزل غم سے
حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا
آتی ہی رہے گی ترے انفاس کی خوشبو
گلشن تری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا

'প্রেমিকগণ! বেদনার সকল মঞ্জিল অতিক্রম করে যাবে,
যুগের আবর্তন বিমূঢ় হয়ে তাদের দিকে শুধু তাকিয়েই থাকবে।
তোমার শ্বাস প্রশ্বাসের সুগন্ধি সর্বদা আসতেই থাকবে,
তোমার স্মৃতিময় উদ্যান মোহিত হতেই থাকবে।'

ইংরেজী ভাষার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক মাসিক পত্রিকা 'রিডার্স ডাইজেস্ট'–এ একটি গবেষণামূলক রিপোর্ট ছাপানো হয়েছে। তাতে পত্রিকার প্রতিনিধি জোহান বিরন্‌স্‌ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পশ্চাতে কার্যকর ষড়যন্ত্রটি আবিস্কারের চেষ্টা করেছেন। বাহ্যত তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। এই রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সাপ্তাহিক 'তাকবীর' করাচী (১১ই জানুয়ারী ১৯৯০ ঈসায়ী তারিখে) প্রকাশিত হয়।

শহীদ জেনারেল আখতার আবদুর রহমান

এখানে সেই রিপোর্টের একটি অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তাতে অনুমান করা যাবে যে, আফগানিস্তানের জিহাদের আলোকে জেনারেল আখতার আবদুর রহমানের ব্যক্তিত্ব কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে তাকেও রাস্তা থেকে হটানোর জন্য এই প্রাণ সংহারক সফরে তাকে কিভাবে শামিল করা হয়। জোহান বিরন্‌স্‌ লেখেন—

'জেনারেল আখতার আবদুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের স্থলাভিষিক্ত বলা হত। আফগান পরিস্থিতি, সামরিক স্ট্রাটেজি এবং সেখানকার লড়াই সম্পর্কে জেনারেল জিয়া এবং আখতার আবদুর রহমান থেকে অধিক আর কেউ বুঝত না। জেনারেল জিয়াউল হক একটি প্রাইভেট বৈঠকে একবার অশ্রুভেজা চোখে ১৯৮৮ ঈসায়ীর জুলাই মাসে জেনারেল আখতারকে বলেছিলেন—'আপনি একটি 'মো'জেযা' করে

দেখিয়েছেন।' [১]

আমি আপনার এই কৃতিত্বের পুরস্কার দিতে অক্ষম। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতই আপনাকে এর বিনিময় দান করবেন।'

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জেনারেল জিয়াউল হক এবং জেনারেল আখতার আবদুর রহমান একটি মোজেযার ন্যায়ই আফগানিস্তানে রাশিয়ান বাহিনীকে পরাজিত করে দেখিয়েছেন এবং রাশিয়াকে এ লড়াই থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে এই দুই ব্যক্তিত্বকে রাস্তা থেকে হটানো ছিল নিতান্তই জরুরী।

১৯৭৯ তে আফগানিস্তানে রাশিয়ার নগ্ন আগ্রাসনের পর জেনারেল জিয়া, জেনারেল আখতারকে নির্দেশ দেন যে, এ লড়াইকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিহত করতে হবে। সিক্রেট ক্যাম্প কায়েম করতে হবে। গোপন সাপ্লাই লাইনের জাল বিছাতে হবে। মুজাহিদদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খুলতে হবে এবং ধন, প্রাণ ও দেহের বাজি রেখে যে কোন মূল্যে রুশ বাহিনীর মোকাবেলা করতে হবে। আফগানিস্তানের সাত দলীয় ঐক্যজোটকে অধিক থেকে অধিকতর সুদৃঢ় করতে হবে এবং গেরিলা পথে প্রতিরোধকারী (মুজাহিদ) দলসমূহের সর্বোতভাবে সাহায্য করতে হবে। আমেরিকার সাপ্লাই লাইনে অস্ত্র যোগানকে অবিলম্বে একটি সুসংহত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত করা হয়। জেনারেল আখতার তার অসাধারণ প্রতিভা খাটিয়ে মুজাহিদদের লড়াইকে একটি বড় ধরনের আক্রমণাত্মক শক্তিতে পরিণত করেন। ফলে রাশিয়ানদেরকে এ লড়াইয়ে মারাত্মকভাবে জবাই হতে থাকে।

জোহান বিরন্‌স্ পরবর্তী তিন চারটি প্যারার পর লেখেন—

'জেনারেল আখতারের (ভাহওয়ালপুরে অনুষ্ঠিত আমেরিকান ট্যাংকের) এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের কোন প্রোগ্রাম ছিল না। কিন্তু ১৬ই আগষ্ট তার এক সহকারী তাকে এমন কিছু বিস্ময়কর কথা শোনায়, যেগুলো প্রেসিডেন্ট জিয়াকে জানানো জরুরী ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়ার

---

১. আমি এখানে উদ্ধৃত অংশসমূহ বর্ণনা করছি বিধায় এ (মো'জেযা) শব্দটিও বর্ণনা করতে হল। অন্যথায় মো'জেযা শব্দটি শরীয়তের একটি পরিভাষা, যা শুধুমাত্র সেই অস্বাভাবিক, অলৌকিক, বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যা আল্লাহ তাআলার কুদরতে কোন নবীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নবী ছাড়া অন্যের হাতে কোন আশ্চর্য ঘটনা দেখা দিলে তা যতই বিস্ময়কর এবং যত বড়ই কৃতিত্বপূর্ণ হোক না কেন তাকে মো'জেযা বলা দুরস্ত নয়। (রফী উসমানী)

সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলা হলে তিনি জেনারেল আখতারকে তার সঙ্গে সফর করার দাওয়াত দেন। এবং বলেন যে, সফরের মধ্যে তোমার সঙ্গে এসব বিষয়েও কথা হবে। সুতরাং প্রেসিডেন্টের বিমানে জেনারেল আখতারের ভ্রমণও চূড়ান্ত হয়ে যায়।

রাশিয়ার ধমকি এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং জেনারেল আখতার আবদুর রহমান আফগান জিহাদের ব্যাপারে যেই কৃতিত্ব সম্পাদন করেছেন, সেগুলোর সংক্ষেপে বর্ণনা করার পর জোহান বিরন্‌স্ লেখেন—

'জিয়াকে মুজাহিদদের সহযোগিতা করা থেকে বাধা দেওয়ার জন্য রাশিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের এক ধারাবাহিক তৎপরতা আরম্ভ করে। রুশ সরকারের কর্মীরা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরের জায়গায় জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটায়। 'খাদের' সুপরিকল্পিত এসব আক্রমণে শুধুমাত্র ১৯৮৭ ঈসায়ীতে ২৩৪ জন নিরপরাধ নাগরিক নিহত এবং ১২ শ'র অধিক আহত হয়। সমগ্র বিশ্বে (এই সময়কালে) সন্ত্রাসের মাধ্যমে হতাহতের পরিমাণের এ ছিল প্রায় অর্ধেক।

জিয়াকে ঝুকানো সম্ভব হয়নি। মুজাহিদদের নিকট অস্ত্র সাপ্লাই বহাল থাকে। মুজাহিদদের বিজয় দ্বিগুণ, চারগুণ হতে থাকে। অবশেষে গর্বাচেভ তার সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। (জোহান বিরন্‌স্ তারপর লেখেন ঃ) রাশিয়া উত্তেজিত হয়ে পাকিস্তান এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিরুদ্ধে তার লুকানো ধমকিকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে এবং তা আরও জোরালো করে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিকট এসব ধমকিকে সত্য মনে করার কয়েকটি কারণ ছিল। ১৯৮১ ঈসায়ীর পর থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপর কমপক্ষে চারবার নাশকতামূলক আক্রমণ করা হয়। ১৯৮৮ ঈসায়ীর গ্রীষ্মকালে রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপর পুনরায় একটি পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ চালানো হয়, যা ব্যর্থ হয়। জিয়ার এক সহকারীর ভাষ্য অনুপাতে জিয়া রাশিয়াকে এই উত্তর পাঠায় যে, 'তোমাদের যাবতীয় ধমকি অর্থহীন। একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে, মৃত্যুর দিন নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত, যা আমি পরিবর্তন করতে পারবো না, তোমরাও এগিয়ে আনতে পারবে না।'

অপরাধমূলক এই তৎপরতার তদন্ত

ভাহ্‌ওয়ালপুরের দুর্ঘটনার পর যে সমস্ত তদন্ত হয়, সেগুলোর ব্যাপারেও 'রিডার্স ডাইজেষ্ট' এর তদন্ত রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ বিবৃত হয়েছে। তার কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

'সমগ্র অঞ্চলকে (যেখানে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল) সেনাবাহিনীর যুবকরা বেষ্টন করে রাখে। পাকিস্তানী অফিসারস এবং আমেরিকান এয়ার ফোর্সের বিশেষজ্ঞগণ অতি দ্রুত বিমান বিধ্বস্তের কারণসমূহ তদন্ত করতে আরম্ভ করে। লুকহেড কোম্পানী (বিমান তৈরীর আমেরিকান ফার্ম)এর অফিসার এবং বিশেষজ্ঞগণও তদন্তের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়।'

এরপর লেখেন—

'রাসায়নিক উপাদানের বিশেষজ্ঞগণ বিমানের ককপিট এবং আরও কয়েকটি স্থানে বিভিন্ন কেমিক্যালের লক্ষণ দেখতে পায়। যার মধ্যে এন্টিমনি পি.ই.টি.এন., ফসফরাস এবং সালফারের অংশসমূহ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে একটি পাকিস্তানী ল্যাবরেটরীও এর সত্যায়ন করে যে, বিমানে বিস্ফোরক বারুদের উপাদান ছিল। তদন্ত কমিটি বিমান বিধ্বস্ত হওয়াকে একটি সুস্পষ্ট অপরাধমূলক তৎপরতা সাব্যস্ত করে একে একটি ক্যামিকেল এজেন্ট এর মাধ্যমে ক্রু (বিমানের কর্মী)কে অজ্ঞান করার কিংবা অবশ করার ফলাফল ব্যক্ত করা হয়। এই ফলাফলে উপনীত হওয়ার যুক্তিযুক্ত পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, তদন্ত কমিটি অধিকতর তদন্ত ও গবেষণাকে অতীব জরুরী সাব্যস্ত করে।'

কয়েক লাইন পর তিনি লেখেন—

'আমেরিকার আইন মোতাবেক এফ.বি.আই. এর স[illegible] প্রতিরোধ অধিদপ্তর আমেরিকার বাইরে গিয়েও এ জাতীয় তদন্তের ক্ষমতা রাখে। সুতরাং ২১শে আগষ্ট ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট মৌখিকভাবে তদন্ত টিমকে পাকিস্তান গিয়ে তদন্তের অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টা পরই এই অনুমতিকে নিষ্প্রয়োজনীয় ও বাড়তি তৎপরতা' আখ্যা দিয়ে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ষ্টেট ডাইরেক্টর মিঃ অলিভ রিভেল এই তদন্তের জন্য ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের কয়েকবার শরণাপন্ন হয়েছেন, কিন্তু আমেরিকান ব্যুরোক্রাইসি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করে।'

কয়েক লাইন পর তিনি লেখেন—

'একজন পাকিস্তানী উর্ধ্বতন অফিসারের ভাষ্যমতে ইসলামাবাদের

আমেরিকান দূতাবাস পাকিস্তান সরকারকে বলে যে, এই ঘটনাকে ভিত্তি করে রাশিয়ান সরকারের উপর যেন চাপ সৃষ্টি করা না হয়। পাকিস্তান সরকার যেন সিংহের লেজ ধরার মত ভুল না করে।'

জোহান বিরন্স্ বলেন—

'এই ক্রাশের পর খুঁজে পাওয়া দেহসমূহের মধ্যে কিছু দেহ অক্ষতও ছিল। ভাহ্ওয়ালপুর মিলিটারী হাসপাতালে সেগুলোর পোষ্টমর্টেমও করা হয়। এর মধ্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওয়াসিমের লাশও ছিল। কিন্তু হাসপাতালের কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে ঊর্ধ্বতন সরকারী নির্দেশে কোনও লাশের পোষ্টমর্টেম করতে নিষেধ করা হয়। এভাবে যেন মৃতদেহে অবশকারী কেমিক্যালের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে স্পষ্টভাষায় বাধা দেওয়া হয়।'

কয়েক লাইন পরে তিনি বলেন—

'ভাহওয়ালপুরের পুলিশের নিকটেও তদন্তকারীরা এই অপরাধমূলক তৎপরতার ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। পাকিস্তানের সিকিউরিটি কর্মকর্তাগণ 'রিডার্স ডাইজেষ্ট'কে জানায় যে, এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।'

'রিডার্স ডাইজেষ্টে'র প্রতিনিধি জোহান বিরন্স্–এর এই রিপোর্টকে যেমনিভাবে চূড়ান্ত বলা যায় না, তেমনিভাবে চোখ বুজে তার উপর আস্থাও পোষণ করা যায় না। কিন্তু এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যেই আঙ্গিকে সংঘটিত হয় এবং এর বিস্তারিত যে বিবরণ বিশ্ববাসীর সম্মুখে আসে, তা থেকে এই লজ্জাজনক ফলাফল অবশ্যই সামনে আসে যে, এই ষড়যন্ত্র যে কোন বহির্দেশীয় শক্তিই করুক না কেন, তা ঐ সময় পর্যন্ত সফল হতে পারেনি, যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানের কিছু হৃদয় বিক্রেতা গাদ্দার এতে শামিল না হয়েছে।

আগুন লেগেছে ঘরে ঘরেরই প্রদীপ থেকে

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক আফগান জিহাদের সফলতা দ্বারা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য যে সুদূর প্রসারী বৈপ্লবিক ফলাফল লাভ করতে চাচ্ছিলেন, মুসলিম উম্মাহকে তা থেকে বঞ্চিত করার জন্যই মরহুম প্রেসিডেন্টকে পথ থেকে সরানো হয়। তারপরও হৃদয় বিদারক এই ঘটনা সেই ঐতিহাসিক সত্যটিকে পুনরায় ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেয় যে,

কখনই বড় থেকে বড় কোন শক্তি মুসলমানদেরকে ঐ সময় পর্যন্ত পরাজিত করতে পারেনি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকা 'মীর জাফর' ও 'মীর সাদিক'দের হাতে না পেয়েছে। বাংলায় ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ে শহীদ সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যদি মীর জাফর গাদ্দারী না করত এবং মহিশুরে শহীদ সুলতান টিপুর সঙ্গে তার উজির মীর সাদিক গাদ্দারী না করত, তাহলে আজ ভারত উপমহাদেশের মানচিত্র এবং ইতিহাস দুটোই ভিন্নরূপ হত। কিন্তু মর্মন্তুদ এসব ঘটনা না ঘটলে আল্লাহর পথের শাহাদাত সিরাজউদ্দৌলা এবং সুলতান টিপুকে যে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা মীর জাফর ও মীর সাদিকের ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়েছে, তাও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষার উপকরণ হত না।

جعفر از بنگال ' صادق از دکن

ننگ ملت ' ننگ دیں ' ننگ وطن

'বাংলার মীর জাফর আর দাক্ষিণাত্যের মীর সাদিক।
দেশ, জাতি ও ধর্মের কলঙ্ক।'

আল্লাহ না করুন জেনারেল জিয়া এবং তার সাথীদের কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া শাহাদাতের এত বড় দুর্ঘটনার পরিণতিতে যদি আফগান জিহাদের উদ্দেশ্যাবলী আমরা হারিয়ে ফেলি (যার লক্ষণাদি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে) তাহলে যেভাবে মীর জাফর ও মীর সাদিকের বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ংকর পরিণতি উপমহাদেশের মুসলমানরা আজ পর্যন্ত ভুগছে, তেমনিভাবে হয়ত বা ভাহওয়ালপুরের দুর্ঘটনার ভয়ংকর প্রভাব থেকে আমরাও শত শত বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারব না।

تاریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں

لمحوں نے خطا کی ہے ' صدیوں نے سزا پائی

'ইতিহাস বিভিন্ন জাতির এমন যুগও প্রত্যক্ষ করেছে, যখন কয়েক মুহূর্তের
ভুলে কয়েক শতাব্দীর শাস্তি হয়েছে।'

শহীদের জানাযা

মহররমের ৬ তারিখ শনিবারে শহীদ প্রেসিডেন্টের জানাযা নামাযে

অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে থেকে যেই জনসমুদ্র ফয়সল মসজিদের দিকে এগিয়ে আসছিল, তাদের মধ্যে আমিও শামিল ছিলাম। আমি হজ্জের সমাবেশ ছাড়া মানুষের এত বিশাল সমাবেশ কখনো দেখিনি। আমি কায়েদে আযম জিন্নাহ এবং কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খানের জানাযাতে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু সম্ভবত পাকিস্তানের ইতিহাসে এটিই ছিল জানাযার সর্ববৃহৎ জনসমাবেশ। এটি ছিল সেই বিনয়ী প্রকৃতির মহান নেতার জানাযা, যিনি আজীবন নিজের জন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন করেননি। তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণের বরাবর কোন আবেদন করা হয়নি এবং তাদের জন্য যানবাহনের বন্দোবস্তও করা হয়নি। বেশীর ভাগ লোক পায়ে হেঁটে আসছিল। অন্যান্য শহর থেকে ইসলামাবাদ পৌছার সমস্ত পথেও মানুষ, গাড়ী, বাস ও ট্রাকের প্লাবন উছলে পড়ছিল। সাধারণ জনগণ জায়গায় জায়গায় মরহুমের ভালবাসায় আবেগ ও প্রভাবপূর্ণ বাক্য লিখে ব্যানার ঝুলিয়েছিল। আফগানিস্তানের মুহাজিররা—যারা এখন নিজেদেরকে এতিম অনুভব করছিল—জায়গায় জায়গায় ব্যানার লাগিয়ে স্নেহশীল ভাইয়ের সমীপে কৃতজ্ঞতার আবেগ এবং দোআর নজরানা পেশ করছিল। জানাযা নামাযের পর সেখানেই আফগান মুজাহিদদের বড়বড় সাতটি সংগঠনের প্রধানদের সঙ্গেও আমার সাক্ষাত হয়। তারা গভীর বিষাদপূর্ণ কিন্তু পরিপূর্ণ আস্থার সুরে সংকল্প ব্যক্ত করেন যে, 'আমরা এই রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে শান্তিতে বসতে পারব না।'

কয়েকদিন পর পুনরায় ইসলামাবাদ গেলে শহীদের মাজারের সর্বত্র ফ্রেমে বাধানো শোকগাঁথার প্লেট বসানো দেখতে পাই। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে আমার দৃষ্টি একটি প্লেটের উপর গিয়ে স্থির হয়ে যায়। প্লেটটি কবরে বসানো ছিল। তাতে আফগান মুহাজিরদের সৈয়দ পরিবারের একজন লোক এই কবিতা অঙ্কিত করেছিলেন—

اے خاک تیره ' دلبر مارا ' عزیز دار
ایں نور چشم ما ست ' کہ در برگفتہ

'হে ধূসর মাটি ! আমাদের হৃদয়ের মানুষকে সযত্নে রেখ। সে আমাদের
চোখের আলো, যাকে তুমি কোলে তুলে নিয়েছ।'

জানিনা সেই প্লেটটি এখনও সেখানে রক্ষিত আছে নাকি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এই মর্মন্তুদ ঘটনার কারণে বিশ্বের মুসলমানের উপর একদিকে বেদনার ঝড় বয়ে যায়। অপরদিকে দুশমনের ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। বিশেষত রাশিয়ান সেনাবাহিনী—যাকে প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং জেনারেল আখতার শোচনীয় পরাজয়ে পর্যুদস্ত করে রেখেছিল, যার অর্ধসংখ্যক সৈন্য একদিনে আফগান ভূমি ছেড়ে পালিয়েছিল, বাকী অর্ধেক তাদের বিছানাপত্র গোটাচ্ছিল, তাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না।

আমাকে কয়েকজন মুজাহিদ জানান যে, গারদেজ রণাঙ্গনের একটি ক্যাম্পে অবস্থান কালে আমরা ভাহওয়ালপুরের হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনার সংবাদ পাই, তখন সমস্ত মুজাহিদ সাথী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে এবং দুআ করতে থাকে। আমরা দুশমনের যেই ছাউনী (বা চৌকি) অবরোধ করে রেখেছিলাম, অকস্মাৎ তার তোপসমূহ থেকে রং বেরংয়ের আলোর গোলা আকাশে উড়ে উঠে ফুলঝুরির ন্যায় আতশবাজি করতে থাকে। এটি ছিল দুশমনের পক্ষ থেকে হৃদয় বিদারক এই দুর্ঘটনায় আনন্দ প্রকাশ। আমরা তা বরদাস্ত করতে পারিনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের তোপ তাদের যাবতীয় আনন্দ ধুলায় মিশিয়ে দেয়। তারপর সেখানে মৃত্যুর নীরবতা ছেয়ে যায়। মুজাহিদদের এই তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল একথা জানিয়ে দেওয়া—

طوفان بلا سر سے گذرتے ہی رہے ہیں
زخمی ہے ' مگر آج بھی سرخم تو نہیں ہے

'বিপদের প্লাবন মস্তক অতিক্রম করছে বটে, কিন্তু আমরা আহত হলেও
আজ পর্যন্ত মাথা নত করিনি।'

যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি

বিশ্বের সর্ববৃহৎ আয়তনের দেশ রাশিয়া। চব্বিশ কোটি তার অধিবাসী। তার চল্লিশ লক্ষ সৈন্যকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সেনাবাহিনী বলা হয়। তার মধ্য থেকে আফগানিস্তানের লড়াইয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ এর স্বীকারুক্তি অনুযায়ী দশ লক্ষ সৈন্য অংশ নিয়েছে। কিন্তু ১৯৮৮ ঈসায়ীর ১৫ই মে যখন আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনী

নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করে, তখন সেখানে তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লাখের কিছু বেশী। প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতের ঘটনার আগ পর্যন্ত তারও অর্ধেক সৈন্য পালিয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে আগামী কয় মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে হত। এই প্রত্যাবর্তনও ছিল রাশিয়ান সেনাবাহিনীর জন্য প্রাণ খোয়ানোর কাজ। কারণ, মুজাহিদরা তাদের প্রত্যাবর্তনকারী কাফেলাসমূহেরও পশ্চাৎধাবন করছিল।

জেনেভা চুক্তির সময় থেকেই মুজাহিদদের সহযোগিতা থেকে আমেরিকা কার্যত হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতের সময় মুজাহিদদের বিজয় ধারা উচ্চ পর্যায়ে ছিল। কমিউনিষ্ট রাশিয়ান ও কাবুল সৈন্যরা নিজেদের চৌকি এবং ছাউনীসমূহ ফেলে রেখে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছিল। মুজাহিদদের আযাদকৃত এলাকার পরিমাণ রাতদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তুখার প্রদেশ পুরোটাই বিজিত হয়েছিল। কাবুল সহ অন্যান্য এলাকার আযাদীও সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া—আফগানিস্তানের সামরিক পরিস্থিতির উপর তার থেকে বেশী গভীর দৃষ্টি খুব কম মানুষেরই রয়েছে—বলেছিলেন এবং তাঁর সে কথা পত্রপত্রিকাতেও ছেপেছিল যে, 'ইনশাআল্লাহ ১৯৮৯ ঈসায়ী বর্ষ আফগানিস্তানের পরিপূর্ণ আযাদীর বর্ষ হবে। আমরা আগামী রমাযানে জুমআর নামায আমাদের আফগান ভাইদের সঙ্গে কাবুল জামে মসজিদে আদায় করব।'

ওদিকে আফগান জিহাদকে অপহরণ করার জন্য 'জেনেভা চুক্তি' রূপে দুশমন শক্তিসমূহের একটি সম্মিলিত আক্রমণ হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় চূড়ান্ত আক্রমণ ভাহওয়ালপুরের দুর্ঘটনার মাধ্যমে করা হয়। কিন্তু এরপরও মুজাহিদদের প্রবল সাহসিকতার কোন ফারাক সৃষ্টি হয়নি। তারা তাদের তীব্র ও চরম আক্রমণ এবং বিজয়ের ঊর্ধ্বগতি দ্বারা বরাবর এই সংকল্পের ঘোষণা করছিলেন—

اللہ کی رحمت سے کیفی ' دم توڑ چکی ہے تاریکی
ہلکا سا دھند لکا باقی ہے ' اس کو بھی مٹا کر دم لیں گے

'আল্লাহর রহমতে তমাশার জাল ছিন্ন হয়েছে, সামান্য যে আবছা অন্ধকার রয়েছে, তা নিঃশেষ করেই ক্ষান্ত হব।'

পাকতিকা প্রদেশ বিজয়

ভাহওয়ালপুরের দুর্ঘটনার পর এখনও একমাস পুরা হয়নি, ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মাদরাসা এবং জামেয়াসমূহের মুজাহিদ তালিবে ইলমদের বরাবর পাকতিকা প্রদেশের উরগুন রণাঙ্গন থেকে কমাণ্ডার যুবায়ের আহমাদ সাহেবের এই পয়গাম এসে পৌছে—

"এই মাসের শেষে সেই চূড়ান্ত আক্রমণের প্রোগ্রাম করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে যার জন্য আপনারা প্রতীক্ষা করছেন। যেসব বন্ধুর শাহাদাতের বাসনা রয়েছে, তারা রণাঙ্গনে চলে আসুন।"

মাদরাসা এবং জামেয়াসমূহে ১৯৮৮ ঈসায়ীর ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ত্রৈমাসিক পরীক্ষা আরম্ভ হবে। সম্ভবত আক্রমণের জন্য এইদিন নির্ধারণের একটি কারণ এও ছিল যে, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার পর যে কয়দিন ছুটি পাওয়া যায় তাতে অধিক সংখ্যক তালিবে ইলম জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবে। যাদের ভাগ্যে এই সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ ছিল তারা পরীক্ষা শেষ করেই রণাঙ্গনে চলে যান। কিন্তু সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে অক্টোবর আরম্ভ হয়ে যায়, তারপরও সেখানকার কোন খবর আসে না।

শারানা বিজয়

প্রতিদিনের মত ১৫ই অক্টোবরের পত্রিকায়ও আমি উরগুনের সংবাদ তালাশ করছিলাম। ইতিমধ্যে তার পরিবর্তে শারানার মহাবিজয়ের সুসংবাদ লাভ করি। পত্রিকায় যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তাতে আমি এই ফলাফলে উপনীত হই—পরবর্তীতে তা সত্যায়িত হয় যে, পত্রিকায় 'শারান' শব্দটি ভুল ছেপেছে। মূলত এটি 'শারানা'র সংবাদ, যেটি আফগানিস্তানের দক্ষিণপূর্ব প্রদেশ পাকতিকার রাজধানী। এটি সেই 'শারানা', যার এক রক্তাক্ত জিহাদে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইরশাদ আহমাদ সাহেব ২১ জন সাথী সহ শাহাদাত মদিরা পান করেন। এই লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ অনেক পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

কয়েক বছর ধরে পাকতিকা প্রদেশের শুধুমাত্র দুটি ছাউনী দুশমনের নিকট অবশিষ্ট ছিল। তার একটি হল শারানা, যা এখন বিজয় হল, দ্বিতীয়টি উরগুন, যা বিজয়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে। শারানা উরগুনের আগে

কাবুলের দিকে অবস্থিত। শারানার এই বিজয় উরগুন বিজয়ের ভূমিকা হতে পারবে। কেননা এখন এখান থেকে উরগুন ছাউনীতে রসদ পৌছার কোন সম্ভাবনা নেই। বাহ্যত মুজাহিদরা উরগুনের পূর্বে এটিকে এ উদ্দেশ্যেই 'পরিস্কার' করেছেন। তাই বিভিন্ন পত্রিকা লিখেছিল যে, 'গত এক মাসে স্পেন, বলদাক এবং আসমার দখল করার পর শারান (শারানা) এর উপর মুজাহিদদের দখলকে বড় সফলতা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।'

উরগুন বিজয়

যথাযথ প্রত্যাশা অনুপাতে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে পরদিনই ৭ই অক্টোবর শুক্রবারের পত্রিকায় উরগুনের মহাবিজয়ের সংবাদ আসে। এ সংবাদ আনন্দের এমন স্বাদ উপহার দেয় যে, ভাইজান মরহুমের ভাষায়—

"میری جبینِ شوق میں سجدے مچل گئے"

'আমার প্রেমপূর্ণ ললাট পেয়ে সিজদা আত্মহারা হয়ে যায়।'

এখন পাকতিকা প্রদেশ পুরোটাই আযাদ হয়েছে। এটি আফগানিস্তানের চতুর্থ প্রদেশ, যা পরিপূর্ণরূপে আযাদ হয়েছে। করাচীর দৈনিক জঙ্গ এই সংবাদটি প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলামপূর্ণ দুই লাইন বিশিষ্ট শিরোনামে প্রকাশ করে। সংবাদটি এখানে হুবহু তুলে ধরছি।

মুজাহিদরা আফগানিস্তানের চারটি প্রদেশ দখল করেছে

কাবুল বাহিনী বামিয়ান, অরদাগ এবং তাখারের পর পাকতিকা প্রদেশও ছেড়ে চলে গিয়েছে।

কাবুল (রেডিও রিপোর্ট) আফগান মুজাহিদগণ বুধবার রাতে দেশের দক্ষিণ পূর্ব প্রদেশ পাকতিকা দখল করেছে। মুজাহিদগণ পাকতিকার রাজধানী শারান (শারানা) এর উপর প্রথমে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। বলা হয় যে, পাকতিকায় নিয়োজিত হাজার হাজার সৈন্য বুধবার রাতে এবং বৃহস্পতিবার সকালে এ প্রদেশ ত্যাগ করে। তারা তাদের সঙ্গে ট্যাংক ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামও নিয়ে যায়। মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের অপর তিনটি প্রদেশ পূর্বেই দখল করেছিল। যার মধ্যে কাবুলের পশ্চিমে বামিয়ান, দক্ষিণ পশ্চিমে অরদাগ এবং উত্তরে তাখার

প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আফগান (কমিউনিষ্ট) বাহিনী পাকিস্তানী সীমান্ত থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরের পাকতিকা প্রদেশের উরগুনের ছাউনীটিও বুধবার রাতে খালি করে দেয়। মুজাহিদরা তা দখল করে নেয়। রেডিও পাকিস্তানের ভাষ্যমতে মুজাহিদরা পাকতিকা প্রদেশ দখল করায় তাদের কাবুল অভিমুখে অধিকতর দ্রুত অগ্রাভিযানের পথ সুগম হয়েছে। (দৈনিক জঙ্গ, করাচী, শুক্রবার ২৪শে সফর, ১৪০৯ হিজরী, ৭ই অক্টোবর, ১৯৮৮ ঈসায়ী)

সন্ধ্যা নাগাদ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যমেও এই সংবাদ সত্যায়িত হয়। কিন্তু উরগুন ছাউনীর শক্তিশালী সেনাশক্তি সম্পর্কে আমার পূর্ব থেকেই কিছুটা জানা ছিল এবং তার প্রতিরক্ষা চৌকি (পোষ্ট) 'জামাখোলার' অলংঘনীয় প্রতিরক্ষা দূর্গ তো কয়েক মাস পূর্বে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। তাই অন্তরে নানা প্রকার প্রশ্ন ও আশংকা সৃষ্টি হচ্ছিল।

طے ہو تو گئی راہ وفا اہل جنوں سے
معلوم نہیں 'طے یہ مگر ہوگئی کیسے؟

'প্রেমিক দলের ভালবাসার পথ অতিক্রম তো হলো, কিন্তু জানিনা তা কিভাবে অতিক্রম হলো।' (হযরত কাইফী)

কেননা জামাখোলার উপর চূড়ান্ত লড়াই ছাড়া উরগুন বিজয় সম্ভব ছিল না। সে লড়াই কখন হল এবং এ পোষ্ট কিভাবে জয় হলো?

জামাখোলার চতুর্দিকে ভূমি মাইনের যে ভয়ংকর জাল বিছানো ছিল তার দ্বারা এ পর্যন্ত কত মুজাহিদ যে শহীদ হয়েছেন এবং কতজন যে পঙ্গু হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মুজাহিদরা এ জাল কিভাবে অতিক্রম করেন?

বিশেষত পোষ্টের নিকটবর্তী চতুর্পাশে তারযুক্ত মাইনের পনের গজ চওড়া যেই বেড়া বিছানো রয়েছে—যার মধ্যে পা রাখার মত জায়গাও খালি নেই। সেই বেড়া তারা কিভাবে অতিক্রম করেছেন? পত্রিকার রিপোর্টে আমার এসব প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেবের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তিত্ব আপাদমস্তক আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে এবং তাঁর শাহাদাত বাসনার কথা স্মরণ হতেই অন্তর কেঁপে ওঠে। হে আল্লাহ! তিনি যেন সুস্থ থাকেন। তারপর একথা স্মরণ হয়ে অন্তরে কিছুটা আশা জাগে যে, শেষের সাক্ষাতেও আমি তাঁকে আয়াতুল কুরসী পড়ে ফুঁ দিয়ে বিদায় দিয়েছিলাম।

যেসব মুজাহিদ এই রণাঙ্গনে গিয়েছিলেন, কয়েকদিনের চরম ধৈর্যপূর্ণ প্রতীক্ষার পর আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সুস্থ শরীরে ফিরে আসেন। তাদের নিকট জামাখোলার ঐতিহাসিক লড়াই ও মহাবিজয়ের ঈমানদীপ্ত ঘটনা শুনে হৃদয় আনন্দ দোলায় দুলে ওঠে।

পরবর্তীতে ১৩ ও ১৪ই নভেম্বর ১৯৮৮ ঈসায়ী লাহোরে হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলন হয়। সেখানে স্বয়ং কমাণ্ডার যুবায়ের সাহেব এবং তাঁর এমন কিছু বন্ধুর সঙ্গে মোলাকাত হয়, যাঁরা এই স্মরণীয় লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের নিকট থেকে মন ভরে সমস্ত বিবরণ এত বিস্তারিতভাবে শুনি যে, আপনাদেরকেও তা শোনাতে ইচ্ছা হচ্ছে। হযরত মুর্শিদ আরেফীর ভাষায়—

آتا ہے لطف اپنی ہی باتوں میں اب مجھے
کچھ ایسی دل نشیں تری تقریر ہوگئی

'তোমার ভাষণ এমনই মনোমুগ্ধকর হয়েছে যে, আমি এখন আমারই কথায় স্বাদ উপলব্ধি করছি।'

পাকিস্তানী মুজাহিদদের একটি বিশেষ সম্মান

একথা জানতে পেরে অসাধারণ পুলক উপলব্ধি করি যে, জামাখোলা পোষ্টের বিজয় সরাসরি কমাণ্ডার যুবায়ের ও তাঁর জানবাজ সাথীদের কৃতিত্ব। এর স্বীকৃতি স্বরূপ আফগান সংগঠনসমূহের স্থানীয় কমাণ্ডারগণ এক সমাবেশে কমাণ্ডার যুবায়ের আহমাদ খালিদ সাহেবকে গোল্ড মেডেল (স্বর্ণপদক) দিয়ে ভূষিত করেছেন। কারণ, পোষ্টটি তাঁরই ঈমানদীপ্ত কমাণ্ডে কয়েক ঘন্টার ভয়ংকর লড়াইয়ের পর বিস্ময়করভাবে বিজয় হয়েছে। এ লড়াই উরগুনের জন্য সিদ্ধান্তমূলক চূড়ান্ত লড়াই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, এতে করে দুশমন বাহিনীর উপর—যা একটি সাজোয়া ডিভিশন ছাড়াও মিলিশিয়া ও ছয়শ' লড়াকু গোত্রীয় যুবকদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল—এমন ভীতি ছেয়ে যায় যে, চতুর্থ দিন অতিরিক্ত কোন লড়াই করা ছাড়াই তারা রাতের অন্ধকারে উরগুন ছাউনী ছেড়ে চলে যায়। এতে করে কমাণ্ডার যুবায়ের এবং তাঁর সাথীদেরকে শুধু জামাখোলারই

নয়, বরং সমগ্র উরগুনের বিজেতারূপে আখ্যা দেওয়া হয়। এটি শুধু পাকিস্তানী মুজাহিদদের জন্যই নয়, বরং তা এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী সকল মুজাহিদেরই বিশেষ সম্মান। ওয়া লিল্লাহিল হামদ—আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

উরগুন আযাদ করার জন্য জামাখোলা পোস্টের উপর যে চূড়ান্ত আক্রমণ করা হয় এবং তাতে মাদরাসার দৃঢ় সংকল্প আলিম ও তালিবে ইলমদের হাতে আল্লাহ তাআলা যেভাবে মহাবিজয় দান করেন, তার ঈমানদীপ্ত বিস্তারিত বিবরণ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে রাখার যোগ্য। এই বিবরণ হরকাতুল জিহাদিল ইসলামীর মাসিক পত্রিকা 'আল ইরশাদের' 'ফতহে মুবীন' সংখ্যায় (রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানী ১৪০৯ হিজরী সংখ্যা) বিভিন্ন প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এতে পাকতিকা প্রদেশের আফগান কমাণ্ডার মাওলানা আরসালান খান রহমানী এবং কমাণ্ডার যুবায়েরসহ এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী আরো কিছু মুজাহিদেরও সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছে। আমি এ সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ সরাসরি তাঁদের মুখ থেকেও শুনেছি। কিন্তু শুধুমাত্র স্মরণশক্তির উপর নির্ভর না করে সতর্কতা স্বরূপ এখানে 'ফতহে মুবীন' সংখ্যা থেকে নিজের ভাষায় তা এমনভাবে উদ্ধৃত করছি, যেন পুনরাবৃত্তিগুলো বাদ দিয়ে পূর্ণ বিবরণ সুবিন্যস্তভাবে পাঠক সমীপে চলে আসে। পরবর্তীর উদ্ধৃত অংশসমূহও সেই 'ফতহে মুবীন সংখ্যা' থেকেই নেওয়া হয়েছে। তবে ফতহে মুবীন সংখ্যায় বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট ছিল না। এই শূন্যতাকে আমি লেখার সময় সংশ্লিষ্ট মুজাহিদদের নিকট থেকে বারবার যাচাই করে পুরা করেছি।

এই বিবরণের মাধ্যমে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের সমর পদ্ধতি অধিক সুস্পষ্টরূপে আমাদের সামনে চলে আসবে এবং একথাও বুঝে আসবে যে, আমরা নিত্যদিন পত্রপত্রিকায় আফগানিস্তানে মুজাহিদদের বিজয়ের যে সমস্ত ছোট ছোট সংবাদ পাঠ করি, তা পত্রিকাতেই শুধু ছোট হয়ে থাকে, জেহাদের ময়দানে সেগুলোর ধৈর্যসংকুল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনেক মাস ও অনেক বছরব্যাপী বিস্তৃত হয়ে থাকে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কয়েক লাইনের এ সমস্ত সংবাদ আমরা পাঠ করার পূর্বে বছরের পর বছর ধরে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদগণ বহু মাইল বিস্তৃত রণাঙ্গনের বুকে এগুলোকে রক্ত দিয়ে লিপিবদ্ধ করেন এবং বিজয়ের ছোট থেকে ছোট

প্রত্যেকটি সংবাদের অন্তরালে বহু সংখ্যক বেনামী শহীদের ঈমান, ধৈর্য্য, সংকল্প ও ত্যাগের এমন বহু উপাখ্যান লুকিয়ে থাকে, ঐতিহাসিকরা চিরদিন যার সন্ধান করে ফেরে।

১ম খণ্ড সমাপ্ত

পরবর্তী খণ্ড

আফগান জিহাদের অজানা কাহিনী–১

'জানবাজ মুজাহিদ'

খোস্ত ও উরগুন সহ বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুজাহিদদের বিজয়ের বিরল ও বিস্ময়কর অনেক কাহিনীর সমন্বয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর পথের মুজাহিদ
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী
MAKTABATUL-ASHRAF
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪